Published by
Bepin Behary Dhur.
356, Upper Chitpore Road, Calcutta.
Printed by. Punchukalli Halder.
At the Sulov Press,
84, Upper Chitpore Road, Jorasanko, Calcutta
Illustrated by Srijut Preogopal Dass.

উৎসর্গ।

পরম পূজ্যা মাতা-ঠাকুরাণীর

শ্রীচরণ কমলেষু—

মা।

তোমার অনন্ত করুণায় আমি এ শ্যামল ধরাতলে বিচরণ করিতেছি, তোমার ঋণ, তোমার স্নেহ, তোমার যত্ন, তোমার অপার্থিব স্বার্থ-ত্যাগ অতুল্য। তোমার সন্তোষ বিধান করিবার শক্তি ও সামর্থ, আমার এ দুর্ব্বল হৃদয়ে কি আছে মা? দেবী তুল্যা তুমি! এ দীন আজ তোমার সেই স্নেহসিক্ত চরণে, তাহার সাধের তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি-স্বরূপ অর্পণ করিতেছে দীনের দান দয়া করিয়া গ্রহণ কর।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা তীর্থভ্রমণ যাত্রীদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যাঁহারা তীর্থে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে লোকাভাবে মনে মনে চিন্তান্বিত হইয়া পূর্ণ উৎসাহে যাত্রা করেন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অপরিচিত প্রবঞ্চকদিগের সহিত বাক্যালাপের পর তাহাদিগকে প্রকৃত সেতুয়া (তীর্থের পথদর্শক) স্থির জানিয়া সঙ্গী হন, শেষে প্রায়ই তাঁহাদিগকে মনস্তাপ করিতে হয়, এমন কি ঐ সকল পাষণ্ডদিগের অত্যাচারের জন্য তীর্থসমূহও তাঁহাদের দর্শনলাভ হয় না; কারণ ঐ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চকগণ প্রথমে এরূপ মিষ্ট বাক্যে অজ্ঞ যাত্রীদিগকে তুষ্ট করেন, যেন তাহারা যাত্রীদিগের নিকট থাকিলে কত উপকার করিবে। প্রধান প্রধান ষ্টেশনে প্রায়ই তাহাদের গতিবিধি থাকে, বস্তুতঃ ঐ সকল সেতুয়ার সঙ্গী হইলে প্রথমে যে সামান্য উপকার দর্শে পরে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিলে নিশ্চই অসন্তুষ্ট হইতে হয়, যদিচ তাহারা যাত্রীর পরিচিত হন, তাহা হইলেও সেতুয়ারা নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্তরে যাত্রীর নিকট কিরূপ অর্থ আছে জানিয়া লয়, তৎপরে তাঁহাদিগকে যে কোন তীর্থে পাণ্ডার নিকট লইয়া যায়, পাণ্ডার ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকে, কারণ পাণ্ডার পাওনা বাদে যাহা থাকিবে, ঐ সমস্ত সেতুয়ার লভ্যাংশ অধিক যাত্রী পাইবার আশায় পাণ্ডারা এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। যদ্যপি কোন যাত্রী কোন পাণ্ডার নাম সন্ধানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট গমন করেন; আর কোন সেতুয়া তাহার সঙ্গে না থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডারা তাহাকে অধিক যত্ন করিয়া থাকেন এবং যথার্থ প্রাপ্য লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে সুফল দানে ঐ যাত্রীকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকেন। পাণ্ডারা জানেন যে, ঐরূপ যাত্রীর প্রাপ্য অংশ সমস্তই

তাঁহাদের অধিকার। অপরিচিত সেতুয়াদিগের সংসর্গ যাত্রীদিগের সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত, তাহারা নিকটে আসিবার চেষ্টা দেখিলে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে ঐ সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চক, যাত্রীর নিকট থাকিয়া প্রথমে নানাপ্রকারে তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন হয়। আবার সুবিধানুযায়ী তাহাদেরই সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। এই পবিত্র স্থানেও ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য বিচার তাহাদের হৃদয়ে নাই; বলা বাহুল্য সেতুয়ারা নিজ খরচে যাত্রীদিগের বিশ্বাসভাজন হইবার নিমিত্ত ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালনের অপেক্ষা করে এবং রেল-খরচ প্রভৃতি নিজেই বহন করিয়া থাকে। অনেক সেতুয়া পাণ্ডাদিগের দ্বারা নিযুক্ত থাকে. তাহাদের ব্যয় পাণ্ডারাই বহন করিয়া থাকেন, কারণ বহু দূর হইতে একটী লোক ক্রমান্বয়ে বিনা খরচায় আপনার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতে থাকিলে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে তাহারই উপদেশ মত তাহারই পাণ্ডার নিকট যাইতে বাধ্য হইতে হয়।
নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়াদিগের ব্যবহার দর্শনে যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে তাহাতে বলা যায় যে বহুদর্শি, পরিচিত, ধর্ম্মভিরু, বিশ্বাসী সেতুয়া অর্থাৎ বহুকালাবধি যাঁহারা তীর্থসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ একটী লোক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে তাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইবেন। যদিচ তিনিও পাণ্ডাদিগের নিকট প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাত্রীদিগের সদা সর্ব্বদা মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, কারণ জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র ইহাই তাঁহাদের সম্বল এই নিমিত্ত প্রাণপণে তিনি যাত্রীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন।

আমি একটী সত্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ঃ—

একদা দশ জন বিদেশী অজ্ঞ যাত্রীদের সহিত ঐরূপ একজন সেতুয়া

মিষ্টালাপে তুষ্ট করিয়া তাহাদের সঙ্গ লয় এবং তাহারা "গয়া" তীর্থে গমন করিবেন উহা অবগত হইয়া হাবড়া হইতে গয়া ষ্টেশনের ভাড়া উক্ত দশ জনের নিকট হিসাব করিয়া লইয়া গয়া টিকিটের পরিবর্ত্তে—শ্রীরামপুর ষ্টেশনের দশখানি টিকিট খরিদ করিয়া আনেন, এবং ব্যস্ততার সহিত তাহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া রেল-গাড়ীতে উঠাইয়া দেন, বলা বাহুল্য তিনিও তাহাদের সহিত উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে এক একখানি টিকিট প্রদান করিয়া যত্ন-সহকারে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন, সরলহৃদয় যাত্রীরা তাহার উপদেশমত কার্য্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গয়া যাইতে লাগিল শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে ঐ সেতুয়া যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অন্তর্ধান হয়, এইরূপে রেলগাড়ী এসেনশোল জংসনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথানুসারে রেল-কর্ম্ম-চারীরা টিকিট চেক করিবার সময় ঐ সেতুয়ার চাতুরী যাত্রীরা জানিতে পারিলেন। রেল-কর্ম্মচারীগণ তাহাদের নিয়ম অনুযায়ী শ্রীরামপুর বাদে বেবাক ভাড়া আদায় করিয়া নানাপ্রকার লাঞ্ছনাভোগও করাইলেন। এইরূপ প্রত্যহ কতপ্রকার সেতুয়াদিগের চাতুরী প্রকাশ পায় উহা বর্ণনাতীত। রেল-কর্ত্তৃপক্ষের কড়া আদেশ অনুসারে কোন রেল-কর্ম্মচারী কোন সেতুয়ার পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ষ্টেশন প্লাটফরম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন, এইরূপ নিয়ম সত্ত্বেও নিত্য কত যাত্রীর কতপ্রকার বিলাপধ্বনি শুনিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

যখন আমরা সপরিবারে কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলাম, অভিরাম নামে একজন প্রয়াগের সেতুয়া কাশী-তীর্থদর্শনের পর আমরা প্রয়াগতীর্থে যাইব অবগত হইয়া ৬।৭ দিন একাধিক্রমে নিজ খরচে আমাদের নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং ক্রমাগত তাহার পাণ্ডার যশগুণ গাহিতে লাগিল। আমাদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাকি ১৪ জন স্ত্রীলোক মোট ১৯ জন লোক ছিলাম। অভিরাম এই ১৯ জন যাত্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমাদের নানাপ্রকার বাক্যে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত

বলিলেন যে, প্রয়াগের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আপনারা স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী ব্যয় করিবেন আর ত্রিধারার সুফলের নিমিত্ত প্রত্যেক যাত্রীকে দেড় টাকা হিসাবে পৃথক দিতে হইবে, আমরা সকলেই তাহার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক তাহার সহিত প্রয়াগতীর্থে তাহারই পরামর্শানুযায়ী তাহার পাণ্ডার নিকট গমন করিলাম, বলা বাহুল্য অভিরামের প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদান হইয়াছিল শেষ সুফলের সময় পাণ্ডার সহিত নানা বাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে অভিরাম আমাদের এত আজ্ঞাবাহ ছিল, সেই সময় সে কোথায় অন্তর্ধ্যান হইল আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, অবশেষ আমাদের ন্যায় শিক্ষিত পাঁচজন পুরুষলোক থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া লোকপ্রতি চারি টাক হিসাবে সুফল দিয়াছিলাম ইহাতে যতটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি সাধারণে তাহা প্রকাশ করিলাম নিবেদন ইতি।

গ্রন্থকার

ভূমিকা।

বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলেও, তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের পবিত্র মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মের পবিত্র নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নর নারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরম পবিত্র তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হৃদয়ে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন। হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া দেব দেবী দর্শনে মুক্তিলাভ হয়। এই অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণাময় পরীক্ষাভূমি—"সংসারের" মায়া বন্ধন শিথিল হয়; তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি জীবন-সহচরী পত্নীহারা, পুত্র জনক জননীর স্নেহশিক্ত ক্রোড় হারা হইয়া হৃদয়ের শোক, তাপ উপশম করিবার জন্য এই পবিত্র তীর্থস্থানে ছুটিয়া যান। প্রকৃতির শ্যামল শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণে প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আজ আমাদিগের সেই পরম পবিত্র তীর্থ-সমূহেও নানাপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নৌকাযোগে বা পদব্রজে যাঁহারা তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহারা কত সময়, কত ক্লেশ, কত অর্থ ব্যয় করিয়া, পাষণ্ড দস্যুদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত বিড়ম্বনাভোগ করিয়া, জীবনের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই দুর্ল্লভ পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করিতেন তাহা একবার চিন্তা করিলেও হৃদ্‌কম্প হয় কিন্তু এক্ষণে রেল-গাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাজরাজের সুশাসনগুণে যাত্রীদিগের যতদূর সম্ভব সুখসাধ্য হইয়াছে। এই দ্রুতগামী রেলগাড়ীর সাহায্যে অতি অল্প সময়ে ও সামান্য ব্যয়ে নির্ব্বিঘ্নে গরীব, দুঃখী, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই তীর্থস্থানে গমনপূর্ব্বক নয়ন ও জীবন সার্থক করিতেছেন। পরম

পবিত্র "তীর্থ" সমূহের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বাস, ভক্তি হ্রাসের ইহাই প্রধান কারণ অনুমান হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহা সহজ-লভ্য তাহার আদরও তত অল্প, আর যাহা দুর্ল্লভ তাহার যত্নও তত অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখনও যাত্রীদিগের মধ্যে এমন অনেক মহানুভবকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তীর্থে আগমন করতঃ ভক্তিসহকারে যথাবিধি তীর্থকার্য্য সম্পাদান, ভগবানের লীলাভূমি দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, পবিত্র রজে বিলুণ্ঠিত হইয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। এ দীন আবাল্যকাল হইতে তীর্থভ্রমণ প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা সাধ্যমত এই "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" নামে জন সাধারণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। আশা করি যাঁহারা তীর্থভ্রমণ অভিলাষী, তাঁহারা একবার আমার বহু আয়াশ ও যত্নের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া দেখিবেন। "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থভ্রমণ প্রয়াসীদিগের প্রিয়-সহচর ও পথ প্রদর্শকের সম্পূর্ণ কার্য্য করিবে। ইহাতে বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, দিল্লীসহর, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, আগ্রা সহর, সাধীন জয়পুর রাজের দেবালয়, পুষ্কর, সাবিত্রীমাহাত্ম্য, বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ স্থান ও মাহাত্ম্য সকল সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবেন, আরও কলিকাতার সন্নিকটস্থ পীঠস্থান কালীঘাট ও তারকেশ্বর তত্ব এবং কোন তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্যক তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা, এতদ্ভিন্ন হিন্দু গৃহস্থের পাঠোপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংযোজনা করা হইয়াছে।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী প্রণয়ণ আমার প্রথম উদ্যম, বহুদিনাবধি মুদ্রা যন্ত্রের অশেষ ক্লেশভোগ হইতে বিমুক্ত, নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগবানের কৃপায় আজ ইহা পাঠক-সমাজে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি "সুলভ প্রেসের" অধ্যক্ষের কার্য্যশিথিলতায়

অপহৃত হয়, তৎপরে অতি কষ্টে ভগ্নোদ্যমে আবার নূতন পাণ্ডুলিপি প্রণয়ণ করি, দুঃখের বিষয়, ইহা আর পূর্ব্বের ন্যায় হইয়া উঠে নাই এই নিমিত্ত সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা যে, যেখানে যে ভাবের যে ব্যাতয় ঘটিয়াছে, সেই স্থল নিজগুণে সংশোধন করিবার উপদেশ দান করিলে অধীন পরমানন্দ অনুভব করিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণকালে অধীন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধে কাতর থাকায় প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল হওয়াতে স্থানে স্থানে ভুল প্রমাদ ঘটিয়াছে, সুধীবৃন্দ উহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া বাধিত করিবেন। আশা রহিল দ্বিতীয় সংস্করণে সাধ্যমত পরিমার্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে আবার ইহা শুদ্ধ কলেবরে পাঠক-সমাজে উপনীত হইবে। প্রথম সংস্করণে পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয়ে পোনের খানি প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের সুন্দর হাফ্টোন ফটো সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইতি।

আশ্বিন, সন ১৩১৭ সাল।
৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা।

অধীন গ্রন্থকার।

পরিশিষ্ট।

পশ্চিম তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিকা।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন যথা— সিদ্ধি, গাঁজা, নারিকেল ৮টা, সুপারি ৫০টা, হরিতকী ১২টা, যজ্ঞোপবীত ৫০টা রক্তচন্দন ২ খানা সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিল্বপত্র ২ দফা (এক-খানি বৈদ্যনাথজীউর অপরখানি কাশীর বিশ্বেশ্বরজীউর) সাদা চন্দন ৬ খানা, পঞ্চরত্ন ১০ দফা, আলতা দুই কুড়ি, চিনের সিন্দুর ২ বাণ্ডিল, সিন্দুর-চুবড়ী মায় সাজ ৬ দফা, লোহা (হাতে পরিবার) ২৫ গাছা, রুলি ১৪ জোড়া, সোণার নথ ৫টা, (কাশীর অন্নপূর্ণাদেবীর ১ দফা, কুমারী পূজায় ১ দফা, সাবিত্রীদেবী ১ দফা, বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরাধারাণী ১ দফা, অযোধ্যায় শ্রীশ্রীসীতাদেবীর ১ দফা,) সোনার তুলসীপত্র ৩ দফা, (বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ, শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ ও শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর স্বর্ণ বা রৌপ্যের নূপুর, বংশী, সাধ্যমতে, উহা ইচ্ছাধীন। দেবালয়ে বিতরণের নিমিত্ত সাড়ি লালপাড় ১০ জোড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে ভালরূপ বস্ত্র, থালা, ঘটি, দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এখান হইতেই সংগ্রহ করিবেন। পশ্চিমে প্রতি দেবালয়ে সন্ধ্যারতির সময় কর্পূরের আরতি হয় এই নিমিত্ত দেবালয়ে কর্পূর দিবার প্রথা আছে, আরও দেবালয়ে বিতরণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুযায়ী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্যের উল্লিখিত হইল উহা কেবল গরীব যাত্রীর নিমিত্ত, ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে অধিক পরিমাণে লইতে পারেন, কারণ দানের কোন কিছু বাঁধা নিয়ম নাই।

নিত্য ব্যবহার করিবার জন্য, যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া এই কয়টী সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইবেন, মশারি ১ দফা, বিছানা ১ দফা, হরিকেন ল্যাম্প ১টী প্রস্তুত অবস্থায় সদাসর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবেন, কেন না দূরদেশ যাইতে হইলে রেল গাড়ীতে রাত্রিকালে উঠিবার নামিবার এবং সিন্দুক পুঁটুলি ইত্যাদি দেখিয়া লইবার ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক বটি ১খানা, ছোট ভাল কুলুপ ১টী, পাকা রশি ১ গাছা (কূপ হইতে জল উঠাইবার নিমিত্ত) বাহির ব্যবহারের ঘটি ১টী, থালা গেলাস ১ দফা, নারিকেল তৈল ১ দফা, কিছু অম্ল (আচার) লোহার চাটু ১ দফা, খুন্তি ১ দফা, ক্লোরোডাইন, ১ শিশি যোয়ানের আরক ১ দফা, চিরুণী ১ দফা, দর্পণ ১ দফা, রেল গাড়ীতে অবস্থানকালীন জল খাইবার নিমিত্ত ১টী গেলাস, সর্ব্বদা বাহিরে রাখিবেন, এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি বালাম চাউল ভিন্ন অপর কোন চাউল সহ্য করিতে না পারেন, তাঁহারা এখান হইতে সংগ্রহ করিবেন, তথায় উত্তম আতপ তণ্ডুল পাইবেন। পরিধেয় বস্ত্র সামান্যরূপ লইলেই হইবে, কারণ পশ্চিমে সর্ব্বত্রই রজকের সুবিধা আছে কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যে স্থানে যে রজককে বস্ত্র ধৌত করিতে দিবেন, যে বাসাতে থাকিবেন তাহাদের জানিত রজককে দিবেন ইতি।

গ্রন্থকার।

পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

অশুদ্ধি সংশোধন পত্র।

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পংক্তি	পৃষ্ঠা
ষোরশাশের	ষোড়শাংশের	১৩	১
হয়	হন	১৫	৩
ইহা	এইস্থান	১২	৪
অন্তর্য্যামিন্	অন্তর্য্যামী	১১	৬
প্রভৃতিকে	প্রভৃতি দেবমূর্ত্তিদিগকে	২	২০
নাম শিবকোট নাম	শিবকোট নাম	১২	৩৭
আছে	আছেন	১৯	৩৯
ব্যতিত	ব্যতীত	১০	৪৫
কঙ্খলে	কনখলে	১৩	৪৫
যুবতি	যুবতী	৩	৬৩
.ককথা	কুকথা	৭	৯৪
ইই	এই	২	৯৮
ইইয়া	হইয়া	৫	১০১
ব্যতিরেকে	ব্যতীরেকে	১৫	১০৪
প্রেমপুর্ণ	প্রেমপূর্ণ	১৩	১০৩
স্মধিধা	সুবিধা	২১	১১৩
অত্যচ্চ	অত্যুচ্চ	১৬	১১৯
দেবী !	দেবি !	৫	১২১
দুংখ	দুঃখ	১২	১২৭

অশুদ্ধি সংশোধন পত্র।

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পংক্তি	পৃষ্ঠা
পূত্রের	পুত্রের	১৮	১৩৫
রাণী !	রাণি !	৭	১৩৮
অম্র	আম্র	২১	১৯৭
সেই	ঐ	৫	২১০
প্রস্রব	প্রসব	২	২১৬
দর্শনে	দর্শনের	২৫	২২৪
থুতু	থুথু	২	২৪১
ন্দ্রদ্যুম্ন	ইন্দ্রদ্যুম্ন	১৯	২৫১

স্বর্গত—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

তীর্থসেবকদিগের কর্ত্তব্য।

তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্ব দিবস গৃহে উপবাসপূর্ব্বক যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পূজাকরতঃ পরমানন্দে হৃষ্টচিত্তে যথানিয়মে শুভদিন, শুভলগ্নে যাত্রা করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতে হয়; এইরূপ করিলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। তীর্থস্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে নাই। অন্নার্থীকে অন্নদান, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান করিবেন এবং চরু, শক্তু, গুড় প্রভৃতির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবেন। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য বা আবাহন নাই। কি প্রশস্ত, কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে স্নানফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তীর্থযাত্রাজনিত ফললাভের আশা দুরূহ। তীর্থগমনদ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ দূর হয় সত্য, কিন্তু তাহারা অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না; যাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহারাই অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি পরের জন্য বেতনাদি লইয়া তীর্থে গমন করেন, তিনি ষোড়শাংশের একাংশ ফল প্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে কুশময়ী-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণকরতঃ তীর্থ-সলিলে নিমগ্ন করা যায়, তিনি অষ্টমাংশের একাংশ ফললাভ করেন, পুরাণে এইরূপ প্রকাশিত আছে। তীর্থে উপবাস ও শিরোমুণ্ডন করা কর্ত্তব্য, কারণ মুণ্ডনের ফলে শিরোগত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূরিত হইয়া থাকে। যে দিন তীর্থে উপস্থিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব দিবস উপবাস এবং তীর্থপ্রাপ্তি-দিবসে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে।

পুরাবিৎগণ কর্তৃক একটী প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। যে সকল সাধুর হৃদয়ে পরোপকার-প্রবৃত্তি জাগরূক থাকে, তাহাদের বিপদ-রাশি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্থস্থানে তাদৃশী শুদ্ধির আশা নাই। পরোপকার দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহুদান দ্বারা তাদৃশ ফল লাভ হয় না; পরোপকার দ্বারা যেরূপ পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, কঠোর তপস্যাতেও তাদৃশ পুণ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন, নানারূপ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই করীকর্ণাগ্রবৎ চপল। সুতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সাধন করাই মনীষী ব্যক্তির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যে নারী পতির আজ্ঞা না লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কোন তীর্থে গমন করেন, চরমে তাঁহাকে অধঃপতিত হইয়া শোচনীয় গতিলাভ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সস্ত্রীক তীর্থস্থানে গমনপূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে শুদ্ধচিত্তে পিণ্ডদান করেন, তাহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না; এবং সেই পিণ্ডকে রাম-সীতার পিণ্ড বলে। পিণ্ডদানের সময় স্ত্রীকে পিণ্ড উত্তোলন করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে হয়। পিতামাতা ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই; সকল তীর্থেই গুরু-গোবিন্দ একত্র দর্শনে বহু পুণ্য হয়।

মানস তীর্থের সংখ্যা অনেক। গয়াতীর্থ পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ; তনয়গণ ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পিণ্ডদানদ্বারা পূর্ব্বপিতামহগণের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে সকল তীর্থে স্নান করিলে পরমাগতি লাভ হয় কথিত হইল, সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, জ্ঞান ও তপ এই সমস্তই মানসতীর্থ জানিবে। চিত্তশুদ্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ প্লাবিত হইলেই তাহাকে প্রকৃত স্নান বলা যায় না, দমগুণ রূপ জলে স্নাত, রাগাদি-রহিত ও শূন্য বিষয়কামনা হইলেই প্রকৃত স্নাত বলা যায়। যে ব্যক্তি

লোভী, পিশুন, ক্রূর, দাম্ভিক ও বিষয়াসক্ত, সে সকল তীর্থে স্নাত হইলেও পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দূর হইলেই মানব নির্ম্মল হইতে পারে না, মানস-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধচিত্ত হওয়া যায়; অতিরিক্ত বিষয়াসক্তি মানস-মল বলিয়া কথিত।

যে চিত্তে দুষ্টতা নিহিত আছে, তীর্থস্থানে তাহার কিরূপে পরিশুদ্ধি হইবে? চিত্ত নির্ম্মল না হইলে দান, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্থসেবা সকলই অতীর্থস্বরূপ হয়। জিতেন্দ্রিয় হইয়া মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেইখানেই তাঁহার তীর্থস্থান। রাগ-দ্বেষরূপ মলবর্জ্জিত হইয়া, জ্ঞানরূপ জলপূর্ণ তীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করিতে পারেন, তিনিই পরমাগতি লাভ করিতে পারেন।

যে ব্যক্তি তীর্থে গমনপূর্ব্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ দান না করেন, তাঁহাকে জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থ-যাত্রা-ঘটিত যে ফল হয়, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে ব্যক্তির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও যিনি যথালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং অহঙ্কারবর্জ্জিত, তাঁহারই তীর্থফলপ্রাপ্তি হয়। পুণ্যশীলের কথা দূরে থাকুক, শ্রদ্ধাবান ধীর ও সমাহিত হইয়া তীর্থে গমন করিলে, পাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও হেতুবাদী—এইসকল লোক কদাপি তীর্থফলভোগী হইতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বদ্বন্দ্বসহিষ্ণু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থসমূহ পর্য্যটন করেন, অন্তিমে তাঁহারাই স্বর্গভোগী হইয়া থাকেন। তীর্থস্থানে কখন পাপকার্য্যে মতি রাখিবে না, কাহারও সহিত কখন কলহ করিবে না, 'ভক্তিই মুক্তি' এই সারগর্ভ উপদেশ-বাক্য হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথ জীউর দর্শন-যাত্রা।

কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলযোগে মেন লুপ লাইন দিয়া বৈদ্যনাথ নামক ষ্টেশনে নামিয়া দেওঘর ব্রাঞ্চ লাইনে উঠিয়া অবতরণ করিতে হয়। তথা হইতে ভারতবিখ্যাত বৈদ্যনাথ দেবের মন্দির দেড় মাইল পাকা রাস্তা দিয়া যাইতে হয়। দেবালয়ের নিকট চতুর্দ্দিকে পাকা বাসা বাটী পাওয়া যায়। পশ্চিম তীর্থের পাণ্ডাদিগের মধ্যে এই নিয়ম যে, যদ্যপি কোন যাত্রীর কোন পূর্ব্বপুরুষ তথায় গমন করিয়া কোন পাণ্ডাকে তীর্থ-গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই পাণ্ডা বা তাহার অবর্ত্তমানে তাহারই বংশধরদিগকে তীর্থ-গুরু বলিয়া মান্য করিতে হইবে। পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগের বিশ্বাসার্থ তাহাদের খতিয়ান বহি দেখাইয়া নানাপ্রকারে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইবে। বৈদ্যনাথজীউ দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে একটি মহালিঙ্গ। রাত্রিকালে দেবের আরতি ও পূজা-দর্শনে ভক্তির সঞ্চয় হয়। ইহা ৫১ পীঠের মধ্যে একটী পীঠস্থান; এখানে দেবীর হৃদয় পতিত হওয়ায় তিনি জয়দুর্গা নামে বিরাজ করিতেছেন। এই মহালিঙ্গ ভিন্ন এখানে আরও বাইশটী দেবদেবীর মন্দির আছে।

বৈদ্যনাথ দেবের পূজার পূর্ব্বে শিবগঙ্গা নামে যে দীঘি আছে, প্রথমে উহাতে স্নান ও সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্পকালীন পৈতা, সুপারি ও একটী পয়সা লইয়া তীর্থ-গুরু [পাণ্ডা] দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পরে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া বাবার মন্দিরে নৈবেদ্যাদি যথা,—আতপ তণ্ডুল, বিল্বপত্র, সিদ্ধি, গাঁজা, দুগ্ধ, ধুতুরা ফল ও ফুল, গঙ্গাজল
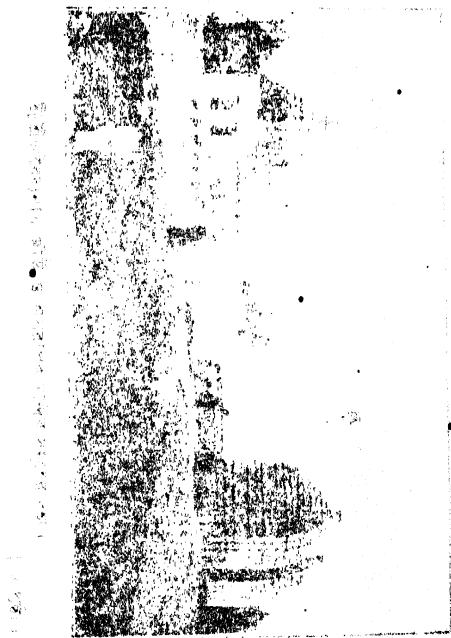
রক্তচন্দন ইত্যাদি ও সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিল্বপত্রাদি পূজার দ্রব্যসকল সংগ্রহপূর্ব্বক লিঙ্গরাজকে অর্চনা করিয়া তুষ্ট করিবেন এবং স্বহস্তে বিল্বপত্র দ্বারা দেবাদিদেবকে ভক্তিসহকারে ভক্তিদান করিবেন; কেননা তিনি বিল্বপত্রে যত সন্তুষ্ট, জগতে অপর কোন দ্রব্যেই তাঁহাকে এত অধিক সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। বৈদ্যনাথ কর্ম্মনাশা নদীর উপর অবস্থিত; ঐ কর্ম্মনাশা নদীর জলে কোন দেবদেবীর পূজা হয় না। কারণ, কথিত আছে ঐ কর্ম্মনাশা নদী রাবণের প্রস্রাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শিবগঙ্গা নামে যে হ্রদ, উহাকেই কর্ম্মনাশা নদী বলা হয়, এরূপ জনশ্রুতি আছে।

দেবমন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে পূর্ব্বদিকে তপোবন বা পঞ্চকূট বন। পঞ্চকূটবনে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণসহ বনবাসকালীন বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতবেষ্টিত মনোহর দৃশ্যসকল নয়নগোচর হইলে কত আনন্দ অনুভব হইবে। তপোবনের সেতুপারদৃশ্য অবলোকন করিলে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়।

শিবগঙ্গা নামে হ্রদের অর্চনার কারণ প্রকাশিত হইল। কথিত আছে, একদা রাজা দশানন ব্রহ্মার বরে বলীয়ান হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন, যথাসময়ে কৈলাস পর্ব্বতের নিকটস্থ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভূতনাথ মহেশ্বরকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিব। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার সকল আশা পূর্ণ হইবে, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহার ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন; ইহাতে কোনরূপ ফলোদয় না দেখিয়া নানাপ্রকার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতেও কোন সুফল প্রাপ্ত হইল না দেখিয়া অবশেষে নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। কোনরূপেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া রাজা দশানন হতাশমনে তাঁহার হৃদয়-

সর্ব্বস্ব ব্রহ্মাকে স্মরণপূর্ব্বক দুঃখে ও ক্রোধে সেই কৈলাসগিরি হস্তবেষ্টিত করিয়া কম্পান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন এক আকাশবাণী শ্রুত হইল। "রাজন্! তুমি সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা আশুতোষের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।" লঙ্কেশ্বর রাজা দশানন সেই দৈববাণী-অনুসারে সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা ভোলানাথের অর্চ্চনায় রত হইলেন। তখন ভগবান্ ভূতনাথ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক অভয়-বচন-সুধাদানে বলিলেন, "দশানন তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অভিলষিত "বর" প্রার্থনা কর।" তখন রাজা দশানন সেই পূর্ণকান্তি তেজোময় মহাপুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। "দেব! আপনি লিঙ্গসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রদ বিশ্বেশ্বর! অন্তর্য্যামিন্! যদ্যপি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কৃপাপূর্ব্বক অধীনকে এই বর প্রদান করুন,—যেন আমি সহজে আপনাকে নিজস্কন্ধে স্বীয় পুরে লইয়া গিয়া স্থাপন করিতে পারি এবং পুরীরক্ষার ভার দিয়া সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই।" ভক্তবৎসল রাজার করুণ প্রার্থনায় এই চুক্তিতে সম্মত হইলেন যে যদি তুমি আমাকে সরাসর নিজস্কন্ধে নিজপুরে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি; কিন্তু স্থির জানিও, যদ্যপি পথিমধ্যে কোন কারণ-বশতঃ আমাকে কোথাও স্থাপন কর, তাহা হইলে আমি তথা হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব না। বলদৃপ্ত লঙ্কেশ্বর মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই, যাঁহাকে কত শত বৎসর স্তব করিয়া কত মহাঋষি ধ্যান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন না, আজ আমি সহজেই সেই দেবাদিদেবের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইলাম। ব্রহ্মা ও মহেশ উভয়ের কৃপায় আমি নির্ব্বিঘ্নে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হইব, সন্দেহ নাই। গর্ব্বিত রাবণ এইরূপে তাঁহার চুক্তিতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে নিজস্কন্ধে স্থাপনকরতঃ রথারোহণে নিজপুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দেবগণ এই সমস্ত অবগত হইয়া মহাচিন্তান্বিত হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া এই স্থির করিলেন যে বরুণদেব ভিন্ন ইহার উপায় দেখা যায় না। অতএব বরুণ তুমি ত্বরিতগমনে রাজা দশাননের উদর মধ্যে বায়ুরূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক নিজপ্রভাবে তাহাকে বিচলিত কর। দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বরুণ দেব তৎক্ষণাৎ দশাননের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজপ্রভাবে তাঁহাকে অস্থির করিলেন। রাজা দশানন দেবচক্র কিছুই অবগত ছিলেন না। সহসা তিনি প্রস্রাব-পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিকটে দেখিলেন। ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপর কেহই নহেন, ছদ্মবেশধারী এক দেবতামাত্র। তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া করুণস্বরে তাঁহার আরাধ্যদেবকে অল্পসময়ের জন্য মস্তকে লইয়া অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যে না আসিলে তিনি তাহার দেবতাকে ভূমে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিবেন এইরূপ চুক্তি করিলেন; কেননা তিনি অতি বৃদ্ধ হওয়ায় শক্তিহীন হইয়াছেন। রাজা দশানন বৃদ্ধের বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহার মস্তকে শিব স্থাপন করিয়া অল্পক্ষণের সময় লইয়া প্রস্রাব করিতে গমন করিলেন। বরুণদেবের প্রভাবে রাবণ রাজার প্রস্রাব আর শেষ হয় না; প্রস্রাবের প্রভাবে নদীতে ঢেউ উঠিল, তথাপি বিরাম নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সময় পাইয়া রাবণকে বারম্বার ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি অচৈতন্য অবস্থায় প্রস্রাব-সুখ অনুভব করিতে ছিলেন। বৃদ্ধের বচন কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও উত্তর দিলেন না। বৃদ্ধ তখন সুবিধা বুঝিয়া রাবণকে বলিয়া সেইস্থানে তাঁহার ঠাকুরকে ভূমে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রাবণ বহু সময় নষ্ট করিয়া সেই শিবস্থানে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "দেব! আপনি যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশ্বমেধ, দানের মধ্যে অভয়দান, লাভের মধ্যে পুত্রলাভ, ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু, যুগ মধ্যে সত্যযুগ, তিথিসমূহের মধ্যে

অমাবস্যা, নক্ষত্রবৃন্দ মধ্যে পুষ্যা, পর্ব্বসমূহ মধ্যে সংক্রান্তি, আপনি সদয় হইয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করুন।" তখন ভগবান মহেশ্বর জলদগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "দশানন! তুমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। এইস্থান হইতে আমি আর একপদও অগ্রসর হইব না, তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইবে।" দশানন বারম্বার নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন কোন ফলোদয় হইল না দেখিলেন, তখন তিনি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি এক বজ্র মুষ্টাঘাত করিয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "আমার পুরে কত সুখভোগ করিতে পারিতেন, এই নির্জ্জন স্থানে কত সুখে থাকিবেন একবার বিবেচনা করুন? যদি একান্ত না যাইবেন, তবে এইখানেই অবস্থান করুন।" অদ্যাপি যাত্রীগণ লিঙ্গোপরি যে ক্ষতস্থানের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, উহাই রাজা দশাননের মুষ্টাঘাতের চিহ্ন বলিয়া খ্যাত আছে এবং যে হ্রদে সঙ্কল্প করিতে হয়, উহা সাধারণ রাবণের প্রস্রাব বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা তাহা নয়, বরুণদেব সাক্ষাৎ এখানে সলিলরূপে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে রাবণ কর্ত্তৃক মহাদেব কৈলাস হইতে মর্ত্তে আনীত হইয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। এক সাধু পুরুষ ঐ বনমধ্যে বহুকাল অবধি তপস্যায় রত ছিলেন। ভগবান তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া নিজ আগমন-বার্ত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধু নিত্য তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া চরিতার্থ হইতেন, ক্রমে জনসমাজে মহেশ্বরের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে এক ধর্ম্মাত্মা তাঁহার মন্দির ও সন্নিকটস্থ দেবমন্দির সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করেন। শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এখানে অত্যন্ত জনতা হইয়া থাকে। সচরাচর যে জনতা দেখা যায়, তখন তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ভক্ত আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এখানে প্রভুর চাকিতে কিছু দান করিতে হয় এবং অন্য তীর্থস্থানে যাত্রার পূর্ব্বে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইতে হয়।

গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন-যাত্রা।

গয়া।

কলিকাতা হইতে ই, আই, আর গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে যাত্রা করিলে আর কোথাও গাড়ি বদল করিতে হয় না, নতুবা বাঁকিপুর জংশনে গাড়ি বদল করিয়া গয়া যাইতে হয়। গয়া ষ্টেশন হইতে তীর্থস্থানে পৌছিতে প্রায় তিন মাইল পথ সাহেবগঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ঘোড়ার গাড়ি বা এক্কাগাড়ি পাওয়া যায়! গয়া একটী জেলা মাত্র। ইহার অধিকাংশ বসতিই ফল্গুতীরে। হিন্দুগণ ফল্গুতটে এবং অধিকাংশ মুসলমান সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। এখানে অনেক বাঙ্গালীকেও বাস করিতে দেখা যায়। গয়ার লোকসংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইবে।

গয়া প্রদেশ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র ফল্গুনদী, পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রামশিলা ও দক্ষিণে ব্রহ্মমোহন পাহাড় বিরাজমান আছে। পাহাড়ের উপর উঠিয়া গয়ার সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। গয়ার চতুর্দ্দিকই প্রায় পাহাড়ে বেষ্টিত আছে।

যাত্রীগণ গয়ায় উপস্থিত হইলে গয়ালীরা প্রায়ই চাঁদচৌড়ার বাজারের উপর বাসা দান করেন, ইহাতে যাত্রীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়; কারণ গয়া তীর্থশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত, এ হেন গয়াতে সকলেরই তিন রাত্রি বাস করা কর্ত্তব্য। প্রত্যহ ফল্গুনদীতে স্নান ও দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে হইলে অনেক দূর বৃথা হাঁটিতে হয়। এই নিমিত্ত যাত্রীগণ চাঁদচৌড়ার

পরিবর্ত্তে ফল্গুতীরে গয়ালীদের যে বাসাবাটী আছে, সেইস্থানে ইচ্ছানুসারে বাসা লইবেন; তাহা হইলে, দেবার্চ্চনা ও নিত্য স্নানের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। এখানে বাজার নিকটে থাকায় সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়া থাকে। বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দিরে যাইবার পথে ক্রমে উপরে উঠিতেছি এইরূপই মনে হয়।

প্রথমে তীর্থ-পদ্ধতি-অনুসারে ফল্গুনদীতে সঙ্কল্প ও অর্চ্চনা করিয়া স্নান-তর্পণ করিতে হয়, পরে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যাবাই যে প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর বাঁধান ঘাট তীরে যাত্রীদিগের সুবিধার্থ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেই ঘাটে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়; তৎপরে অক্ষয়বটবৃক্ষতলে এবং সর্ব্বশেষ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবার নিয়ম। এই অক্ষয়বটবৃক্ষতলে পিণ্ডদান করিয়া মনোমত ফল কামনা করিয়া একটি ফল দান করিয়া উহা জন্মের মত ত্যাগ করিতে হয় অর্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন ঐ ফল খাইতে ইচ্ছা করিবেন না। পিণ্ডদানের পর এইস্থানে একটি ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইলে বহু পুণ্য উপার্জ্জন হয়।

ফল্গুনদীর পূর্ব্বপারে পাহাড়ের উপরে যে দেবালয় আছে, উহাকে সীতাকুণ্ড বলে। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে তদীয় ভ্রাতা ভরত পিতৃ-পিণ্ডাদি-সমাপনান্তে এইস্থানের অনতিদূরে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি এবং রামশোকে মৃত দশরথ যেরূপ প্রকারে সীতাদেবীর নিকট বালির পিণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ একটী মূর্ত্তি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করেন। এখানে সীতাদেবীকে সিন্দূর দিতে হয় এবং ফল্গুতটে বালির পিণ্ডদান করিতে হয়। এখানে বালপুর নামে একটী ছোট গ্রাম আছে, পূর্ব্বে ইহাই গয়ার প্রধান নগর ছিল; অদ্যাপি এখানে তসর, চেলি, বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।
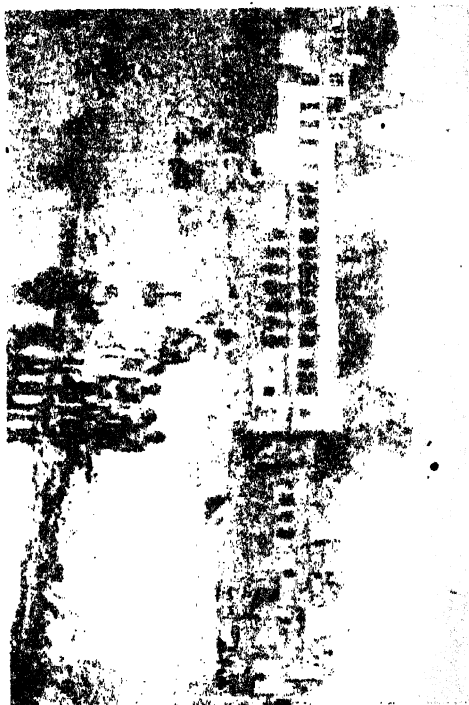
রামশিলা পাহাড়।

এই রামশিলা-গিরিজাত নদীর সঙ্গমস্থলে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহ স্নান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম রামশিলা তীর্থ হইয়াছে। শ্রীভরত নিরন্তর এইস্থানে পুণ্যবান্ লোকদিগের সহিত বাস করিতেন এবং তৎকর্ত্তৃক রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও বহুতর ঋষিমূর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এই পাহাড়ের উপরিভাগে একটী শিব-মন্দির বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে এই পাহাড়ে উঠিবার সোপান ছিল না। প্রাতঃস্মরণীয় টিকারীরাজ রণবাহাদুর সিং বহু অর্থব্যয়ে ইহাতে তিনশত ধাপ সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া সাধারণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

ব্রহ্মযোনি পাহাড়।

এই পাহাড় গয়ার পাহাড়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। ইহার ধাপ সাড়ে তিনশত। এই সোপানগুলি মহারাষ্ট্রীয়া মহারাণী অহল্যাবাই দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে—শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী ও সরস্বতী-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়ের পার্শ্বে একটি কুণ্ড দেখা যায়, ইহাতে চতুরানন ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়া গো-দান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাত্রীগণ সেই গোষ্পদচিহ্ন এখানে দেখিতে পাইবেন। আরও ইহাতে ব্রহ্মযোনি নামে এক গুহা আছে। এই গুহায় প্রবেশ করিয়া তদভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইলে আর তাহাকে জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং তাহার অন্তিমকালে পরমপদ লাভ হয়।

ফল্গুনদী।

গয়াসহরের একমাত্র ভরসা ফল্গুনদী। বর্ষাকাল ভিন্ন সকল সময়েই ইহা শুষ্কপ্রায় থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহা জলপূর্ণ হইয়া প্রবল স্রোতে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহকে প্লাবিত করিয়া থাকে। হাজারিবাগের

পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া মোকামার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। পুরাকালে ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং হরি সলিলরূপে অবতীর্ণ হন। দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকালে ব্রহ্মা যে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই ফল্গুর উৎপত্তি হইয়াছে। যে গঙ্গাতীর্থের এত মহিমা এবং সেই গঙ্গা যে বিষ্ণুর চরণোদক, সেই হরি স্বয়ং দ্রব হইয়া ফল্গুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই হেতু গঙ্গা হইতে ফল্গুর মহিমা অধিক।

কথিত আছে যে, সীতাদেবী অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ফল্গু অন্তঃসলিলা। একদা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ ফলাহরণে গিয়াছেন, সীতাদেবী বিষ্ণু-পাদপদ্মের নিকটে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে মৃত দশরথ সীতার নিকট পিণ্ড-যাচ্ঞা করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, প্রভু নিকটে নাই, আমি কি প্রকারে পিণ্ডদান করিব; তখন দশরথ তাঁহাকে বালুকার পিণ্ডদান করিতে অনুমতি করিলেন। সীতাদেবীও তাঁহার আদেশমত পিণ্ডদান করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ফিরিয়া অসিলে সীতাদেবী তাঁহাদের নিকট এই অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ করিলেন এবং নিকটবর্ত্তী ফল্গুনদী ও বটবৃক্ষকে ইহার সত্যাসত্যতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি করিলেন। বটবৃক্ষ দেবীর আজ্ঞামাত্র বালির পিণ্ডদানের বিষয় সমস্তই সত্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না ফল্গু কি ভাবে কি ছলে বালির পিণ্ডদান মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিল। এই নিমিত্ত সাধ্বীসতী সীতাদেবী ক্রুদ্ধা হইয়া ফল্গুকে তুমি 'অন্তঃসলিলা হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং বটবৃক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অক্ষয় হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এই নিমিত্ত অদ্যাপি বট সীতাদেবীর আশীর্ব্বাদে অক্ষয় হইয়া তাঁহার শ্রীচরণধ্যান করিতেছে। আর যে ফল্গু স্বয়ং শ্রীহরি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আজ সতী সীতাদেবীর ক্রোধে তাহাকে শাপগ্রস্ত হইয়া অন্তঃসলিলা হইতে হইল। মায়াময়ের অনন্তলীলা, তিনি লীলাবশে নানাস্থানে নানাভাবে নানাপ্রকার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। প্রমাণস্বরূপ সাধ্বী সতী গান্ধারী

ও সীতাদেবীর অভিশাপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ন্যায় সামান্যবুদ্ধি নরে কিরূপে উহা ভেদ করিবে?

গদাধরের পাদপদ্মের মন্দির।

মহারাণী অহল্যাবাই এই সুন্দর প্রস্তরময় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। দূর হইতে এই মন্দির দেখিলে ঠিক একখানি কৃষ্ণবর্ণ পাথরের ন্যায় বোধ হয়; ইহার শিখরদেশে একটী স্বর্ণনির্ম্মিত চূড়া ও ধ্বজা আছে। সম্মুখেই নাট মন্দির, ইহার চতুর্দ্দিকই প্রস্তর বাঁধান, মধ্যে একটী বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকিয়া যেন ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করিতেছে। এই নাট মন্দির কতকাল প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, যেন ইহা নূতন। মন্দির-অভ্যন্তরে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম বিরাজমান। ভক্তগণ তথায় পিতৃপুরুষ-গণের পিণ্ডদান করিয়া ঋণ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই পাদ-পদ্ম যিনি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিও ধন্য, তাঁহার জন্ম ধন্য ও তাঁহার ক্রিয়াসকলই ধন্য!

এই শ্রীমন্দিরের চতুঃপার্শ্বে নানা দেবদেবীর দেবালয়; তন্মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণজীউ ও পাতালপুরীতে মহীরাবণের কালী-বাড়ীর সম্মুখে মহাবীর হনুমানের স্কন্ধে রাম-লক্ষ্মণ-মূর্ত্তি দর্শনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। মন্দিরের দক্ষিণদিকে যে একটি বৃহৎ কুণ্ড প্রাচীরবেষ্টিত আছে, বহু [উত্তর-পশ্চিম-দেশীয় যাত্রী] এই কুণ্ডের তীরে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, ইহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরদিকে শ্রীসূর্য্য-দেবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। তাঁহার অর্চ্চনা করিলে শরীরস্থ ব্যাধি-সকল দূর হইয়া থাকে।

গয়াতীর্থের উৎপত্তি।

ত্রিপুরাসুরের গয়াসুর নামে এক মহা বৈষ্ণব ও পরাক্রমশালী পুত্র ছিলেন। তিনি পিতৃসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া অবগত হইলেন যে

দেবতারা ছল করিয়া তাঁহার পিতৃদেবকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া পিতৃ-অরি দেবগণের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং অমর দেবগণকে বারম্বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন, তখন দেবগণ গয়াসুরের অমিতবিক্রমে ত্রাসিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণকর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া এবং তাঁহাদিগকে ভীতচিত্ত বোধ করিয়া বৈকুণ্ঠপতির আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন এবং দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া আরও বলিলেন যে তিনিও তাহাদের পশ্চাৎগামী হইবেন। সূর্য্যের নিকট হইতে লক্ষ যোজন উপরে চন্দ্রমা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, চন্দ্রমা হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শুক্র, শুক্র হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে নিযুতদ্বয় যোজন ঊর্দ্ধে বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে শনি, শনি হইতে দুই লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে ধ্রুব অবস্থিত, ধ্রুব হইতে চতুর্কোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক, সত্যলোক হইতে এক যোজন উপরিভাগে বৈকুণ্ঠ শোভা পাইতেছে। দেবগণ কৃতাঞ্জলিপুটে সেই বৈকুণ্ঠপতির নিকট মনোবেদনা প্রকাশ করাতে তিনি ব্রহ্মাকে পশ্চাতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে একটি যজ্ঞ আহূত করিতে আদেশ করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি স্বয়ং বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণের ক্লেশ দূর করিবেন বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ব্রহ্মাকে যজ্ঞের স্থান গয়ার পবিত্র শরীর নির্দ্দেশ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন। ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠ হইতে গয়াসুরের নিকট দেবগণসহ আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

ব্রহ্মাকে দেবগণসহ অতিথিরূপে আগত দেখিয়া গয়াসুর প্রথমে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; অবশেষে স্থির করিলেন, যে যাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য সকলে লালায়িত হয়, আজ আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইব, ইহা কখনই হইতে পারে না। এইরূপ

চিন্তা করিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ ! আপনি স্বয়ং অতিথিরূপে আগত, অদ্য আমার জন্ম সফল বোধ করিতেছি। আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।" ব্রহ্মা গয়াকে বলিলেন, "আমি একটী যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি ; পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহাদের অপেক্ষা তোমার শরীর পবিত্র ; এই নিমিত্ত যজ্ঞার্থে তোমার পবিত্র শরীর আমায় দান কর।" গয়াসুর ব্রহ্মার বাক্যে সম্মত হইয়া কোলহল পর্ব্বতের নৈঋত দিকভাগে শিরপ্রদেশ, যাজপুরে নাভি, চন্দ্রভাগাতে পাদদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনাকে আমার এই শরীর প্রদান করিলাম, আপনি ইচ্ছানুরূপ যজ্ঞ আরম্ভ করুন। বিধাতা তখন আপন মানস হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিলেন। গয়াসুর যজ্ঞে আবদ্ধ হইল, ব্রহ্মা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যাজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ ব্রহ্মসরোবরে রাখিয়া যজ্ঞভূমে গিয়া গয়াসুরকে চলিতে দেখিয়া ভীতমনে ধর্ম্মরাজকে তদীয় গৃহস্থিত ক্রোশব্যাপী অতিভার শিলা [শাপভ্রষ্টধর্ম্মব্রতা] গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ আদেশমাত্র উহা পালন করিলেন ; কিন্তু মহাপরাক্রমশালী গয়াসুর অতিভার শিলা লইয়াও চলিতে লাগিল দেখিয়া, বিধাতা সমস্ত দেবগণকে স্ব স্ব বাহনে ঐ শিলার উপর উপস্থিত হইতে বলিলেন ; রুদ্রাদি দেবগণ অচলভাবে ঐ শিলার উপর অবস্থান করিয়াও তাহাকে নিশ্চল করিতে পারিলেন না। তখন তিনি চিন্তান্বিত হইয়া জগৎচিন্তামণি শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। ধন্য গয়াসুর ! ধন্য তোমার প্রেম ও ভক্তি ! যে বিধাতার ইঙ্গিত-মাত্র সৃষ্টিস্থিতি লয়প্রাপ্ত হয়, আজ তাঁহাকে তোমার ন্যায় ভক্তবীরের নিকট পরাজয়-স্বীকার করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে হইল। ভক্তবৎসল ভগবান ! এইরূপেই তুমি ভক্তের মান বৃদ্ধি করিয়া থাক। আর এই নিমিত্ত তোমার নাম "হরি" গ্রহণ করিয়াছ ; কেন না, তুমি সকল প্রাণীর সকল সময় সকল বিষয় হরণ করিয়া ভক্তের মান বৃদ্ধি কর ;—উদাহরণস্বরূপ এই ব্রহ্মার যজ্ঞ

স্থল। ব্রহ্মা যজ্ঞেশ্বর হরিকে স্মরণ করিবামাত্র যজ্ঞভূমে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণকরতঃ ঐ শিলার উপরে একপদ স্থাপন করিলেন। সেই শ্রীপদস্পর্শে গয়াসুর দিব্যজ্ঞানে দেবতাদিগের ছল জানিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে যজ্ঞেশ্বর! তুমি যে একপদ স্থাপন করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; আর যেন দ্বিতীয়পদ না দেওয়া হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি আপনার আদেশমাত্র নিশ্চল হইতাম না, সুরগণ বৃথা আমায় এরূপ কষ্ট দিতেছেন কি নিমিত্ত?" গদাধর ভক্তবীর গয়াসুরের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পূর্ব্ব হইতে গয়ার মনে একটি অভাব ছিল; এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন "যদ্যপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে যতদিন পৃথিবী, পর্ব্বত, নক্ষত্র চন্দ্র ও সূর্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এই শিলাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবগণ যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলকেই সর্ব্বদা এইস্থানে অবস্থান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্র আমার নাম অনুসারে কথিত হউক, ইহাতে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ আসিয়া লোক-হিতার্থে অবস্থান করুক। এই তীর্থে স্নান, তর্পণ করিলে লোকে পিণ্ডদানের অধিক ফল প্রাপ্ত হইবে; যাহারা পিণ্ডদান করিবে, তাহারা আপনি মুক্ত হইবে এবং সহস্রকুলকে মুক্ত করিবে। কিন্তু হে গদাধর! আপনাকে স্বয়ং তাহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিতে হইবে। এইস্থানে যাহারা পিণ্ডদান করিবে, তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে স্থান দিতেই হইবে; এইক্ষেত্রে আসিয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলে তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপ হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গা, প্রভাস ও অন্যান্য তীর্থসকল আসিয়া অবস্থান করিবে; কিন্তু হে দেবগণ! আপনাদের মধ্যে একজনও যদি কখন এক্ষেত্র ত্যাগ করেন, বা যেদিন আমার মস্তোকপরি কাহারও পিণ্ডদান না হইবে, সেইদিন আমি তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধযাত্রা করিব। যজ্ঞেশ্বর হরি, ভক্তের সকল আশাই পূর্ণ করিলেন। পরোপকারী মহাবীর গয়াসুরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীহরির কৃপায় সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ গয়াতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

কথিত আছে, গয়ার পাণ্ডাগণ এই বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একদিন পিণ্ডদান করেন নাই; সন্ধ্যার সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তখন তাঁহারা পিণ্ডপ্রদান করিয়া নির্ভয়চিত্তে অবস্থান করিলেন। বিষ্ণুপাদপদ্মের তলদেশে যে দীর্ঘাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয়, উহাই গদাধরের পদচিহ্ন বলিয়া কথিত।

যে সকল ভক্ত গদাধরের পদচিহ্ন নিজালয়ে লইয়া আসিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্ব্বদিবস দুই আনা পয়সা জমা দিলেই নূতন কাপড়ের উপর গদাধরের পাদপদ্ম অঙ্কিত পাইবেন। প্রত্যহ দিবাভাগে পিণ্ডদান লইয়া অত্যন্ত জনতা হয়; এই নিমিত্ত পাদপদ্মদর্শনে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। প্রতি রাত্রিতে যখন শৃঙ্গারবেশ হইয়া আরতি হয়, তখন সেই পাদপদ্ম চন্দনলিপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেন; সেই সময় সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই অমূল্য রত্নকে একবার দর্শন করিতে অনুরোধ করি।

যজ্ঞকালে ব্রহ্মা যে সকল ব্রাহ্মণ সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকে এই তীর্থস্থানে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়া পঞ্চাশ খানি গ্রাম, পঞ্চক্রোশী গয়াতে যথেষ্ট উপকরণ, সুন্দর সুন্দর গৃহসকল, কামধেনুসকল, ঘৃতপূর্ণ নদী, দধিপূর্ণ সরোবর, অন্নপূর্ণ পাহাড়, প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিলেন এবং অনুমতি করিলেন যে আমি তোমাদের যাহা দান করিলাম, ইহাই তোমাদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহাতেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিও, কাহারও নিকট কখন কিছু প্রার্থনা করিও না—এই বলিয়া ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। কিয়ৎ-কালপরে ধর্ম্মারণ্য নামে এক মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ হইল, এই যজ্ঞে এই

সকল ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রিত হইলেন; ইঁহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ধনাদি রত্নসকল গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মা সেই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমাদের বিষয়তৃষ্ণা ফলবত হইবে, তোমরা বিদ্যাহীন হইবে, অন্নাদির পর্ব্বত পাষাণময় হইবে, নদীসকল জলমগ্ন হইবে, গৃহসকল মৃত্তিকাময় হইবে, এবং কামধেনুসকল স্বর্গে যাইবে। অভিশপ্ত ব্রাহ্মণগণের জীবিকানির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই দেখিয়া ব্রহ্মা দয়া করিয়া বলিলেন যে যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন তোমরা এই তীর্থ হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। গয়াতীর্থে আসিয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি করিয়া তোমাদের পূজা করিবে, আমার বরে সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। শাপগ্রস্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ এক্ষণে গয়ালীনামে খ্যাত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত যাত্রীগণ এই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে ইঁহাদের নারিকেল, পৈতা ও টাকা দিয়া চরণপূজা করিয়া থাকেন এবং সাধ্যমত প্রণামি দান করিয়া সুফল গ্রহণ করেন। চৈত্রমাসে মধুগয়া ও ভাদ্রমাসে সিংহগয়া করিবার জন্য বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আসিয়া থাকেন।

বুদ্ধ-গয়া।

গয়া হইতে প্রায় ছয় মাইল পাকা রাস্তা দিয়া ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে যাইতে হয়, কিম্বা পদব্রজে যাওয়া যায়। এইস্থানে পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের তপস্যাশ্রম ছিল, এইনিমিত্ত ইহার নাম বুদ্ধগয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মন্দির, পুরীর মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। এই মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এখানেও নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পঞ্চপাণ্ডব,-মাতা-কুন্তী-দেবীসহ বিরাজ করিতেছেন। বুদ্ধগয়াতে যে বৃহৎ মঠ আছে ও উহাতে যে সকল সন্ন্যাসী বাস করেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হয়। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে বুদ্ধদেবের যে একটী সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি ও আর যে একটি কাচমধ্যস্থ স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তদ্দর্শনে চিত্তে পরম ভক্তির উদ্রেক হয়।

বুদ্ধগয়া।

[১৮ পৃষ্ঠা]
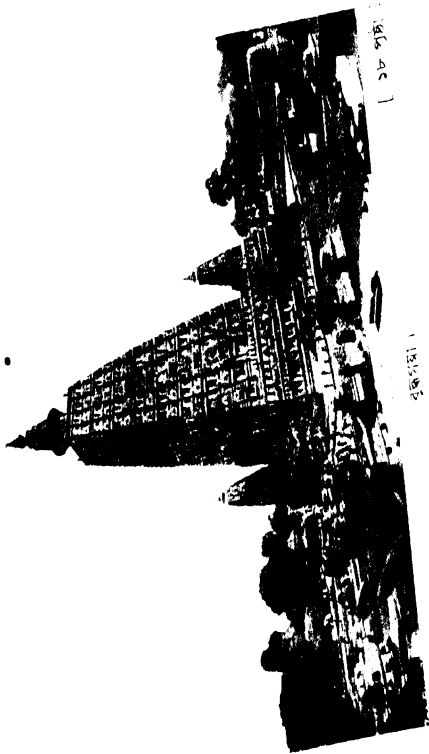
কাশীর বিশ্বেশ্বরজীউর দর্শন-যাত্রা।

গয়া ষ্টেশন হইতে কাশী যাইতে হইলে ই, আই, রেলযোগে মোগল-সরাই নামক ষ্টেশনে নামিয়া আউদ-রোহিলখণ্ড রেলে কাশী বা বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পাকা রাস্তা দিয়া তীর্থস্নানঘাটে পৌছিতে হয়। কাশী একটী বিখ্যাত সহর; এখানে পুলিশ, জজকোর্ট প্রভৃতি যাহা কিছু আবশ্যক—ঘোড়ারগাড়ী একাগাড়ি বা আহারীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই। কাশীতে সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকসকলকে বাস করিতে দেখা যায়।

কাশী হিন্দুদিগের একটী পুরাতন মহাতীর্থস্থান। এখানে জীবগণ শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া পরমব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হয়। এই নিমিত্ত ইহার নাম কাশী হইয়াছে। কাশীতে যত দেবালয় আছে, অপর কোন তীর্থস্থানে তত দেখিতে পাওয়া যায় না। কাশীর বাজার বা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলে নূতন যাত্রীদিগকে সহজেই ভ্রমে পতিত হইয়া দিশা-হারা হইতে হয়, কারণ এখানকার সমস্ত গলিগুলি প্রায় একইরূপ দেখিতে। যাত্রীগণ কাশীধামে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইবেন। প্রথম দিবসেই চক্রতীর্থ বা মণিকর্ণিকাতে স্নান করিতে হয়। স্নান করিবার সময় পৈতা, শুপারি, পঞ্চরত্ন, নারিকেল ও পুষ্পের আবশ্যক হইবে, তীর্থপদ্ধতি-অনুসারে প্রথমে এই চক্রতীর্থে সঙ্কল্প করিয়া স্নান-তর্পণ করা বিধেয়। স্নান-সমাপনান্তে তীর্থঘাটের উপরিভাগে ৺তারক-ব্রহ্ম তারকেশ্বর ও ঈশানেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া দর্শন করিবেন। এই প্রভু অন্তিমসময় কাশীবাসীগণের কর্ণকুহরে স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা তারক-ব্রহ্ম নাম প্রদান করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। এই নিমিত্ত কাশীতে জীবগণ মৃত্যুকালীন দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

এহেন কাশীতে কাহার না বাস করিতে ইচ্ছা হয়? তৎপরে ঢুণ্ডিরাজ, গণেশজী, দণ্ডপাণি, শূলপাণি, মহেশ্বর ও মহাবিষ্ণু প্রভৃতিকে দর্শন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এত কষ্ট ও অর্থব্যয় করিয়া এইস্থানে আসিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ভক্তি-সহকারে প্রবেশকরতঃ তাঁহার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া অর্চ্চনা ও পূজা করিবেন। পূজার সময় আতপ-তণ্ডুল, গাঁজা, সিদ্ধি, দুগ্ধ, গঙ্গাজল, রক্তচন্দন, পুষ্প, বিল্বপত্র, সাধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপোর বিল্বপত্রদ্বারা এবং নৈবেদ্য প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তিদান করিয়া পূজা করিবেন। পূজাসমাপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়; সেইসময় নানাপ্রকার শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন। সম্মুখেই নাটমন্দির বিশ্বেশ্বরের বাহন ও অপরাপর লিঙ্গসকল দর্শন করিবেন। কাশীতে সাধ্যমত দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন, এখানে কখন কাহারও সহিত অসৎ ব্যবহার বা কলহ করিতে নাই বা কোনরূপ পাপ-কার্য্যে মন দিতে নাই। বিশ্বেশ্বরের সুবর্ণমণ্ডিত অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মন্দির; তাহার চূড়ার উপর ত্রিশূল ও তৎপার্শ্বে স্বর্ণেরপতাকা বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে,—এই সকল দর্শন করিলে যে কত আনন্দ অনুভব হইবে তাহা এই সামান্য লেখনীর দ্বারা কিরূপে জানাইব? যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে তাহাকেই তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন।

প্রতি সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের আরতি হইয়া থাকে। এই আরতি সকল কর্ম্ম পণ্ড করিয়া দর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কারণ ঘণ্টাব্যাপী এই মহাআরতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সরিৎস্বর উচ্চারিত বেদপাঠ ও মন্ত্র-উচ্চারণ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া মনকে "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে আনন্দিত করিয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন করিবে সন্দেহ নাই। ইহা দর্শনে মহাপাপীর পাষাণ-হৃদয়ও ভক্তিরসে দ্রব হইবে।

কাশীর বিশ্বনাথ ও অপরাপর মন্দির।

[২০ পৃষ্ঠা]

Sulov Press, Calcutta

অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির—বিশ্বেশ্বরের বাটীর কিছুদুর পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকই ভিক্ষুকে পরিবৃত, ইহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন বলিয়া অনুমান হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে নানালঙ্কার-ভূষিতা মা অন্নপূর্ণাদেবী ভুবনমোহিনীরূপে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের ব্রাহ্মণকে পৃথক কিছু অর্থপ্রদান করিলে তিনি ভক্তগণকে মায়ের আদিমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া থাকেন। এখানে মায়ের পূজার নিমিত্ত সিন্দুর, সিন্দুরচুবড়ি একদফা মার সাজ, লালপাড় সাড়ি একখানা, সোণার নথ একটি, লোহার চুড়ি একগাছা ও সাধ্যমত দ্রব্যাদি প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবেন। ইঁহার একপার্শ্বে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরের কিছুদুর পশ্চিমে উত্তরদিকে ঢুণ্ডিরাজ গণেশ-দেবের দেবালয়; সিদ্ধিদাতা গণেশজীর কৃপায় সকল অভিলাষ সিদ্ধ হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার অর্চ্চনা করিবেন।

কালভৈরবনাথের দেবালয়—এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া ভৈরবনাথের রৌপ্যময় দুইটি চক্ষু ও পার্শ্বে তাঁহার বাহন কুকুরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেব কাশীর কোতয়ালরূপে কাশীবাসীদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। একদা "অব্যয় কে"?—এই বিষয় লইয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদস্থলে মূর্ত্তিমান চারিবেদ উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে "অব্যয়" বলেন, তথাপি তাঁহারা বিবাদ করিতে থাকেন; এমন সময় পাতাল হইতে এক জ্যোতিঃ উত্থিত হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিমধ্যে শূলপাণি রুদ্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "রুদ্র! আমি তোমার পিতা, আমাকে প্রণাম কর"। তৎশ্রবণে রুদ্রদেব কুপিত হইলে, তাঁহার ললাট হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ বাহির হইল,—তিনিই কালভৈরব। রুদ্রের আজ্ঞায় তিনি ব্রহ্মার উর্দ্ধদিকের এক মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ও নারায়ণ সেই রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের স্তবে রুদ্র শান্ত হইয়া বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু ব্রহ্মার ছিন্নমস্তক রুদ্রের হস্ত হইতে

স্খলিত হইল না। তিনি নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র সেই ছিন্নমস্তক স্খলিত হইয়া পড়িল. তদ্দর্শনে কালভৈরব বলিলেন, "আহা কাশী কি মহাতীর্থ! আমি অদ্যাপি এই কাশীর প্রতিহারি রহিলাম।" এই নিমিত্ত যাত্রীগণ কাশীতে আসিয়া কালভৈরবের পূজা করিয়া থাকেন, এই দেবকে সন্তুষ্ট না রাখিলে কাশীবাসের বিঘ্ন ঘটে।

জ্ঞান-বাপী—গণপতিকৃত একটী পবিত্র কূপ। বাপীর তলায় যাইবার সোপান আছে, ইহার নিম্নদেশ কাশীর উত্তরগামিনী গঙ্গার সহিত সংলগ্ন। ঐ স্থানে নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রস্তরময় বৃষ স্থাপিত রহিয়াছে। এই কূপ গজানন বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইবার জন্য ত্রিশূলদ্বারা খনন করেন এবং বিশ্বেশ্বরকে উহাতে স্নান করান। স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া গণেশকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন গণেশ এই প্রার্থনা করিলেন যে, আপনার বরপ্রভাবে এই কুণ্ড যেন সর্ব্ব তীর্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। বিশ্বেশ্বর গণেশের প্রার্থনা পূরণ করিয়া এই কূপের নাম জ্ঞানবাপী রাখিলেন এবং বলিলেন, যে ব্যক্তি কাশীতে আসিয়া এই বাপীর সেবা করিবে, সে আমার কৃপায় দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে। এই নিমিত্ত কাশীতে জ্ঞানবাপীর পূজা প্রশস্ত আছে। যেরূপ গুরুদীক্ষাব্যতীত কোন কর্ম্ম শুদ্ধ হয় না, সেইরূপ কাশীতে আসিয়া এই জ্ঞানবাপী দর্শন না করিলে তাঁহার কোন কর্ম্মই শুদ্ধ হয় না।

শীতলাদেবীর মন্দির—ইহার সন্নিকটেই বিরাজমান। এই দেবালয়ে শীতলাদেবীসহ সপ্ত ভগিনীকে দর্শন পাইবেন। যাত্রীগণ ভক্তিপূর্ব্বক শীতলাদেবীর কপালে সিন্দূর দান করেন।

নবগ্রহের মন্দির—কালভৈরব ও দণ্ডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত আছে; এই নবগ্রহকে মনুষ্যমাত্রেরই পূজা করা কর্ত্তব্য। মানবজন্ম ধারণ করিলেই উহাদের ফলভোগ করিতে হইবে; ঐ নবগ্রহগণকে অর্চ্চনা দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে, মনুষ্যগণ সুখে থাকিতে পারে।

কালকূপ* নামে এখানে যে তীর্থ-কূপ আছে, উহাতে স্নান করিলে পিতৃপুরুষগণের স্বর্গে গতি হয়। কালকূপের বাহিরের ভিত্তিতে এরূপভাবে একটী ছিদ্র আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহ্নসময়ে সূর্য্যরশ্মি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া কূপের জলে পতিত হয়।

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির—তথায় যাইয়া তাঁহার দর্শন করিয়া পূজা করিবেন।

মণিকর্ণিকার ঘাট—ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। জন্মজন্মান্তর তপস্যা করিয়া যে মানব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হয়, এই মণিকর্ণিকার পবিত্র বারি একবারমাত্র স্পর্শ করিলে হরপার্ব্বতীর কৃপায় সে অনায়াসে মোক্ষলাভ করিতে পারে। মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর বিষ্ণুর চরণচিহ্ন পাদুকা আছে, উহা ভক্তিসহকারে পূজা করিবেন।

গঙ্গাকেশবের মন্দির—গঙ্গাবক্ষ হইতে ইহার দৃশ্য দেখিতে অতি সুন্দর। এই মন্দির ললিতাঘাটের উপর অবস্থিত আছে।

কাশীর উত্তরগামিনী পবিত্র গঙ্গার উপরিভাগে বেণীমাধবজীউর যে দেবালয় আছে, তদভ্যন্তরে শ্রীশ্রীবেণীমাধবজীউর শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে পুলকিত হইবেন। সেই বেণীমাধবজীর দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া দেবালয়ের নিম্নদেশে বেণীমাধবের ধ্বজা নামে যে দুইটি অতি উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে, উহার শিখরদেশে উঠিলে পঞ্চক্রোশী কাশীর যমুনাতীরের সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যুচ্চ স্তম্ভে উঠিতে প্রত্যেক যাত্রীকে দুই পয়সা হিসাবে কর দিতে হয়। এই স্তম্ভ দুইটী বেণীমাধবজীউর ধ্বজা নহে, বস্তুতঃ ইহা দুইটী গোরস্থানমাত্র; ইহার "বেণীমাধবের ধ্বজা" নাম কেন হইল, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলাম না।

পঞ্চতীর্থ—কাশীতে আসিয়া যাত্রীগণের পঞ্চতীর্থ দর্শন করা কর্ত্তব্য। এই পঞ্চতীর্থ যথাক্রমে বিশ্বেশ্বর, জ্ঞানবাপী, নন্দী কেদারেশ্বর, তারকেশ্বর ও মহাবিষ্ণু; এই পঞ্চ দেবালয় পঞ্চতীর্থ নামে বিখ্যাত।

নন্দী কেদারেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির বাঙ্গালীটোলার কেদার-ঘাটের উপর অবস্থিত আছে। কাশীর মধ্যে ইনিই বিখ্যাত, প্রাচীন অনাদি লিঙ্গ। মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে উত্তরগামিনী গঙ্গা পর্য্যন্ত একটী প্রস্তরময় বাঁধান ঘাট আছে। এই দেবালয়ের মধ্যে অনেকগুলি বিগ্রহ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে। কেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে পাষাণময় শিবলিঙ্গ "তিলভাণ্ডেশ্বর নামে খ্যাত, কারণ তিনি প্রতিদিন তিল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন।

পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির। মহাপ্রতাপশালী বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের স্থাপিত মস্‌জিদের কিছু দূরে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্থাপিত ছিল। ইহার পার্শ্বে মস্‌জিদ নির্ম্মিত হওয়ায়, বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এইস্থানে বাদসাহ বলপূর্ব্বক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া নিজের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল যে কাশীতে এইরূপ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন এমন নহে, যে যে স্থানে হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থস্থান বর্ত্তমান, সেই সেই স্থানে তিনি মস্‌জিদ স্থাপিত করিয়া হিন্দুদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

কাশীর উত্তর-পশ্চিমাংশে **নাগকূপ** অবস্থিত। এইস্থানে তিনটি নাগ-মূর্ত্তি ও একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছে। ইহার অনতিদূরে বাগীশ্বরীদেবীর মন্দির দর্শন করিবেন।

কাশীর বাঙ্গালীটোলায় কেবল বাঙ্গালীদিগের বাস। উহাদের মধ্যে সাধু, অসাধু, মদ্যপ, লম্পট সকলই আছেন; কেশেলনামক এক সম্প্রদায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এইস্থানে বাস করেন। উহারা ব্যভিচার-দোষাসক্ত ব্রাহ্মণদ্বারা উৎপন্ন; এই নিমিত্ত ভাল ব্রাহ্মণের সহিত উহাদের আদানপ্রদান হয় না। কাশীতে বেদ, বেদান্ত, বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত অনেক আছেন। এখানে অন্যূন তিন চারিশত দণ্ডী, মহান্ত, সন্ন্যাসী, অবধূত, পরমহংস এবং পরিব্রাজক বাস করিয়া থাকেন। কাশীতে অনেক অন্নছত্র

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ধনীগণ মা অন্নপূর্ণাদেবীর মানরক্ষার্থে অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন ; স্থতরাং কেহ কখন অভুক্ত থাকেনা।

কাশী সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমক্ষেত্র। এখানে বহুবিধ মঠ ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বর্ত্তমান আছে ; সাধুমহাত্মাগণের মধ্যে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী বিশেষ বিখ্যাত।

দশাশ্বমেধ ঘাট। এই ঘাট অতি পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত ; কারণ স্বয়ং প্রজাপতি দিবদাসের সাহায্যে এইস্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই ঘাটের নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটের উপরিভাগে পদ্মযোনি-প্রতিষ্ঠিত দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর নামক দুইটী শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন। দশহরার দিন এই ঘাটে স্নান করিলে জন্মজন্মান্তরের পাপরাশি প্রক্ষালিত হইয়া যায়। এই ঘাটে যাত্রীগণ ভক্তিপূর্ব্বক ছত্রদান করিয়া থাকেন।• এই দশাশ্বমেধ ঘাটের দক্ষিণে প্রসিদ্ধ "মানমন্দির"। মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক এই জ্যোতির্বিদ্যালোচনার সহায়ক যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যখন ঘড়ী ছিলনা, তখন এই যন্ত্রের সাহায্যে সময়নির্ণয় হইত, এমন কি গ্রহণের সময় পর্য্যন্তও ইহাদ্বারা জানা যাইত। যদিচ ইহা এক্ষণে অকর্ম্মণ্য অবস্থায় আছে, তথাপি এই যন্ত্রগুলি দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে। অতএব এই "মানমন্দির" দেখিতে সকলকে অনুরোধ করি।

কাশীক্ষেত্রে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা ব্যতীত অসিসঙ্গম ঘাট, তুলসীঘাট, গণেশঘাট, শিবালয়ঘাট, দণ্ডীঘাট, মানমন্দির ঘাট, মীরঘাট, পঞ্চগঙ্গাঘাট, দুর্গাঘাট, স্বরভিঘাট, ত্রিলোচনঘাট, কেদারঘাট, পিশাচমোচনঘাট প্রভৃতি বহুবিধ প্রসিদ্ধ ঘাট আছে ; এইস্থানে যে সকল তীর্থ বিরাজিত উহা সমস্ত বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হয়।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকট বিখ্যাত **বিন্দুমাধবদেবের মন্দির** অবস্থিত আছে। বাদসাহ ঔরঙ্গজেব বিন্দুমাধবের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করিয়া একটি

প্রকাণ্ড মসজিদ্ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত বিন্দুমাধবজী এক্ষণে পার্শ্বস্থ গৃহে বিরাজ করিতেছেন।

কাশীক্ষেত্রে আসিয়া গোদান, ছত্রদান, স্বর্ণদান ও সাধ্যানুসারে দান করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হন, তাহাদের জানা উচিত যে তীর্থস্থানে দান করিয়াই তাহারা ঐশ্বর্য্যফলভোগ করিতেছেন। তীর্থস্থানে দান না করিলে জন্মজন্মান্তরে দরিদ্র হইতে হয়। ব্রাহ্মণ-ভোজন সকল তীর্থের মুখ্য। অতএব সকল তীর্থেই ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণাসহ তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিতে হয়। প্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের দক্ষিণা দান না করিলে সকল ফলই নষ্ট হইয়া থাকে, শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া ও সাধ্যমত দক্ষিণা দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু কাশীক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটী দণ্ডীভোজন করাইতে হয়। তাঁহাকে একটী কমণ্ডলু, একখানি কুশাসন, একখানি গেরুয়াবর্ণের ধুতি ও সাধ্যমত দক্ষিণা-দান করিতে হয়। দণ্ডীদিগের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করিবেন। কাশীক্ষেত্রে তীর্থসকল দর্শন করিয়া কুমারীপূজা করিতে হয় এবং সর্ব্বশেষে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া অন্য তীর্থে বা ইচ্ছামত স্থানে গমন করিতে হয়।

কাশীর মণিকর্ণিকাঘাট হইতে **দুর্গাবাটী** প্রায় তিন মাইল। পথে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক স্থাপিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ মন্দির আছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে যে বারটী শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন, উহাদিগকে দর্শন করিলে বোধ হয়, কাশী সহরে ওরূপ সুন্দর সুশ্রী মূর্ত্তি আর নাই। এই দেবালয় হইতে কিছুদূরে দুর্গা-বাটী। মা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী দুর্জ্জয় দুর্গাসুরকে বিনাশ করিয়া দুর্গানাম অর্জ্জন করিয়া বিরাজ করিতেছেন। পুরাকালে কাশীতে শূলপাণি কর্ত্তৃক

কাশীর দুর্গাবাটীর দৃশ্য।

[২৭ পৃষ্ঠা।

আমীর দুর্গাবাটীর দৃশ্য। [২১ পৃষ্ঠা।
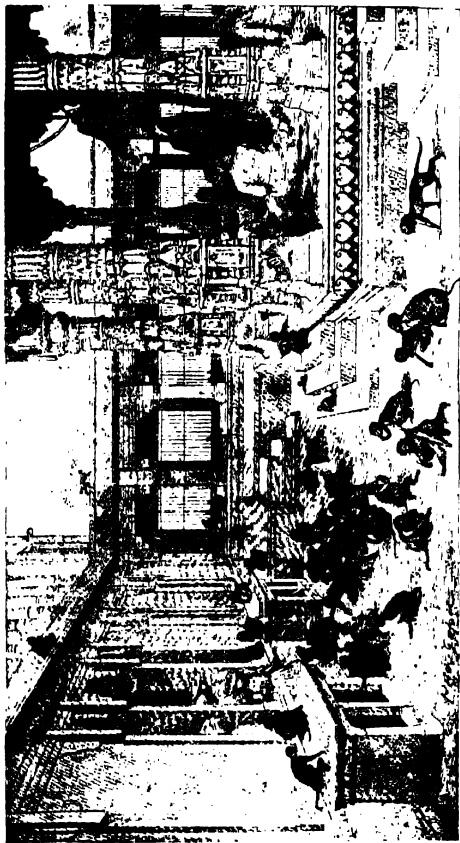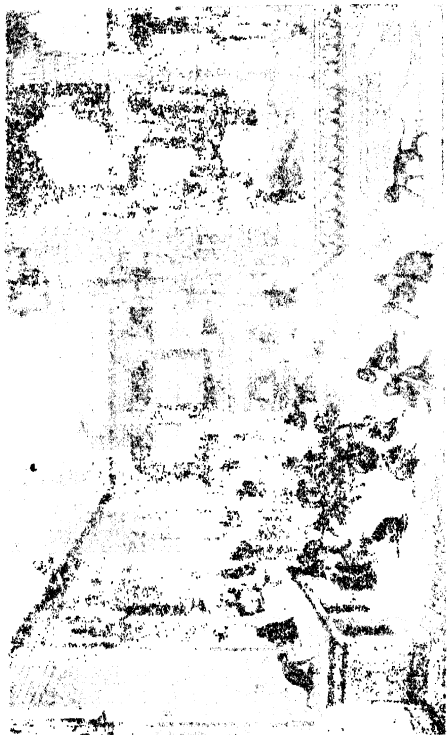
মণিকর্ণিকা ও তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত হইলে ত্রিভুবনের ভক্তগণ কাশীতে আসিয়া ভগবান মহাবিষ্ণু ও হরপার্ব্বতীর যশগুণগাণ করিতে লাগিলেন। মহাপরাক্রমশালী দুর্জ্জয় দুর্গাস্থরের ইহা অসহ্য হইল, তখন তিনি স্বয়ং কাশীতে সসৈন্যে উপনীত হইয়া কাশীবাসীদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপ্রদান-পূর্ব্বক কাশীভক্তগণকে ত্রাসিত করিয়া বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। দুর্গা-স্থরের তাড়নায় ভক্তগণ ভয়বিহ্বলচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভক্তদিগের দুঃখ-দূরীকরণহেতু পার্ব্বতীকে তাহার যথার্থ উপদেশ দেন। অস্থরনাশিনী রণপ্রিয়া শঙ্করী, শঙ্করের আদেশে রণবেশে যোগিনীগণসহ সেই দুর্জ্জয় দুর্গাস্থরকে বধ করিয়া দুর্গানাম অর্জ্জন করিয়া এই-স্থানে অবস্থান করিতেছেন। লঙ্কায় রাবণবধের সময় পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র এই দুর্গাদেবীকে একশত আটটি নীলপদ্ম উৎসর্গ করিয়া দুর্জ্জয় রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তির নিদর্শনরূপ রামসৈন্য কপিবানরগণ মা জগ-জ্জননীর মন্দিরে পাহারায় নিযুক্ত আছে; অজ্ঞ যাত্রীগণ এই মন্দিরদর্শনকালে একগাছি যষ্টি সঙ্গে রাখিবেন, নচেৎ কপিগণের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইবে। এই মন্দিরের সম্মুখে যে পতিত স্থান দেখা যায়, ঐস্থানে প্রতি মঙ্গলবার একটী মেলা বসিয়া থাকে। দুর্গাবাটীর প্রাঙ্গণে চারিধার বাঁধান যে বৃহৎ চতুষ্কোণ কুণ্ড আছে, উহাকে দুর্গাকুণ্ড বলে। এখানে দেবীর উদ্দেশে প্রত্যহ বিস্তর ছাগ বলি হইয়া থাকে।

যে সকল যাত্রী ধর্ম্মশীল হইয়া কাশীবাস করেন, তাহারা স্বীয় আত্মা ও পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। অতএব অর্থ, শরীর ও বেশভূষাদি সকল পদার্থই নশ্বর, অসার ও অনিত্য, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সংসারভয়ভঞ্জন দুরিতহারী, ত্রাণকারী কাশীধামের সেবা করা কর্ত্তব্য। কলিযুগে এক-মাত্র সর্ব্বদুরিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত জীবগণের আর কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। যে তীর্থে দেবনদী প্রবাহিতা, যথায় মণিকর্ণিকা বিরাজিতা, তথায় দেহী মানবকুল যে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে,তাহাতে আর বিচিত্রতা

কি? বিষয়াসক্ত, অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিরাও যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে স্থানমাহাত্ম্যগুণে তাহাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না কাশীর অদূরে রামনগরে ব্যাসকাশী নামে যে স্থান আছে, তথায় কাশীর রাজা বাস করিয়া থাকেন; এখানে দেহত্যাগ করিলে গর্দ্দভজন্ম প্রাপ্ত হইতে হয়।

ব্যাস কাশী।

কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইলে ব্যাসদেব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে পাপীরা কাশীতে আসিয়া বাস করিয়া যদি পাপ না করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু কাশীতে হইলে সে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু কাশীবাসী হইয়া পাপ করিলে সে পাপের আর মুক্তি নাই। ব্যাসদেব এই সকল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, আমাকে একটী এরূপ কাশী নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তথায় পাপীরা আসিয়া উদ্ধার হইবে এবং তথায় পাপ করিলেও অনায়াসে মুক্তি পাইবে এবং ঐস্থানের নাম ব্যাসকাশী হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কাশীর অনতিদূরে রামনগরে ব্যাসকাশী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণাদেবী ইহা জানিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদ্যপি ব্যাস প্রকৃতই ওরূপ কাশী নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে মহেশ্বরের সোণার কাশী অরণ্যে পরিণত হইবে, সকলেই ব্যাস কাশীতে বাস করিবে। দেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া এক বৃদ্ধার বেশধারণপূর্ব্বক যষ্টিহস্তে ধীরে ধীরে যথায় ব্যাসদেব কাশী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে ব্যাসকে কহিলেন, "বাবা তুমি একমনে এখানে কি কাজ করিতেছ?" ব্যাস কহিলেন, "বুড়ি আমি এখানে এমন একটী কাশী নির্ম্মাণ করিতেছি যে এখানে বাস করিয়া যে যত পাপকার্য্য করুক বা অন্যস্থানের পাপী এখানে বাস করুক, আমার কৃপায় সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে। "ভাল ভাল" বলিয়া অন্নপূর্ণা কয়েক পদ প্রস্থান করিয়া পুনরায় তৎক্ষণাৎ ব্যাসস্থানে আসিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ম'লে কি হ'বে বলিলে বাবা ?" এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাসদেব সেই বৃদ্ধার উপর রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "এখানে ম'লে গাধা হবে শুনিতে পেয়েছিস বুড়ি" দেবী তৎশ্রবণে হাস্য-পূর্ব্বক "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্যাস তখন "হায় কি করিলাম" বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত রামনগরে ব্যাসকাশীতে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহাকে গর্দ্দভজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। রামনগরে শ্রীরামনবমীর সময় অনেক সমারোহের সহিত রামলীলা হইয়া থাকে।

কাশীর শিক্‌রোল নামক স্থানে ইংরাজেরা বাস করিয়া থাকেন, শিক-রোলে একটী চমৎকার চূড়াবিশিষ্ট বিদ্যালয় আছে, উহার নিকটস্থ প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে ; উহার জলে দুইটী পোষা কুম্ভীর নানাপ্রকার খেলা দেখাইয়া যাত্রীগণকে সুখী করে এবং খাদ্যদ্রব্য পাইলে নিকটে আসিয়া খেলা করে। কাশীর বাজার, চক, ডাল্‌কা মণ্ডাই এই সকল স্থান দেখিবার যোগ্য। কাশীতে সুফলের সময় পাণ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে তিন টাকা তিন আনা পৃথক আদায় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে গঙ্গা-পুত্রের (যাহারা গঙ্গাস্নানসময়ে মন্ত্রপাঠ করে) এক টাকা এক আনা ; যাত্রাওয়ালারা (যাহারা কাশীতীর্থ সকল দর্শন করাইয়া থাকে) তাহাদের নিমিত্ত এক টাকা এক আনা ; আর যেস্থানে বাস করিতে হয়, সেই বাটীর ভাড়াস্বরূপ এক টাকা এক আনা, এই তিনপ্রকারে তিন টাকা তিন আনা সুফলবাদে দিতে হয়।

মণিকর্ণিকা ত্রিলোকপূজ্য হইবার কারণ প্রকাশিত হইল। মহাপ্রলয়-কালে স্থাবরজঙ্গম বিলুপ্তপ্রায় হইলে ব্রহ্মাণ্ড তমোময় হইয়া পড়িল, তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও তারাগণ কিছুই ছিলনা ; একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। যিনি পরমানন্দ ও তেজঃস্বরূপ, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বব্যাপী ও সমুদয়ের মলীভূত কারণস্বরূপ বিদ্যমান ছিলেন ; সেই সময় তাঁহার দ্বিতীয়েচ্ছা সঞ্জাত হইলে সেই অমূর্ত্তি ব্রহ্ম লীলাবশে একটী মূর্ত্তির কল্পনা করিলেন, ঐ মূর্ত্তি

সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্না, সর্ব্বজ্ঞানময়ী, সর্ব্বকার্য্যকারিণী ; এইরূপে সেই শুদ্ধিরূপিণী ঐশ্বরী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া পরব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। যিনি সেই সর্ব্বমূলধার অমূর্ত্ত পরব্রহ্ম, বিশ্বেশ্বরই সেই মূর্ত্তি, প্রাচীন মহাত্মাগণ সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অনন্তর ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে একমাত্র তিনিই ইচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার নিজ দেহ হইতে স্বশরীরানুরূপ একমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন, সেই মূর্ত্তিই পার্ব্বতী। তিনিই পরাগুণবতী, মায়াপ্রধানা বা প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তৎপরে কোন সময় কালরূপ ব্রহ্ম মচ্ছক্তিরূপিণী পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করেন। সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই পুরুষই পরম ঈশ্বর। তাঁহারা উভয়েই এই পঞ্চক্রোশপরিমিত পরমানন্দময় "কাশীক্ষেত্র" সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়-কালেও কদাপি তাঁহারা এই ক্ষেত্র ত্যাগ করেন না। এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম অবিমুক্তক্ষেত্র।

অনন্তর শিব ও শিবাণী উভয়ে সেই আনন্দবনে বিহার করিতে করিতে অপর একটী মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং মনে ভাবিলেন, সেই মূর্ত্তির উপর সমস্ত মহাভার অর্পণপূর্ব্বক তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ বিচরণ করিতে পারিবেন। যে পুরুষ উৎপন্ন করিবেন, তিনিই সংসার-পরিপালন এবং সংহার করিবেন। যাহারা কাশীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, তাঁহারা উভয়েই তাহা-দিগকে উদ্ধার করিবেন। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ স্থির করিয়া তিনি স্বীয় বামাঙ্গে সুধাবর্ষিণী দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বামাঙ্গ হইতে ত্রিভুবন-সুন্দর একটী পুরুষের আবির্ভাব হইল। সেই পুরুষ শান্ত, সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও গাম্ভীর্য্যে সাগর-জেতা। তিনি ক্ষমাশীল, ইন্দ্রনীলকান্তি, শ্রীমান্, পদ্মপলাশলোচন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় প্রচণ্ড ও দীপ্তিপূর্ণ। তিনি একাকী সর্ব্বগুণের আশ্রয় ও সর্ব্বকলার নিধি। তাঁহাকে এইরূপ মহামহিমাসম্পন্ন দেখিয়া মহেশ্বর কহিলেন, "হে অচ্যুত ! তুমি মহাবিষ্ণু নামে পরিচিত হও,

তোমার নিশ্বাস হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, সেই বেদ হইতে তুমি সকল বিষয় জানিতে পারিবে। তুমি বেদদৃষ্ট পথের অনুসারী হইয়া সমস্ত কার্য্য যথাযথরূপে সম্পাদন কর।" মহেশ্বর বুদ্ধিতত্ত্বরূপী সেই মহাবিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া পার্ব্বতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই ভগবান্ মহাবিষ্ণু শিবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানমগ্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তথায় চক্রদ্বারা একটী পুষ্করিণী খননপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গগলিত স্বেদজলদ্বারা উহা পূর্ণ করিলেন এবং পঞ্চাশৎ সহস্র বৎসর নিশ্চল হইয়া কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে তপঃপ্রজ্বলিত, নিশ্চল ও মুদ্রিত-নয়ন দেখিয়া ভগবান্ মহেশ্বর মৃড়ানীর সহিত তথায় আবির্ভূত হইলেন এবং হৃষীকেশকে বলিলেন, তোমার তপস্যার কি মাহাত্ম্য! আর তোমার তপস্যায় প্রয়োজন নাই,—অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর।

মহাদেব-প্রোক্ত এই কথা শ্রবণমাত্র মহাবিষ্ণু পদ্মনেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমায় এই বরদান করুন, যেন ভবানীসহ সকল কর্ম্মের পুরোভাগে আপনাকে দর্শন করিতে পাই।" সদাশিব কহিলেন, "হে জনার্দ্দন! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। তদীয় তপস্যার মহোন্নতি-দর্শনে মদীয় ভুজগভূষণভূষিত মৌলিদেশ-আন্দোলনহেতু আমার কর্ণ হইতে মণিখচিত মণিকর্ণিকালঙ্কার এইস্থানে পতিত হইয়াছে, অতএব এইস্থান মণিকর্ণিকা নামে প্রসিদ্ধ হউক। হে শঙ্খচক্র গদাধর! তুমি চক্রদ্বারা খনন করাতে পূর্ব্ব হইতেই এইস্থান কল্যাণকর চক্রপুষ্করিণীতীর্থ এবং আমার কর্ণ হইতে যে সময় মণিকর্ণিকা পতিত হইয়াছে, তদবধি ইহা লোকদুরিতহারী পরম পবিত্র হইয়াছে, অতএব এইস্থান মণিকর্ণিকা নামে প্রথিত হউক, এবং এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে পরমতীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র হউক। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম মধ্যে যে কোন জীব আছে, এই চক্রতীর্থে

একবারমাত্র স্নান করিলে আমার কৃপায় সে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইবে; যে মণিকর্ণিকার এত মাহাত্ম্য, তথায় কাহার না স্নান করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে বাসনা হয়? কাশীতে অন্তিমসময়ে যে কোন জীব দক্ষিণকর্ণ উত্তোলন করিয়া দেহত্যাগ করে, স্বয়ং হরপার্ব্বতী নিজহস্তে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া উহাকে উদ্ধার করেন। পূর্ব্বজন্মে বহুপুণ্য বা তপস্যা না করিতে পারিলে তাহার ভাগ্যে কাশীবাস ঘটে না।

কাশীক্ষেত্র হইতে অপর কোন তীর্থস্থানগমনের সময় কাশী নামক ষ্টেশন হইতে না উঠিয়া বেনারস্ কেণ্টনমেণ্ট নামে যে ষ্টেশন আছে উহাতে উঠিবেন; কেন না এই ষ্টেশনে রেলগাড়ি ১৫ মিনিটকাল স্থগিত থাকে, আর কাশীতে কেবলমাত্র ৩ মিনিট স্থগিত থাকে। যাত্রীদিগের মোট, পুঁটলি, স্ত্রী, পুত্র লইয়া জনতার মধ্য দিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ীতে উঠা অত্যন্ত কষ্টকর হয়; এমন কি গাড়িতে উঠিতে না পারিলে সে দিনের মত হতাশপ্রাণে ষ্টেশনে সময় অতিবাহিত করিতে হয়।

কাশীতে কুমারীপূজার কারণ প্রকাশিত হইল। একসময় দেবাদিদেব মহাদেব কাশী সৃষ্টি করিবার পর কিছুকালের জন্য কুশদ্বীপস্থিত মন্দার পর্ব্বতে যাইয়া অবস্থিতি করেন। ঐ সময় কাশীতে রাজা না থাকায় অত্যন্ত অমঙ্গল ঘটিতে থাকে। দেবদাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই সময় কাশীবাসী হইয়াছিলেন। প্রজারা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সুন্দরকান্তি পুরুষ দেখিয়া তাঁহাকেই উপযুক্ত বোধ করিয়া রাজা করিলেন। বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর একদা ভোলানাথের আনন্দ-কানন [কাশী] স্মরণ হইল; তথায় যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন; সদাশিব কাশীতে আসিয়া দেবদাসকে রাজা দেখিয়া তাহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বলিলেন দেবদাস কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মহাদেব ভাবিলেন, আমার কাশীতে যে শুদ্ধচিত্তে ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া বাস করে, সে পাপী হইলেও নিষ্কৃতি পাইবে; অতএব এই ধর্ম্মাত্মা রাজাকে আমি কিরূপে বিতাড়িত করি, পাপসংঘটনব্যতিরেকে

তাহাকে বিদায় করিতে পারা যায় না,—এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহার চৌষট্টি যোগিনীকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা কুমারীবেশে কাশীতে দেব-দাসের পাপ অনুসন্ধান কর"। যোগিনীগণ প্রভুর আজ্ঞায় কুমারীবেশে কাশীর প্রতি ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়াও কুত্রাপি পাপের সন্ধান পাইল না; এই প্রকার অধিক দিন থাকিয়া তাহাদের মায়া কাশীতে বসিয়া যায় ও এইস্থানেই বাস করিতে থাকে। সদাশিব যোগিনীগণের কোন সন্ধান না পাইয়া বিবিধ উপায়ে কাশী পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যখন নগর মধ্যে প্রবেশ করেন, ঐ সকল যোগিনীগণ তখন তাঁহার শ্রীচরণ ধারণপূর্ব্বক লজ্জায় অবনতমস্তকে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সদাশিব হাস্যপূর্ব্বক তাহা-দিগকে অভয়বচনে বলিলেন, তোমাদের কোন ভয় নাই, আমার কাজে তোমরা অকৃতকার্য্য হইয়াও যখন অন্যত্র না পলাইয়া আমার প্রিয় কাশীতেই বাস করিতেছ, তখন সন্তোষের সহিত আমি তোমাদের এই বর দিতেছি যে অতঃপর যে কোন যাত্রী কাশীতে আসিয়া তোমাদের উদ্দেশে পূজা ও ভোজন প্রদান না করিবে, আমি কখনই তাহাদের পূজাগ্রহণ করিব না এইপ্রকার সদাশিবের বরে কাশীতে কুমরী-পূজার প্রথা প্রচলিত হইল।

প্রয়াগতীর্থ দর্শন-যাত্রা।

কাশীর ষ্টেশন হইতে আউদ রোহিলখণ্ড রেলযোগে এলাহাবাদ নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। এলাহাবাদ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ নগর। এখানে হিন্দুরাজা এবং মুসলমান বাদসাইদিগের অনেক কীর্ত্তি দেখিবার আছে। এই নগরে বাদসাহীমণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুটগঞ্জ প্রভৃতি

অনেকগুলি পল্লী আছে ; এলাহাবাদে বাড়ীঘরের সংখ্যা কম ; এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। এখানকার পল্লীসকল পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে এক একটীকে এক একটী ভিন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। রাস্তা, ঘাট পরিষ্কার ও প্রশস্ত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, বিষয়কর্ম্ম-উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী আসিয়া এখানে বাস করিতেছেন অবগত হইলাম মাঘ মাসে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়, সেই সময় বহু দূরদেশ হইতে বহু সাধু, মহান্ত ও নানা-স্থান হইতে যাত্রীগণ উপস্থিত হন। এমন কি অনেক রাজা, ধনী, আসিয়া সেই মেলায় যোগদান করিয়া নগরের এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেন।

যাত্রীদিগের স্মরণার্থ পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত সেতুয়া-দিগের এই তীর্থস্থানে প্রাদুর্ভাব অধিক দেখা যায়। যে সকল যাত্রীদিগের পুরাতন পাণ্ডা আছে, তাহারা তাহাকেই অন্বেষণ করিবেন, আর যে সকল নূতন যাত্রী তাহাদের নূতন পাণ্ডা করিতে হইবে, তাহারা বেণীঘাট পৌঁছিয়া ইচ্ছানুরূপ পাণ্ডা মনোনীত করিবেন, কিন্তু তীর্থ তীরে কার্য্য করিবার পূর্ব্বে কিরূপ টাকা দিতে হইবে ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন, নচেৎ পাণ্ডাগণ প্রথমে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিয়া পরে অধিক হারে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পশ্চিমে যত তীর্থ আছে এখানে সর্ব্বা-পেক্ষা যাত্রীদিগকে পাণ্ডাদিগের নিকট অধিক বাক্যব্যয় করিতে হয়, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পূর্ব্বে টাকার মীমাংসা করেন, তাঁহাদিগকে আর বিরক্ত হইতে হয় না।

ষ্টেশনের অনতিদূরে ধর্ম্মশালা আছে, যাত্রীগণ তথায় সুখে থাকিতে পারেন, কিম্বা যাহারা ধর্ম্মশালায় থাকিতে অনিচ্ছুক তাহারা স্বয়ং একটী ভাল পল্লী দেখিয়া বাসা ভাড়া চুক্তি করিয়া লইবেন, কিন্তু সেতুয়াদিগের মিষ্ট বাক্যে কখনও পাণ্ডাদিগের প্রদত্ত বাসায় যাইবেন না—যদি যান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে শেষে মনস্তাপ করিতে হইবে অর্থাৎ পাণ্ডারা বাসাভাড়া লইবেন না সত্য কিন্তু সকল বিষয়ে উচ্চহারে আদায় করিবেন।

ধর্ম্মশালায় থাকা শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি, কেননা তথায় দরোয়ান, ভৃত্য সকলেই বিনা বেতনে পাইবেন, এবং তাহাদের জিম্মায় দ্রব্যাদি সকল নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে ঘরে কুলুপ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারিবেন, কেননা যে পুণ্যাত্মা এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার হুকুম অনুযায়ী যাত্রীদিগের বিশেষ যত্ন লওয়া হয়, কিন্তু বক্‌শিস পাইলে তাহারা কেনা গোলামের মত থাকে। ধর্ম্মশালায় সুবন্দোবস্ত আছে, যাত্রীগণ তথায় উপস্থিত হইলে ভৃত্যগণ আপনাকে ঘর পছন্দ করিয়া লইতে বলিবে, যাহা হুকুম করিবেন কেনা গোলামের ন্যায় তামিল করিবে, তথায় জল ও পাইখানার বন্দোবস্ত দেখিলে সন্তুষ্ট হইবেন। যদ্যপি কোন যাত্রী রসুই করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই স্থানেই বাজার আছে, আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই তথায় পাইবেন।

চক্ হইতে সোজা যে পাকা বাঁধা রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা দিয়া আড়াই ক্রোশ গমন করিলেই বেণীঘাট পৌছনা যায়, তথায় অসংখ্য প্রামাণিক, গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত দ্বিজ ও ভিক্ষুকগণ যাত্রীদিগকে বেষ্টন করিবে এবং ঘাটের তীরে পাণ্ডাগণ নিজ নিজ স্থান সকল অংশ করিয়া নিজের দখলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন প্রকার পতাকা উড়াইয়া দখল করিয়া বসিয়া আছেন এই সমস্ত দেখিতে পাইলেই বেণীঘাট জানিতে পারিবেন।

এই বেণীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। পিণ্ড-দানের পূর্ব্বে মস্তকমুণ্ডন করিতে হয়, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র অঙ্গুলী প্রমাণ কেশাগ্র কর্ত্তণ করিয়া দিলেই হয়। এই মুণ্ডনের ফলে শরীরস্থ জাবতীয় পাপরাশি লয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একটী প্রবাদ আছে যে—

প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা।
পাপী যা যথা তথা॥

প্রয়াগ তীর্থ তীরে মস্তক মুণ্ডন করিলে জন্ম জন্মান্তরের পাপরাশি লয়

হয়। এখানকার নিয়ম এই, যে প্রামাণিক ক্ষৌর করাইবে যে ব্যক্তি যেরূপ কাপড় পরিধান করিয়া ক্ষৌর কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহাকে সেই কাপড় খানি দান করিতে হইবে, উহাই তাহাদের প্রাপ্য, অতএব এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিবেন।

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে। এই সঙ্গম স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দান করিলে অধিক ফল-লাভ হয়। সঙ্গমস্থানের উপরিভাগে এলাহবাদ-দুর্গ বিরাজমান।

এলাহাবাদ-দুর্গ বহুপূর্ব্বে হিন্দু রাজার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, মধ্যে ধ্বংশ হইয়া প্রাচীর মাত্র অবশিষ্ট থাকে। আকবর বাদসা পুনরায় ইহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করেন; তিনি সদাশয় ও হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, সেই পুণ্যাত্মার আদান প্রদান, ক্রিয়া কর্ম্ম যাহা কিছু সমস্তই হিন্দুদিগের সহিত মিলিত, তিনি হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ পদ সকল প্রদান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন হিন্দুকে কখন কোনরূপ মনস্তাপ পাইতে হয় নাই, তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দু ও মুসল-মানদিগকে একই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিচার করিতেন, এই নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিত ও বলিত যে আকবর বাদসা হিন্দু ছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি শাপগ্রস্থ হইয়া মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছেন। যে দুর্গ আমরা এক্ষণে দেখিতে পাই, উহা হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ এই তিন যাতীর স্বেচ্ছামত নির্ম্মাণ হইয়াছে। ভারতের কত দেশ কত রাজ্য ধ্বংশ হইল কিন্তু এলাহাবাদ-দুর্গ অদ্যাপি নূতন কলেবরে বর্ত্তমান আছে। কেল্লার মধ্যে পাতালপুরী আছে। তথায় এক অক্ষয়বট ও শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; পাতালপুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে প্রত্যেক যাত্রীকে দুই পয়সা কর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। দুর্গের অদূরে আকবর বাদসার রাজধানী বর্ত্তমান আছে। প্রয়াগ একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটী পীঠস্থান। এখানে দেবীর দক্ষিণ অঙ্গের দশটী অঙ্গুলি পতিত

হওয়ায় "আলোপী" নামে বিরাজ করিতেছেন। আলোপী দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ সুমধুরস্বরে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মধ্যে এক বৃহৎ তাম্রসিংহাসনোপরি "মা আলোপী দেবী" বিরাজ করিতেছেন।

আলোপী দেবীর মন্দিরের কিয়ৎ দূরে রামঘাট ও শীখাকুণ্ডঘাট দৃষ্টি-গোচর হইবে। সন্নিকটেই রাজা বাসুকীর ঘাট ইহা ভোগবতী ঘাট নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই ঘাটটী নগরের মধ্যে প্রধান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "রাজা বাসুকী" একটী বাঁধাঘাটের উপর মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মন্দিরটি একটী বৃহৎ আকার সর্পের দ্বারা বেষ্টিত আছে।

বাসুকীঘাটের নিকটেই শিবকোট দেখিতে পাইবেন, কথিত আছে পূর্ণ-ব্রহ্ম রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন সময়ে বনবাসকালীন এই ঘাটের উপর এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গরাজকে পূজা করিলে কোটী শিব পূজার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহার নাম শিবকোট নাম হইয়াছে।

ঝুঁশী (প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ) কম্বলা, শশুর ও ভোগবতীর মধ্যস্থলে প্রজা-পতির বেদী বর্ত্তমান। এই স্থানে দেবগণ, ঋষিগণ ও নৃপতিগণ ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস সময়ে এই স্থান পার হইয়া কিছুদূর যাইলেই তাঁহার মিতা গুহক-চণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, এই স্থান পরম তীর্থস্থান বলিয়া গণনীয়।

বেণীঘাট হইতে কিয়দ্দূর উত্তর-পশ্চিমে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম পথে শ্রীশ্রীবেণীমাধবজীউর মন্দির। এই বেণীমাধবজীর নাম অনুসারে বেণীঘট নাম হইয়াছে।

প্রয়াগতীর্থ প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে প্রয়াগ দর্শন, স্পর্শন বা সঙ্গমস্থলে স্নান করেন তিনি নিষ্পাপী হইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে পারেন, কেননা যেস্থানে নিয়ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্, দিক্পালগণ, লোকপালগণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ,

নাগগণ, সুপর্ণগণ, সিদ্ধসাগরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ ও ভগবান্ শ্রীহরি এবং প্রজাপতি অবস্থিতি আছেন।

প্রয়াগে তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে। তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঙ্গাযোগ প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ বলিয়া থাকেন। সেইস্থানে দেব ও যজ্ঞ মূর্ত্তিমান হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকপূজ্য পুণ্যতমরূপে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। এই প্রয়াগতীর্থে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা গাত্রে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন করিলে, সকল পাপ মোচন হইয়া থাকে; মনুষ্যমাত্রেই এই তীর্থে গমন করা উচিত।

এলাহাবাদ যমুনাতীরে যে লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে উহার শিল্পকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে, ঐ সেতু তিন ভাগে বিভক্ত, উপর দিয়া রেলগাড়ি যাতায়াত করিতেছে, মধ্যে মনুষ্যগণ এবং নিম্নভাগে জলযান সকল গমনাগমন করিতেছে ইহার নির্ম্মাণকারককে প্রশংসা করিতে হয়।

'বিশ্রাম বেদী। এই প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী নির্ম্মাণ করিতে নীলকমল মিত্র নামক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত টাকাই ব্যয় করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এই বেদীর নিকটেই থর্ণহিল্‌স্ মেমোরিয়াল। উহার ঘরের ভিতর কি চমৎকার। ইহার অনতিদূরে খসরুবাঘ ও যুমামসজিদ্। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। অবগত হইলাম এলাহাবাদ কেল্লা প্রস্তুত হইয়া যে সমস্ত মাল মসলা অবশিষ্ট থাকে সম্রাটপুত্র খসরুর আজ্ঞা-অনুসারে সেই মসলায় এই উদ্যানের চতুর্দ্দিক বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাঁহারই নাম অনুসারে এই উদ্যানের নাম খসরুবাঘ হইয়াছে। এই মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিতে হইলে মধ্যে যে একটি বৃহৎ ফটক আছে উহারই ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিতরে উপস্থিত হইলে কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী দেখিব এইরূপ মনে হইবে এইসকল দেখিয়া মনে হয় যে আমাদের দেশের

লোকে যে বাদসার উপমা দেয়, তাহাদের সৌখিন পছন্দের নিমিত্ত। পশ্চিমে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ এক নূতন উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাত্রীদিগের নিকট পোটলা, তোরঙ্গ দেখিলে কি আছে দেখিতে চাহিবে কিন্তু কিছু প্রণামি পাইলেই আর কিছু বলেনা নচেৎ তাহার বাক্স, পুটলি খুলিয়া দ্রব্যাদি নাট থাট করিয়া দেয়। এই নিমিত্ত যাত্রীগণ বাধ্য হইয়া তাহাদের খুসি করেন।

অযোধ্যা তীর্থ-দর্শন যাত্রা।

এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে আউদ রোহিলখণ্ড রেলযোগে অযোধ্যা ষ্টেশন বা ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যাঘাট নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। অর্থাৎ অযোধ্যা নামক ষ্টেশন হইতে তীর্থঘাটের সরযূ নদী তীরে যাওয়া যায়। অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে যাইলে তথায় একপ্রকার চারিচাকা বিশিষ্ট মানুষ টানা গাড়িতে চাপিয়া কিম্বা ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে প্রায় ছয় মাইল যাইলে এবং খানিক হাঁটা পথে যাইলেই তীর্থঘাটে পৌছান যায়। ফৈযাবাদ ব্রাঞ্চ লাইনে গাড়ি বদল করিয়া তীর্থঘাটে যাইতে হইবে এই দুইস্থানে দুই বার বোঝাই ও খালাসের মুটে খরচ এবং গাড়ীর অপেক্ষায় যতটুকু সময় নষ্ট হইবে সেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে পৌছিতে পারিবেন, অথচ নগরের অনেক বিষয় দেখিতে পাইবেন, লাভের মধ্যে এই হইবে।

অযোধ্যা হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান এমনকি অযোধ্যা ত্রিলোক-বিখ্যাত এবং দেবতাদিগের নমস্ত। এই অযোধ্যা নগরে দশ সহস্রকোটি তীর্থ বিরাজিত আছে। দেশান্তরে থাকিয়াও যদি কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে

অযোধ্যা তীর্থে যাইব এরূপ মনে করেন তাহা হইলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া অন্তিমে স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই হউন আজন্ম যে যত পাপ করুক না কেন একবারমাত্র সরযূ নদীতে স্নান করিলে তাহার সকল পাপ নষ্ট হইবে যে ব্যক্তি নিয়ত শুচি অবস্থায় ভক্তি পূর্ব্বক এই তীর্থস্থানে দ্বাদশ রাত্রি বাস করেন তিনি যাবতীয় যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন। পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় এস্থানের মহিমা কত ?

অযোধ্যা নগরের রামকোট নামক স্থান, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজধানী। এখানে রাজা দশরথের বাটীতে যে একটি বেদী আছে, প্রবাদ যে শ্রীরামচন্দ্র ঐ বেদীর উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাত্রীরা তথায় গমন করিলে ঐ বেদী প্রদক্ষিণ করেন, বেদীর সন্নিকটে একযোড়া জাঁতা ও একটী উনান দেখিতে পাওয়া যায় কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বিবাহ করিলে ঐ উনানে রসুই হইয়া বৌভাতের যজ্ঞ হইয়াছিল এবং ঐ জাঁতায় চাউল ভাঙ্গা হইয়াছিল। অদ্যাপি যাত্রীরা দেখিতে পাইবেন।

অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার ভক্ত হনুমানজীর সমাদর অধিক, প্রভু ভক্তেরই মান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন যেরূপ হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ এবং তাহার শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত যে জন। এখানে হনুমানজী একটি উৎকৃষ্ট মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ঐ মন্দির মধ্যে একটি ভাল চাঁদোয়ায় এবং একটী মূল্যবান ছাতাতে সুশোভিত আছে, অযোধ্যার গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নগররক্ষক বীর হনুমানের স্তব ও পূজা করিতে হয়।

অযোধ্যা তীর্থে গমন করিয়া প্রথমে সরযূতীরে, তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া স্নান, তর্পণ, দান করিয়া ঋষিদিগের এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে অর্চ্চনা ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই তীর্থতীরে একটী গো দান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। সরযূ নদীতে রামঘাট ও স্বর্গঘাট নামে দুইটী উৎকৃষ্ট ঘাট আছে। রামঘাটের সদৃশ ঘাট পৃথিবী মধ্যে আর আছে কি না জানি না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে

যখন রামায়ত সাধুগণ এই ঘাটে বসিয়া মধুর রামনাম উচ্চারণপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করেন উহা শ্রবণ করিলে মনে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। নগর-বাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধূপ দীপ জ্বালিয়া যখন "রাজা রামচন্দ্র কি জয়" শব্দে শঙ্খধ্বনি করেন সেই সময় হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকে, যিনি উহা একবার দেখিয়াছেন বা শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই সেই মধুর নামে মজিবেন সন্দেহ নাই। নগরবাসীদের মধ্যে রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

অযোধ্যায় রাজা দশরথ প্রতিষ্ঠিত একটী শিব ও একটী কালীমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন, এতদ্ভিন্ন এখানে যত দেবালয় সমস্তই রামলীলাময় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে আসিয়া যাত্রীরা সাধ্যানুসারে দান ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন এইরূপ করিলেই বহু পুণ্য লাভ হইবে। সরযূতীরে শ্রীলক্ষ্মণের স্বর্ণময় মূর্ত্তি ও তাঁহার কেল্লা দর্শন করিবেন।

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে হনুমানজীর দর্শন করিবেন তৎপরে শ্রীরাম রঘুবীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে মনোমত প্রার্থনা করিয়া সেই ভগবানের পূজা করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। তাহার পর ঐ শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী গৃহে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং লক্ষ্মী-স্বরূপিনী সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও সুগ্রীব, বিভীষণাদি লোকপালগণের পূজা ও দর্শন করিবেন। ইহার অনতিদূরে বশিষ্ঠাশ্রমে ভগবতীর দর্শন করিবেন, তথায় একটী কূপ দেখিতে পাইবেন, ঐ কূপের নিকট শ্রীরামচন্দ্র বাল্যকালে ভ্রাতৃগণ সহ ক্রীড়া করিতেন।

অনন্তর শ্রীরামজননী ভাগ্যবতী কৌশল্যাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া অভি-লাষিত বর প্রার্থনা করিয়া দশরথের পূজা করিবেন, তৎপরে শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চারি অবতারের সুতিকাগৃহ, স্বর্গদ্বার, অশ্বমেধ-যজ্ঞস্থান, মণিপর্ব্বত, সুগ্রীবপর্ব্বত, কুবেরপর্ব্বত, হনুমানকোট এবং সরযূতীর্থতীরে

আসিয়া রাম লক্ষ্মণাদির ঘাট সকল দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট করিবেন। রামকোট যাইবার সময় পথিমধ্যে তেঁতুলবৃক্ষশ্রেণী শ্রীরাম-শোকে নতশির করিয়া যাত্রীদিগকে মনবেদনা জানাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান আছে, এবং রাম-সৈন্য কপি বানরগণ তথায় শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া যাত্রীদিগের নিকট খাবার ভিক্ষা করিতে আসিবে সেই সকল দেখিলে কত আমোদ অনুভব করিবেন, এই কপিসৈন্যকুলের সংখ্যা নগরে অধিক থাকায় নগরবাসী ও যাত্রীদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ তাহারা তাহাদের রাজা রামচন্দ্রের অদর্শনে অরাজকতা মনে করিয়া যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুটপাট করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কাল প্রভাবে অযোধ্যায় অনেক প্রাচীন কীর্ত্তিই ধ্বংশ হইয়াছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তিনি এখানে সাড়ে তিনশত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং জঙ্গল কাটাইয়া অনেক প্রাচীন দেবালয় উদ্ধার করিয়াছিলেন তথাকার বৃদ্ধ অধিবাসীদের নিকট এইরূপ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু হায়! কালপ্রভাবে সমস্তই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে কেবলমাত্র ত্রিশটী দেবালয় বিদ্যমান আছে!

এখানে জনক মহর্ষির কূপে স্নান, তর্পণ করিতে হয় এবং ঐ কূপের জল সামান্য পান করিতে পারিলে বহু পুণ্য লাভ হয়, এই নিমিত্ত ভক্তগণ পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী সমস্ত পালন করেন। যে ব্যক্তি অযোধ্যায় বাস করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্থান মাহাত্ম্যগুণে তাহাকে আর পুনর্জ্জন্মের জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। যে স্থানের এত মহিমা যথায় স্বয়ং ভগবান লীলাবশে রামরূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখী করিবার নিমিত্ত স্বীয় লক্ষ্মী-স্বরূপা গর্ভবতী সীতাদেবীকে অকাতরে বনবাস দিয়াছিলেন সে স্থানে কেহ কখন পাপ কর্ম্মে মতি করিবেন না, এখানকার স্বাস্থ্য এবং জল বায়ু অতি উত্তম কোন ব্যক্তিকে কৃশ দেখিতে পাওয়া যায় না, ঘৃত দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

শ্রীরামনবমী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে কোন ব্রত করেন তিনি কোটী সূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ঐ তিথিতে যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করেন তাহার নিঃসন্দেহে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। রামনবমী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত হইলে সর্ব্বকামদায়িনী এবং মধ্যাহ্নব্যাপিনী হইলে মহা পুণ্য-দায়িনী হয়।

অযোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম প্রায় তিন মাইল পথ। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র বনোগমন সময়ে তদীয় ভ্রাতা ভরত শ্রীরামপাদুকা চিহ্ন স্থাপন করতঃ যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা দর্শন করিলে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উদয় হইবে।

অযোধ্যা নগরে প্রতিবৎসর শ্রাবণমাসে শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে মনিপর্ব্বতোপরি এক মহামেলা হইয়া থাকে। এই মেলাস্থানে অপরাহ্ন কালে নগরের যাবতীয় দেবালয় হইতে দেবমূর্ত্তি সকল সুসজ্জিত করাইয়া মহাসমারোহে এই মেলাস্থানে একত্রিত করা হয়, তখন এই জনশূন্য পাহাড় ও নিকটস্থ পল্লীসকল, সেইসকল দেবতাদিগের শুভাগমনে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। সেই সমারোহে হস্তী, উট, ঘোটক, বৃষ সকল নানাসাজে সজ্জিত হইয়া এবং বিবিধপ্রকারে গীত বাদ্য নাচ প্রভৃতি আমোদজনক ক্রিয়া করিতে করিতে নিজ নিজ দেবালয় হইতে শ্রীরামচন্দ্রের গুণগান করিয়া এইস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই মেলা দর্শন করিবার নিমিত্ত কত দূরদেশ হইতে যাত্রী সকল আসিয়া পরিপূর্ণ হন এমন কি তখন সেই মনিপর্ব্বত ও চতুর্দ্দিকে ক্রোশব্যাপী স্থানে তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না, মেলায় আসিয়া ভক্তগণ এই মনিপর্ব্বতের শিখরদেশে মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীরাম-সীতার নবজলধর পিতাম্বর শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করেন। আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেই মেলার সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম সুতরাং আমাদের অদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব মেলা দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। অযোধ্যায় তীর্থ

সকল দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় এবং এইস্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইতে হয়।

যে সকল ভক্ত যাত্রীগণ নৈমিষারণ্য তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাদিগকে এইস্থান হইতে গো-শকটে বা মানুষ-টানা গাড়ীর সাহায্যে সাত ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। তথায় দধিচীমুনির আশ্রম আছে বৃত্রাসুর সংহার সময় দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ সেই পুণ্যাত্মার নিকট বজ্র নির্ম্মাণ জন্য অস্থি প্রার্থনা করিলে মুনিবর কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি নিজ অস্থি তোমার উপকারার্থে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি কিন্তু আমায় কিছুদিনের জন্য অবসর প্রদান করিতে হইবে; আমি একবার তীর্থ সকল পর্য্যটন করিব, কারণ অদ্যাপি আমার সকল তীর্থ পর্য্যটন শেষ হয় নাই এতৎ শ্রবণে দেবরাজ বৃত্রাসুরের ভীষণ সংগ্রামের পরাজয় চিন্তা করিয়া অতিশয় ভাবিত হইয়া দেবর্ষিকে বলিলেন, ঋষিবর! আর আপনার বৃথা সময় নষ্ট করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের আবশ্যক নাই আমি এক্ষণে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল নৈমিষারণ্যে উপস্থিত করিতেছি, এই কথা বলিয়া দেব-রাজ তীর্থ সকলকে সমাদরে আনয়ন করিলেন। দেবরাজের কৃপায় নৈমিষারণ্যে সকল তীর্থই বিরাজমান আছেন। তদ্ভিন্ন এখানে একটি কুণ্ড আছে উহাকে পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ড বলিত। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলে, তাঁহার হস্তের দাগ কিছুতেই উঠে নাই তিনি ঐ কুণ্ডে প্রক্ষালণ করিবামাত্র উঠিয়া যায় তদবধি তিনি এই কুণ্ডের নাম পাপহরণ কুণ্ড রাখিয়া এই বর প্রদান করেন, অতঃপর যে কোন পাপী এই কুণ্ডে স্নান করিবে তাঁহার সর্ব্ব পাপ মোচন হইবে। এইস্থানে মহাবীর গরুড় গজ-কচ্ছপকে লইয়া আসিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আরও এখানে একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটী পীঠস্থান'ললিতাদেবী নামে বিখ্যাত আছেন।

কর্ণ প্রয়াগ।

গাড়োয়াল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পিণ্ডার ও অলকনন্দীর সঙ্গমস্থল। এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে বহুপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। হরিদ্বারের যাত্রীরা এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া থাকে, শঙ্করাচার্য্য এখানে একটি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দাতাকর্ণেরও একটী বিগ্রহমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই দাতাকর্ণের নামানুসারে ইহার কর্ণ প্রয়াগ নাম হইয়াছে।

হরিদ্বার তীর্থ-দর্শন-যাত্রা।

অযোধ্যা হইতে হরিদ্বার বা (হরোদ্বার) যাইতে হইলে আউদ-রোহিলখণ্ড রেলযোগে লকসার জাঃ নামক ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া হরোদ্বার নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে প্রায় একমাইল বাঁধা পাকা পথ দিয়া তীর্থস্থানে যাইতে হয়। এখানে গাড়ি ঘোড়া একা বা আহারীয় কোন দ্রব্যের অভাব নাই শীতঋতু ব্যতিত এখানে সকল সময়ই সুখে থাকা যায়। রাস্তাঘাট পরিস্কার ও প্রশস্ত, জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

হরিদ্বার গঙ্গাতীরস্থ একটী পবিত্র তীর্থস্থান ও ইহার দুইদিকে পর্ব্বত শ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা, ঐ ত্রিধারা কখলে আসিয়া পৌছিয়াছে। পর্ব্বতসমূহে অনেকগুলি বাস করিবার উপযুক্ত গুহা আছে। সাধুগণ ঐ গুহায় বাস করিয়া থাকেন; এখানে অনেকগুলি মঠ আছে কিন্তু কোন গৃহস্থকে তথায় বাস করিতে দেখা যায় না, কথিত আছে

হরিদ্বার স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। কাশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র যেরূপ বারাণসী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, হরিদ্বারে মা ভগবতীর কৃপায় সেইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশে ভগীরথ নামে মহাতেজোময় ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ সগরনন্দনগণ অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া কপিল-মুনির ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হন, রাজা ভগীরথ ইহা অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষ এই স্থির করিলেন যে, যাঁহারা ব্রহ্ম-শাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত্রিমার্গগামী "গঙ্গা" ব্যতিরেকে আর কে ত্রিদিবধামে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। সেই জলরূপিণী শিবাত্মিকা গঙ্গাই আমার পরম শক্তি, কেননা তিনি ত্রিশক্তিরূপিণী, করুণাময়ী, সুখাত্মক কৈবল্যস্বরূপা ও শুদ্ধধর্ম্মস্বরূপিণী। আমি বিশ্বরক্ষার্থে সেই পরমব্রহ্ম-স্বরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে লীলাবশে মস্তকে ধারণ করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব ; এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অমাত্যকরে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক পিতামহগণের উদ্ধারার্থ নাগাধিরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঙ্গাদেবীর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন ; কারণ কথিত আছে যে হর-পার্ব্বতী ও গঙ্গা এই ত্রিশক্তিই একত্রে বিদ্যমান আছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যাবতীয় পুরুষার্থ সমস্তই সূক্ষ্মরূপে গঙ্গায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীর আরাধনার ফলে রাজা ভগীরথ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণকে ব্রহ্মশাপ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বহিঃস্থিত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মরূপ জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থ হইয়াও জাহ্নবীতে অধিষ্ঠান করিতেছে। কলিযুগে যাহাদের চিত্ত কলুষিত, যাহারা পরদ্রব্য গ্রহণে রত এবং বিধিহীন ও ক্রিয়াবিহীন, একমাত্র গঙ্গা ব্যতিরেকে তাহাদের আর উপায় নাই। "গঙ্গা" "গঙ্গা" এই নাম জপ করিলে কালফণী রাক্ষসী-সদৃশী অলক্ষ্মী দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ভক্ত্যানু-

সারে গঙ্গা ইহলোক ও পরলোক উভয়েই ফলদাত্রী। কলিযুগে যজ্ঞ, দান, তপ, জপ, যোগ কিছুই গঙ্গা সেবার তুল্য নহে। যে ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর অর্চ্চনা না করে, তাহার কুল, যজ্ঞ, তপস্যা সকলই বৃথা হয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরাই মোহিত হইয়া গঙ্গাকে সামান্য নদীর তুল্য বিবেচনা করেন।
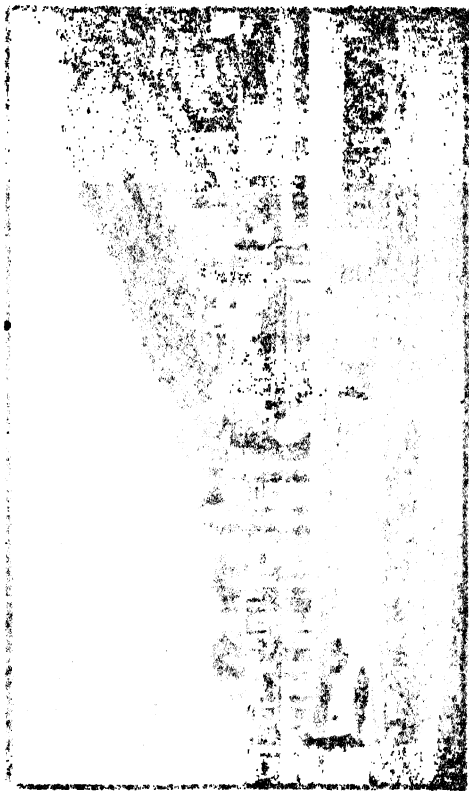
মহারাজ ভগীরথের কৃপায় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে পার্ব্বত্যপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গোমুখী হইতে কুলকুল শব্দে ভারতের সমতল-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল; সেই স্রোতগামী গঙ্গার দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে গঙ্গার দুইটী ধারা আছে, পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ সকল বিদ্যমান আছেন। এখানে ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্ত নামে যে দুইটী ঘাট আছে তথায় তীর্থ-পদ্ধতি-অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে ভাগীরথীর কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কৈলাসের হিমালয় পর্ব্বতের গোমুখি হইতে অবতরণপূর্ব্বক গঙ্গা হরিদ্বারে আসিয়া পতিত হন, এই নিমিত্ত হরিদ্বারকে স্বর্গদ্বার বলে এবং এইস্থানকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলে। এই তীর্থতীরে একটী গোদান, অন্নদান করিয়া দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহার বিষ্ণুলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার অনতিদূরেই কুশাবর্ত্ত ঘাট বিরাজমান। এখানে জনৈক ঋষি যোগ সাধন করিতেছিলেন, সেই সময় গঙ্গাদেবী হিমালয় হইতে স্রোতগামী হইয়া অবতীর্ণ হন এবং তাঁহার কুশ সেই স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যান, ধ্যানভঙ্গ মুনি নিজ কুশ দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন; তখন ভাগীরথী হৃষ্টচিত্তে ঋষির নিকট আসিয়া তাঁহার কুশ প্রত্যার্পণ করিয়া এই ঘাটের নাম কুশাবর্ত্ত রাখেন এবং এই বর প্রদান করেন, যে কেহ এই ঘাটে শুদ্ধ চিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবেন, আমার বরপ্রভাবে তিনি পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই ঘাটে অত্যন্ত বড় বড় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থস্থানের মৎস্য বলিয়া কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাচার করে না। যাত্রীরা এখানে আসিয়া মৎস্যদিগকে নানাপ্রকার আহারীয়

দ্রব্য প্রদান করিয়া নানাপ্রকার আমোদ অনুভব করেন এখানেও বানর আছে।

প্রথমেই শ্রীসর্ব্বনাথদেবের মন্দির, তৎপরে ভৈরবদেবের মন্দির, তাহার অনতিদূরেই মায়াদেবীর মন্দির। এই মায়াদেবীর পূর্ব্বদিকে নীলগিরি পর্ব্বত, পশ্চিমে বিল্লোকেশ্বর, পিছোড়নাথ এবং উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা। মায়াদেবী ত্রিমস্তক চতুর্ভূজা দুর্গামূর্ত্তি। ইহার হস্তে ত্রিশূল ও নৃমুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিদ্বারের চতুর্দ্দিকেই পাহাড় বেষ্টিত ভীমগড়ে যে কুণ্ডে পাণ্ডবদিগের শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ডেও অত্যন্ত মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে রেল লাইন পাহাড়ের মধ্য ভেদ করিয়া গমন করিয়াছে—উহা দেখিলে রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে যে মন্দির আছে, তথায় বিষ্ণুপদ-চিহ্ন ও গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে তাঁহাদের পূজা করিতে হয়।

চণ্ডীর পাহাড়। কুশাবর্ত্ত ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক পর্ব্বতোপরিভাগে শিখরদেশে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ মন্দির; মধ্যে মা চণ্ডীকা-দেবী বিরাজমান। এই পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইলে গঙ্গার নীলধারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হরিদ্বার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে কঙ্খল। ধর্ম্মাত্মা বিদুর এই স্থানে যোগসাধন করিতেন। এখানে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন স্বর্গারোহণকালে তাহার দুর্জ্জয় গদা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, প্রস্তর আকৃতি প্রকাণ্ড গদা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

হরিদ্বার হইতে কঙ্খল যে পাকা রাস্তা আছে উহার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এখানে গঙ্গার ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে,—সঙ্গমস্থানে জলের বিস্তার অত্যন্ত অধিক, এই সঙ্গমস্থানে অবগাহন করিলে পূর্ব্বজন্মের সকল

পাপ নাশ এবং অন্তিম সময়ে গঙ্গাদেবীর কৃপায় স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। এই সঙ্গমস্থলেই প্রজাপতি দক্ষরাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এইস্থানেই সতী, পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময় রোষভরে শূলপাণি সেই যজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন। নগরের দক্ষিণে দক্ষেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সীতাকুণ্ড আছে উহা দর্শন করিতে হয়, পর্ব্বতের উপরে বেদী মধ্যে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল অদ্যাপি প্রোথিত রহিয়াছে, এখানে আরও অনেক দেবালয় বর্ত্তমান আছে; এস্থান অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। যে সকল যাত্রী হৃষীকেশ ও লছ্‌মনঝোলা বা লক্ষ্মণঝোলা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এই স্থান হইতে যাত্রা করিবেন, যদ্যপি ঘোড়ার-গাড়ী করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হরিদ্বার হইতে ঘোড়ার-গাড়ী কুস্থল ও হৃষিকেশ যাওয়া আসার ভাড়া চুক্তি করিবেন, চারি পাঁচজন যাওয়া যায়, এইরূপ একখানি গাড়ীর ভাড়া ৫৲ টাকা লাগে। আমরা যাহাদের সহিত গিয়াছিলাম তাহাদের সমস্ত তীর্থস্থান জানা না থাকায় অধিকাংশ তীর্থ দর্শন ঘটে নাই, অথবা যাহা দর্শন করিয়াছি উহাতে কত কষ্ট, কত অধিক ব্যয় করিয়া দর্শন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত; সেই দুঃখে এই পুস্তকের সৃষ্টি, এই পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের কত উপকার হইবে তখন বুঝিতে পারিবেন।

হরিদ্বারের দুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তস্রোত (সপ্তধারা)। ইহার নয় ক্রোশ উত্তরে "হৃষীকেশ" সপ্তর্ষিমণ্ডলীর তপস্যার স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা। তথায় লক্ষ্মণ (অনন্তদেব) বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার সন্নিকটে গঙ্গার উপর সেতু আছে, উহা পার হইয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে হয়। যাহারা উপরোক্ত এই কয় স্থানে গমন করিবেন, তাহারা হরিদ্বার হইতে সুক্‌ল লইয়া যাত্রা করিবেন।

দিল্লী নগরের শোভা দর্শন-যাত্রা।

হরিদ্বার হইতে কুরুক্ষেত্র যাইতে হইলে দিল্লীতে গাড়ী বদল করিতে হয়, অতএব হরিদ্বার হইতে দিল্লীতে যাইবেন, কেননা যে দিল্লী পর্য্যায়ক্রমে হিন্দু মুসলমান এবং ইংরাজ-জাতির রাজধানী হইয়াছে। যে নগর পাণ্ডবদিগের ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া কথিত, যে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে রাজ্যে রাজসূয়যজ্ঞ হইয়া ত্রিভুবনের দেবগণ, নৃপতিগণ একত্রিত হইয়াছিলেন, যে দিল্লী নগরে ভুবনবিখ্যাত কুতবমিনারের তুলনা রহিত, যে দিল্লী নগরে সম্রাট বাদসাহগণ মনের সুখে সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ, অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া নানাপ্রকার সুখভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে বাদসাদিগের বিচার-গৃহ, বিলাস-ভবন, নাট্যশালা ভজনাগার, স্নানাগার প্রভৃতি অদ্যাপি দিল্লীফোর্টের মধ্যে যমুনাতীরে দেদিপ্যমান রহিয়াছে, যে দিল্লী সহরে এক্ষণে গ্যাস, জলের কল, ট্রামগাড়ী, এক্কাগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও বৃহৎ বৃহৎ সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হইয়া কত শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছে, যথায় পুলিশকোর্ট জজকোর্ট ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক সমস্তই বর্ত্তমান আছে, সেই সহর দুই একদিনের জন্য একবার নয়নগোচর করিয়া সুখানুভব করিতে ইচ্ছা হয় না কি?

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবকে যে পাণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত ও ভাগপত নামে পাঁচখণ্ড জমি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত নামক দুইখণ্ড জমী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট তিনখণ্ড জমী যমুনাগর্ভে লীন হইয়াছে। এইস্থানের চতুর্দ্দিকে গড়বেষ্টিত পুরাতন কেল্লা ছিল; ঐ কেল্লাটী মুসলমানদিগের কৌশলে এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহা পূর্ব্বে হিন্দু রাজার কেল্লা বলিয়া কিছুমাত্র চিনিবার আশা নাই।

দিল্লীর হুমায়ুন মস্‌জিদ্‌।

[৫০ পৃষ্ঠা]

S.lov Press, Calcutta.
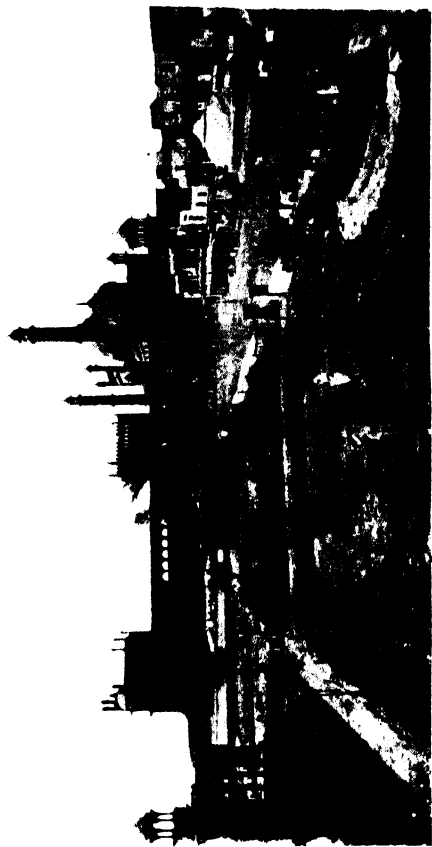
হুমায়ন মস্‌জিদ নামে এক্ষণে যে স্থান বিখ্যাত, অবগত হইলাম ঐ স্থান পূর্ব্বে তৃতীয়-পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুনের দুর্গ ছিল। আর সেরসার নামে যে রাজবাটী দেখিতে পাইবেন ঐ স্থান পাণ্ডুপুত্রগণ নারায়ণ এবং মহর্ষি ব্যাস কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু রাজসূয়-যজ্ঞস্থানের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ অবগত হইলাম যে, সেই যজ্ঞ স্থানেই দিল্লী সহর নির্ম্মিত হইয়াছে।

যে ঘাটে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন. সেই ঘাট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এক্ষণে উহা আগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত আছে। বাদসা সেরসা এই নগরের নাম পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং নিজ নাম অনুসারে ইহার সিয়ারগড় নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট সে নাম শ্রুত হওয়া যায় না, অদ্যাপি সকলে সেইস্থানকে ইন্দ্রপথ বলিয়া থাকে। ঐ কেল্লার চারিদিকে গড় এবং যমুনা নদীর সহিত সংলগ্ন আছে। এইস্থানে বাদসাদিগের বিলাস-ভবন, বিচার-গৃহ, স্নানাগার, মস্‌জিদ্‌, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুন্দর মারবেল পাথরের উপর হিরা, মাণিক, মুক্ত এবং সোণা রূপা প্রভৃতির সংযোগে এই রাজ বাটীর সৌন্দর্য্য অতি মনোহর, ইহা নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে হয়; এক্ষণে এই গৃহের মূল্যবান পাথর সকল অপহৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, না জানি যখন ঐ স্থান মূল্যবান পাথরসংযুক্ত ছিল, তখন ইহার সৌন্দর্য্য কত অধিক ছিল। এই কেল্লা এক্ষণে ইংরাজ-দিগের অধিকৃত হইয়াছে, তাহার চারিদিকে চারিটী গেট আছে, তথায় ইংরাজ-সেপাহিগণ অবস্থান করিতেছেন, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে কেল্লার ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইতে হয়, তাহারাও প্যালেস দেখাইবার নিমিত্ত বিনা আপত্তিতে পাশ দিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পাশ লিখিয়া থাকেন, তাহাকে দুই আনা পয়সা দিলে শীঘ্র পাশ পাওয়া যায়। ডুলুরাজার রাজত্বকালে তাঁহার নাম অনুসারে এই নগরের নাম দিল্লী হইয়াছে।

লালকোট ।—ইহা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নির্ম্মাণ করেন ; ইহার পরিধি আড়াই মাইল ষাট ফিট উচ্চ প্রাচীর এবং চতুর্দ্দিকে গড় বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তিন দিকের গড় বর্ত্তমান আছে, ইহাতে অনেকগুলি গেট দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের গেটকে "রণজিৎ গেট" বলে।

অনঙ্গপাল দিঘী ।—লালকোটের নিকট এই বৃহৎ দিঘী বর্ত্তমান আছে, ইহা ১৬৯ ফিট লম্বা এবং ১৫২ ফিট গভীর ; দ্বিতীয় অনঙ্গপাল এই বৃহৎ দিঘী প্রস্তুত করেন, তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে মহাম্মাদঘোরী দিল্লী অধিকার করেন, সেই সময় রাজা সপরিবারে এই অজেয় লালকোট নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন, অদ্যাপি সাধারণে ঐ কেল্লাকে "রায় পৃথ্বীরাজের কেল্লা" কহিয়া থাকে।

কুতুব মিনার ।—সম্রাট কুতব ইস্‌লামের রাজত্বকালে ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এই মিনার কোন হিন্দু রাজা তাঁহার কন্যা সূর্য্য উদয়ের সময় ইহার উপর হইতে গঙ্গাদেবীকে দর্শনপূর্ব্বক উপাসনা করিবেন ভাবিয়া নির্ম্মাণ করেন। মিনারের উত্তরদিকের দ্বারগুলি হিন্দুদ্বারের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে একটী ঘণ্টা আছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে হিন্দুনির্ম্মিত বলিয়াই অনুমান করিতে পারা যায়, কিন্তু মুসলমানদিগের কৌশলে মিনারকে হিন্দুনির্ম্মিত বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। মিনারের পাঁচ থাক ক্রমান্বয়ে লাল, সাদা এবং রক্তবর্ণ মারবেল পাথরের নির্ম্মিত দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

ইহার উচ্চতা ১৫২ হাত এবং পরিধি প্রায় ৯৮ হাত আছে। মিনারে বিবিধ রঙ্গের যে পাঁচটী থাক আছে উহা পাঁচটী কুঠারিবিশিষ্ট, এই কুঠারিগুলির মধ্যে কোনটী কোণবিশিষ্ট, কোনটী অর্দ্ধ চক্রাকার, কোনটী বা সম্পূর্ণ অর্দ্ধ চক্রাকার, আবার কোনটী বা গোলাকার দেখিতে পাওয়া যায়। মিনারের উপরে উঠিবার ৩৭৬টী ধাপ আছে।

দিল্লীসহরে আঙ্গুর, কিচ্‌মিচ্, পেস্তা, সরদাল, নাশপাতি, আপেল প্রভৃতি

নেওয়া সকল তাজা বৃহৎ এবং অল্পমূল্যে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। এখানে কতপ্রকার আশ্চর্য্য জিনিস আছে তাহা কত বর্ণনা করিব? অল্প সময় থাকিয়া যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে তিনি সেইরূপই দেখিতে পাইবেন।

কুরুক্ষেত্র তীর্থদর্শন যাত্রা।

দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা করিতে হইলে ই, আই, রেলযোগে আম্বালায় উপস্থিত হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে থানেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকপূজ্য, প্রাচীন, প্রশস্ত পবিত্র তীর্থ বলিয়া কথিত আছে। এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে গমন করিলে স্থানমাহাত্ম্য-গুণে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই তীর্থে যাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অন্তিমে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বর্গে পুণ্যাত্মাদিগের সহিত স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহার তুলনা রহিত এই কারণবশতঃ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে এই পবিত্র নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই দেবতুল্য স্থানের বায়ুবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি ও দুষ্কৃতকর্ম্মীকে পরম পদ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, পরমপদ শ্রীহরির কৃপা ব্যতীত এই স্থান দর্শন করা দুরূহ। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত আছে। যে সকল ভক্ত শুদ্ধাচারে ভক্তিপূর্ব্বক এইস্থানে বাস করেন, তাঁহাদিগের সুরলোকে বাস করা হয়; পুরাণে এইরূপ কথিত

আছে। এখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, যক্ষগণ ও পন্নগগণ সর্ব্বদা আসিয়া এই তীর্থের সেবা করেন।

কুরুক্ষেত্রে অগ্নি-তীর্থ, অমৃতকূপ, অরুণা-সঙ্গম (অরুণা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানকে) বলে। ইন্দ্রবারি, ওঘবতী, ঔশনস, কাম্যকবন, কৌবের তীর্থ, কৌশকী-সঙ্গম (কৌশকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গম স্থানকে) বলে। তৈজসতীর্থ, দধিচীতীর্থ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্থ, যযাতিতীর্থ, দেবীপাচন-তীর্থ, বিষ্ণুপদ-তীর্থ প্রভৃতি তীর্থ সকল প্রসিদ্ধ। বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একটি বৃহৎ দিঘী আছে, ইহার চতুর্দ্দিক বাঁধান সোপানবিশিষ্ট, মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ দ্বীপ বর্ত্তমান, ঐ দ্বীপে যাইবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটী সেতু আছে। মহাবীর ঔরঙ্গজেব এই দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; ইহার পশ্চিম পার্শ্বে চন্দ্রকূপ নামে একটী পবিত্র তীর্থ আছে, সূর্য্যগ্রহণকালে অনেক যাত্রী এই স্থানে আসিয়া স্নান দান ও শ্রাদ্ধ করেন। কুরুক্ষেত্রের স্থাণুতীর্থ হইতে থানেশ্বর নাম হইয়াছে। এখানে অজাযুথ ঘাট হইতে রত্নযক্ষ পর্য্যন্ত ছয় মাইলের মধ্যে ৯১টী তীর্থ বর্ত্তমান আছেন। কুরুপাণ্ডবের রণভূমি, অদ্যাপি ঐ রণস্থল রক্তবর্ণ বালুকাময়ী এবং মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের গদার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থেও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া সুফল লইতে হয়।

মথুরা তীর্থদর্শন-যাত্রা।

কুরুক্ষেত্রের থানেশ্বর ষ্টেশন হইতে এম্, এম্, রেলযোগে মথুরা নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শুনিবেন কোন পাণ্ডা কানমে নাড়ু সাড়ে আট ভাই, কেহ হরগোবিন্দ চোবে, কেহ হরকিসন চোবে

বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ নারায়ণ সিংহ সাড়ে সাত ভাই বলিতেছে, অর্থাৎ ইহারা সাত ভাই ও একটি অবিবাহিত, যাহার বিবাহ হয় নাই তাহারা তাহাকে অৰ্দ্ধ বিবেচনা করেন। উহাদের বিশ্বাস, যাত্রীগণ গয়া, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের শেষে মথুরায় আসেন, পরিশেষে বৃন্দাবন যাত্রা করেন, এই নিমিত্ত সেই সাত ভায়ের মধ্যে সাত ষ্টেশনে থাকিয়া যাত্রীদিগকে তাহাদের নাম শুনাইতে থাকে, কেননা যাত্রীরা সেই নাম স্মরণ করিয়া সেই নাম অনুসারে তাহাকে পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন।

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। মথুরা একটী বিখ্যাত সহর, রাস্তা ঘাট পরিষ্কার ও প্রশস্ত; এখানে পুলিশকোর্ট, জজকোর্ট প্রভৃতি সমস্তরই সুবন্দোবস্ত আছে, এখানে ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা গাড়ি, পাল্কী সমস্তই এবং আহারীয় সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়, এখানে বহুলোকের বাস আছে। যে সকল পাণ্ডা এখানে বাস করেন, তাহারা সকলেই চতুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাহারা চোবে নামে খ্যাত।

মথুরায় মহাপরাক্রমশালী কংসের বাসস্থান ও রাজধানী। এখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাকালে যমুনা তীর হইতে সুনীল অম্বরতলে দীপালোকে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য মুখরিত মন্দির শোভিত মথুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

যে সকল ধর্ম্মাত্মা এই পবিত্র পুরী দর্শন করেন বা শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদি শ্রবণ করেন অথবা ভক্তিপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া তাঁহাকে আরাধনা করেন বা তাঁহার লীলা সকল কীর্ত্তন করেন, সেই পুণ্যাত্মারাই ধন্য। এই পুরীর মধ্যে যে স্থান অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত, যাহারা তাহার মধ্যে বসবাস করেন, অন্তিমে তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি এই অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারবিশিষ্ট স্থানে শুদ্ধাহারী হইয়া পবিত্র যমুনায় স্নান করেন বা এইস্থানে জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহারা নিঃসন্দেহে বিষ্ণু-

লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে পাপীর অস্থি যতদিন থাকিবে, ততদিন সে ব্রহ্মলোকে পূজিত হইবে।

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে সম্বৎসরান্তে কার্ত্তিক মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে আসিয়া তীর্থের কার্য্য করেন, তিনিই তপস্যাকারী ; যদিও তিনি এ জন্মে কোন তপস্যা না করিয়া থাকেন, কিন্তু জন্মান্তরে তিনি নানাপ্রকার তপস্যা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে এই মথুরা প্রদক্ষিণ করেন তিনি ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, ব্রতভঙ্গকারী মহাপাপী হইলেও স্থানমাহাত্ম্যগুণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমস্ত কুলের সহিত বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এইস্থানে আসিয়া ভগবান্ শ্রীহরির বিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করেন, সে নিশ্চয়ই প্রভুর কৃপায় মথুরা প্রদক্ষিণের ফললাভ করিতে পারেন। হে মহামহিমান্বিত ! তোমার কৃপা না হইলে কি কখন কেহ এই পবিত্র তীর্থস্থানে আসিতে পারে ?

যে ভক্ত কার্ত্তিকমাসে একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মগৃহে প্রবেশ করিতে পারেন অথবা গোকুলে তাঁহার বাল্যলীলা সকল দর্শন করিতে পারেন, তিনি পরম অব্যয় কৃপাময়ের কৃপায় তাঁহারই শ্রীচরণে স্থান পাইয়া থাকেন।

মথুরাপুরীতে একটীমাত্র উত্থান একাদশীর ব্রত পালন অপেক্ষা ইহসংসারে অধিক কর্ত্তব্য কাজ আর কিছুই নাই। একাদশী ব্রত করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহমূর্ত্তির শ্রীচরণে তুলসী প্রদান না করিলে ব্রতকারীর কোন ফলই হয় না, অতএব এই ব্রত করিয়া বিগ্রহমূর্ত্তির শ্রীচরণে তুলসীপত্র প্রদান এবং রাত্রি-জাগরণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ব্রতকারীকে কখন সংসার মায়ায় পতিত হইতে হইবে না।

আহা ! মথুরাপুরী কি পবিত্র স্থান। যেস্থানে বলরাম, অনুজ শ্রীকৃষ্ণসহ পণ্ডিত লোকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীলা করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে অসুরগণের সহিত বিনাশ করিয়া সকলকে
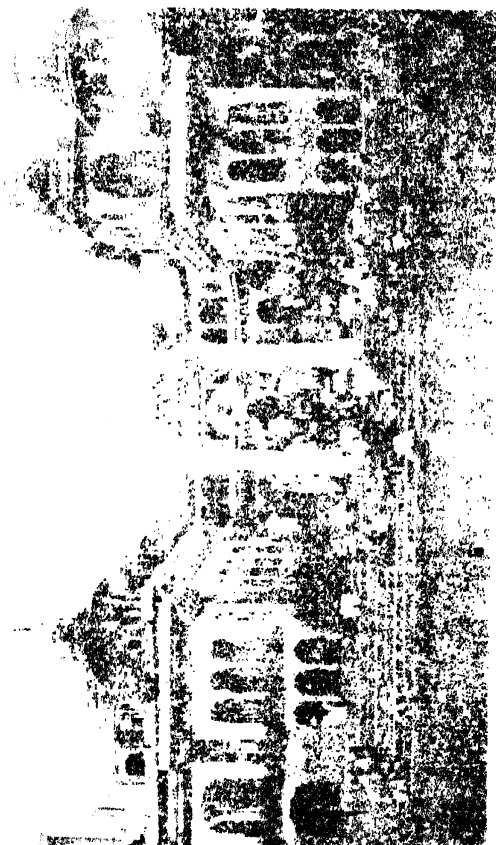
অভয় দিয়াছিলেন, সেই সকল অসুরগণ তাঁহার পবিত্র স্পর্শমাত্র উদ্ধার হইয়া যোগীদিগের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মথুরামণ্ডলের দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন, বিশ্বব্যাপী হরি এই স্থানে মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মথুরাবাসীদিগকে অভয় দান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত সতত বিশ্রাম করিয়া থাকেন, অতএব মথুরায় আসিয়া এইস্থান দর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মথুরার পূর্ব্বদিকে যমুনা প্রবাহিত। যমুনাতীরে বিচিত্র থরে থরে সোপানশ্রেণী দ্বারা শোভিত চব্বিশটি ঘাট তন্মধ্যে মথুরাতে বারটী ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়।

• যমুনার পূর্ব্ব তীরে মথুরা সহরে বিশ্রান্ত বা বিশ্রাম ঘাট বর্ত্তমান। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই ঘাটের নাম বিশ্রাম ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটে যথানিয়মে স্নান করিয়া তিল তর্পণ করিলে স্বয়ং হরি পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে স্থান দিয়া থাকেন। যে সকল মানব সংসাররূপ মরুভূমে অবতরণ করিয়া ক্লেশভোগ করিতেছেন, তিনি এই বিশ্রাম ঘাটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে পূজা করিলে কৃপাময় কৃপা করিয়া তাহাকে বিশ্রাম সুখ দান করিয়া থাকেন।

বিশ্রাম ঘাটের শোভা মনোমুগ্ধকর, মথুরায় যে বারটী ঘাট বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে এই ঘাটের শোভাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার সন্ধ্যা-আরতি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাহা দেখিলে হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হয়, অতএব যাঁহারা এখানে আসিবেন তাঁহাদিগকে সন্ধ্যার সময় এই ঘাটের আরতি দর্শন করিতে অনুরোধ করি।

বিশ্রাম ঘাটে তীর্থ স্নান, তর্পণ, করিয়া যে ব্যক্তি অচ্যুতের পূজা করেন, তিনি নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার কৃপায় সংসারের সকল তাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

এই ঘাটে সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে স্নান, তর্পণ, পূজা করিয়া পর পর দশটী ঘাটে সঙ্কল্প করিয়া শেষে ধ্রুবঘাটে পৌছিবেন। এই ধ্রুবঘাটের উপরিভাগে এক পাহাড়ের উপর বালক ধ্রুব ইচ্ছাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাত্রীগণ ধ্রুবের তপস্যা-মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন; নিকটেই সাক্ষীগোপাল বিরাজমান, তথায় গমন করিয়া সেই পুণ্যময় তীর্থ ঘাটে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিলে ধ্রুবলোকে পূজিত হয়।

যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই তীর্থতটে পিতৃপক্ষে, বিধবা স্ত্রীলোক হইলে শ্বশুর কুলের শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সমস্ত পিতৃলোককে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে সাক্ষীগোপালকে দর্শন করিয়া সাক্ষ্য করিতে হয় এবং তীর্থ সকল সম্পন্ন করিয়া সস্ত্রীক তীর্থগুরু চোবেকে (পাণ্ডাকে) সন্তোষের সহিত সাধ্যানুসারে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসে শুক্লদ্বাদশী তিথিতে এখানে উপস্থিত হইয়া যমুনা জলে স্নান করিয়া শ্রীহরির মূর্ত্তি দর্শন করিলে উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয়। সূর্য্যকন্যা "যমুনা" কালিন্দী পর্ব্বত ভেদ করিয়া এখানে একটানা স্রোতে প্রবাহিতা।

মথুরা তীর্থে উপস্থিত হইয়া ষ্টেশন হইতে যে বাঁধান প্রশস্ত রাস্তা আছে, তথায় মথুরা নামক গেট মধ্যে প্রবেশকরতঃ অফুরন্ত দেবালয় সকল দর্শন করিতে করিতে বড়বাজার চকে উপনীত হইবেন, তথায় শেঠজীর বৃহৎ রূপার তালগাছবিশিষ্ট দেবালয় দর্শন করিবেন। মথুরা সহরে শেঠজীর দেবালয় বিখ্যাত এবং আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনীয়। এখানে যতগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে অত্যন্ত উচ্চে স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার পর এই সকল দেবালয় ও রাস্তা এবং দোকান সকলের মধ্য দিয়া গমনকালীন শোভা দর্শনে কত আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে ভাবিবেন যেন এই নগরই স্বর্গপুরী,

যদিও আমরা স্বর্গ কিরূপ জানিতে পারিনা, কিন্তু এইরূপই মনে হইবে। এখানে বানরের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে থাকায় যাত্রীগণকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়।

মথুরা সহরের মধ্যে ধ্রুবঘাটের পশ্চিমভাগে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে কংসটিলা বর্ত্তমান আছে। এইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কংসকে তাহার সমস্ত বীর যোদ্ধাগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন হেতু উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কংস ও তাহার যোদ্ধাগণের প্রতিমূর্ত্তি সকল কুবলয়পীড় নামক হস্তী প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল চিত্র দর্শন করিতে হইলে পাণ্ডারা যাত্রীদিগের নিকট পৃথক ।০ আনা হিসাবে আদায় করেন। এই যজ্ঞস্থান ও রণভূমি দর্শন করিলে হৃদয়ে এক অপরূপ ভাবের উদয় হয়।

যে মথুরা কংসের নিমিত্ত বিখ্যাত, যে কংসকে বধ করিবার নিমিত্ত পূর্ণব্রহ্ম অনাদিদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নামে নরদেহ ধারণ করিয়া পিতামাতা ও পুরবাসিগণকে সকল প্রকার যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার করিয়া এই পুরী পবিত্র করিয়াছেন সেই কংস কিরূপ প্রকারে বিনাশ হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

মথুরা সহরে কংসালয়, মহাবীর ঔরঙ্গজেব সমস্তই ধ্বংশ করিয়া একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বিশ্রামঘাটের পার্শ্বে কংসের বাস ভবনের ভগ্নাংশ কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

কংস বধ।

একদা দেবর্ষি নারদ কংস সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে রাজন! দেবকীর অষ্টম গর্ভে যে কন্যা হইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বস্তুতঃ ঐ কন্যা দেবকীর গর্ভজাত কন্যা নয়, সে যশোদার কন্যা বলিয়া জানিবেন। দেবকীতনয় রামকৃষ্ণকে তোমার ভয়ে আপন মিত্র নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়া

আসেন। তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্তচরগণ তাঁহাদের সন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা সকলেই ঐ দু'জনার হস্তে নিধন হইয়াছে, ইহাতে কি তুমি ভাবিতেছ না যে, তুমিও উহাদের হস্তে নিশ্চয় মরিবে। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কংস ক্রোধান্ধ হইয়া বসুদেব বধার্থে শাণিত অসি উত্তোলন করিলে, নারদমুনি নানাপ্রকারে শান্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। দুরাত্মা কংস তখন বসুদেব ও দেবকীকে এক লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া কারাগারে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন, এবং ভোজপতি ও অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হে বীরগণ! রামকৃষ্ণ নামে দুইপুত্র গোকুলে গোপরাজ নন্দগৃহে বাস করিতেছে, নারদ মুখে শুনিলাম ঐ দু'জনের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে, অতএব এখানে সত্বর মল্লরঙ্গ নির্ম্মাণ কর, রঙ্গদ্বারে কুবলয়পীড় স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা আমার অরিগণকে বধ করিবার চেষ্টা কর, চতুর্দ্দশীতেই যজ্ঞ আরম্ভ কর ঐ যজ্ঞে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া যে কোনরূপে বিনাশপূর্ব্বক আমার চিন্তা দূরীভূত কর।"

অসুরশ্রেষ্ঠ মহাবীর কংস এইরূপ পরামর্শ করিয়া অক্রূরকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "হে সুহৃদ্! তুমি সুহৃদের পরিচয় প্রদান কর, নন্দগৃহে বসুদেবের যে রামকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র আছে, তাহাদিগকে ধনুর্যজ্ঞ ও আমার মথুরা পুরীর শোভাদর্শন করিতে আনয়ন কর। উপঢৌকনসহ মহারাজ নন্দ প্রভৃতি গোপদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া আমার প্রিয় সুহৃদের কার্য্য কর তাহাদের এখানে আনিতে পারিলে কালসম কুবলয়পীড় হস্তী দ্বারা তাহাদের দু'জনার প্রাণসংহার করিয়া আমার সকল ভয় দূর করিব, যদি তাহাতে তাহারা কোনরূপে রক্ষা পায়, তাহা হইলে বজ্রসম মল্লগণদ্বারা তাহাদিগকে শমন ভবনে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিব।"

পরম বৈষ্ণব অক্রূর মনে মনে কংসের বিনাশকাল উপস্থিত বিবেচনা করিয়া পূর্ণব্রহ্ম তেজঃময় শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণতঃ হইয়া কংশের আদেশে রথারোহণ পূর্ব্বক গোকুলে নন্দগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে নারদঋষি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভো! আপনি রজোরূপী দৈত্য ও রাক্ষসগণকে বিনাশ এবং সাধুদিগকে রক্ষার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে কেশী দৈত্যের ভয়ে দেবতারা সদাসর্ব্বদা কম্পিত হইত, আপনি অনায়াসে তাহাকে বধ করিলেন। আশা করি হে জগৎপতে! আপনি শীঘ্রই চানূর, মুষ্টিক গজ ও কংসকে সংহার করিবেন।" তাহার পর শঙ্খ, যবন, মুর, নরক প্রভৃতি ভবিষ্যতে নানাবিধ লীলার বিষয় উল্লেখ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

লঙ্কেশ্বর রাজা বিভীষণ ও কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি সুগ্রীব দূত মুখে অবগত হইলেন যে, "পূর্ণব্রহ্ম" পুনঃরায় লীলাবশে রামকৃষ্ণ নামে গোকুলনগরে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং দুর্জ্জন কংসাসুর তাঁহাদের বাল্যাবস্থায় নিমন্ত্রণপূর্ব্বক নিঃসহায় পাইয়া অবলীলাক্রমে বিনাশ করিবে। এই দুঃসম্বাদে অজ্ঞ সুগ্রীব অধীর হইয়া শ্রীরামচরণ ধ্যান করিয়া সসৈন্যে তাঁহাদের সাহায্যের নিমিত্ত গোকুলনগরে উপস্থিত হইলেন কিন্তু ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ বিভীষণ তাঁহার বিক্রম পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন সুতরাং তিনি তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিবার নিমিত্ত বীর রাক্ষসসৈন্যগণসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। এইরূপে গোকুলনগর ভক্তগণের শুভাগমনে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণও তাহাদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পূজাগ্রহণ করিয়া ভক্তের আশা পূর্ণ করিলেন, কিন্তু পুরবাসিগণ সেই বীর রাক্ষসগণকে কংসের চর অনুমান করিয়া ভীতমনে তাহাদের ত্রাণকর্ত্তা রামকৃষ্ণের স্মরণাপন্ন হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে মধুরবচনে তুষ্ট করিয়া বিভীষণকে লঙ্কাপুরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু সুগ্রীব সৈন্যের কোনরূপ আপত্তি না শুনিয়া তাহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিলেন, এইরূপে কপিসৈন্যগণ ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করিতেছে, শ্রুত আছে যে ব্রজমণ্ডলে ব্রজবাসিগণ প্রাণত্যাগ করিয়া বানররূপে অবস্থান করে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

দেবর্ষি নারদের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া জগচ্চিন্তামণি কি নিমিত্ত নরদেহ ধারণ করিয়াছেন উহা একবার চিন্তা করিলেন এবং মথুরা দর্শনের নিমিত্ত অক্রূরের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে ভক্তপ্রবর অক্রূরও রথারোহণে গোকুলে মহারাজ নন্দগৃহে উপস্থিত হইয়া অন্তরের সহিত তাঁহাদের উভয়ের শ্রীচরণ পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া মথুরা-পুরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর, অক্রূর কংসের মন্ত্রণা সকল যথাযথ প্রকাশ করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ হাস্যসহকারে মহারাজ নন্দের নিকট মথুরার শোভা এবং ধনুর্যজ্ঞস্থান দেখিবার জন্য আবদার করিতে লাগিলেন, এতৎশ্রবণে নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণের মায়া অবগত না হইয়া সমস্ত গোপবৃন্দকে উপঢৌকনসহ শকট আরোহণে মথুরা যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, পরদিবস অক্রূর ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে রথারোহণে মধুপুরে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন এক রজক উত্তম উত্তম বস্ত্র লইয়া কংসালয়াভিমুখে যাইতেছে, তদ্দর্শনে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট বস্ত্র যাচ্ঞা করিলেন, ইহাতে রজক রোষান্বিত হইয়া তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদান ও তিরস্কার করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন যে, ঐ সকল বস্ত্র তাঁহার মাতুল কংসরাজার, সুতরাং মাতুলের সম্পত্তিতে ভাগের অধিকার আছে এইনিমিত্ত রজকের নিকট বস্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নির্ব্বোধ রজক চক্ষু থাকিতে ও সেই নবজলধর শ্যামরূপধারী প্রভুর মায়া-প্রভাবে তাঁহাকে জানিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণ রজকের বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তদ্বারাই তাহার মস্তক ছেদন করিলেন, তদ্দর্শনে রজকের অনুচরেরা বস্ত্রাদি ফেলিয়া প্রাণভয়ে কংসরাজার নিকট আশ্রয় লইল। তখন তাঁহারা মাতুলের সম্পত্তি সম্মুখে পাইয়া ভাল ভাল বস্ত্র পছন্দ করিয়া পরি-ধান করিলেন। উভয়ে সুসজ্জিত হইয়া এক মালাকারের বাটীতে গমন করিলেন; মালাকর সেই বালকদ্বয়ের অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া

নিজ হস্তে উত্তম উত্তম মালা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে সজ্জিত করাইলে তাঁহারা উভয়ে রাজপথে মনের সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই এক কুব্জা সুন্দরী যুবতি বিলেপন হস্তে গমন করিতেছে দেখিয়া সেই যুবতির নিকট উভয়ে গমনপূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, "হে সুন্দরি ! তুমি আমাদিগকে উত্তম অনুলেপন দান করিয়া সুসজ্জিত কর।"

কুব্জা পূর্ব্ব হইতে বলরামের অপরূপ রূপে মোহিত হইয়াছিল এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বচনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই সাধ্যমত অনুলেপন করাইয়া স্পর্শ সুখে নিজেকে ধন্যা বোধ করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিল। এইরূপে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া সেই সুন্দরী যুবতিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রামকৃষ্ণ কংসরাজার মথুরাপুরীর শোভা দর্শন ও ধনু যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় ইন্দ্রধনুর ন্যায় এক অপূর্ব্ব ধনু রহিয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক উহাতে জ্যারোপণ করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক ভগ্ন করিলেন ; তখন এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইয়া কংসহৃদয় ব্যথিত করিল। ধনু-রক্ষকেরা এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া মার মার শব্দে বালকদ্বয়কে আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ভগ্ন ধনু লইয়া যোদ্ধাগণকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন, তৎশ্রবণে কংস ভয়ে ও ক্রোধে তাহার বলিষ্ট উত্তম উত্তম বহুসংখ্যক সৈন্য সকল বাছাই করিয়া রামকৃষ্ণকে নাশ করিবার জন্য সত্বর প্রেরণ করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে সেই সকল সৈন্যদিগকে বধ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং মথুরাপুরীর শোভা দর্শন করিতে করিতে ভক্ত অক্রূরালয়ে শকট স্থাপিত করিয়া বিশ্রাম সুখে রাত্রিযাপন করিলেন।

অসুররাজ কংস যখন শ্রবণ করিলেন যে সেই বালকদ্বয় তাহার ইন্দ্র-ধনুর্ভঙ্গ ও রক্ষকগণকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন, যাহাদের বাহুবলে

ত্রিভুবন কম্পিত হইত আজ কিনা তাহারা সামান্য বালকদ্বয়ের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, কালের কি বিচিত্রগতি ! মূর্খ কংস এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই রাত্রিতে জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তাহার মৃত্যুর বিবিধ দুর্লক্ষণ দেখিয়া নানাবিধ দুর্ভাবনায় আর তাহার নিদ্রা হইল না। রজনী প্রভাত হইবামাত্র মল্লক্রীড়ার মহোৎসব করিতে রাজা আদেশ করিলেন। বীরপুরুষেরা রঙ্গস্থানের পূজা, মঞ্চ এবং তোরণগুলি পুষ্পমালা ও পতাকাদ্বারা সুশোভিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বৃদ্ধি করাইল। রণস্থানে তুরি, ভেরি ও নানাপ্রকার রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও নানাজাতি পুরবাসিগণ মঞ্চের নানাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। দুরাত্মা কংস অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজমঞ্চে উপবেশন করিলেন। চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি বীরগণ মল্লবেশ ধারণকরতঃ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া রণস্থলে আগমন করিল।

রামকৃষ্ণ পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমারা যখন ইন্দ্রধনুর্ভঙ্গ করিয়া বলপ্রকাশ করিলাম তাহাতেও কংস আমাদের পিতামাতাকে কারামুক্ত করে নাই অথচ আমাদের বিনাশোদ্যোগ করিতেছে, তখন তিনি মাতুল হইলেও তাঁহার বধে আমাদের কোন পাপ হইবে না। এমন সময় রণস্থল হইতে ঘন ঘন দুন্দুভির শব্দ হইতে লাগিল, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া বালক রামকৃষ্ণ রণোল্লাসে রণ রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হস্তিপক চালিত কুবলয়পীড় হস্তি তথায় অবস্থিতি করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ত্বরায় মল্লবেশ ধারণপূর্ব্বক হস্তিপককে মধুরবচনে বলিলেন "ওহে হস্তিপক ! আমাদিগকে প্রবেশ-পথ দাও, নতুবা তোমাকে হস্তিসহ সমনসদনে প্রেরণ করিব।" ইহাতে হস্তিপক কুপিত হইয়া হস্তিকে আরও শ্রীকৃষ্ণের দিকে চালিত করিল; তখন গজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া তাহার শুণ্ডদ্বারা ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ নিজবলে হস্তিকে ভূমে পাতিত করিয়া তাহার দন্ত উৎপাটিত করিলেন এবং ঐ দন্তাঘাতেই তাহাকে

শমন সদনে পাঠাইয়া, সেই দন্ত স্কন্ধে রুধিরাক্ত কলেবরে বলরামের সহিত রণস্থলে প্রবেশ করিলেন।

তখন চানূর রামকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা দুইজনেই বাহুযুদ্ধে দক্ষ, কংসরাজ ইহা অবগত হইয়া পরীক্ষার নিমিত্ত তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্‌হাস্য করিয়া বলিলেন, যদিচ আমরা বনচর (গোকুল অরণ্যমধ্যে স্থাপিত) ও বালক, তথাপি কংস রাজারই প্রজা, রাজাদেশ আমাদের পক্ষে অনুগ্রহ, কিন্তু আমাদের সমান বলশালী বালকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি, তাহাহইলে এই সভাসদ্‌দিগের পক্ষে কোনরূপ অধর্ম্ম হইবে না। কংসের মল্লদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে এরূপ বলেন নাই। যে কৃষ্ণ সহজে ভয়ানক ধনুর্ভঙ্গ, মহাবলশালী কুবলয়পীড় হস্তিকে অনায়াসে বিনাশ করিলেন, তিনি যে মল্লদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যাহাতে মল্লযুদ্ধ না হয়। মল্লগণ তাঁহার থায় মল্লযুদ্ধ প্রতিনিবৃত্তির পরিবর্ত্তে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, সুতরাং চানূরের সহিত কৃষ্ণ ও মুষ্টিকের সহিত বলরাম বহুক্ষণ মল্লযুদ্ধক্রীড়ায় নিরত থাকিয়া তাহাদিগকে সংহার করিলেন ; এইরূপে তাঁহারা বহু মল্লগণকে বিনাশ করিলে, তথায় যে সকল মল্লগণ ছিল, তাহারা সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

দুরাত্মা কংস তখন রণবাদ্য নিবারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ; "এই বালক দুটাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দাও, গোপদিগের ধনসম্পত্তি লুট করিয়া লও, দুষ্ট বসুদেবকে শীঘ্র বিনাশ কর, আমার পিতা উগ্রসেন পরপক্ষপাতী, অতএব উগ্রসেনকেও অনুচরগণের সহিত সংহার কর।" কংসের সেইরূপ অহঙ্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইয়া সভাসদ্‌গণের সম্মুখে একলম্ফে রাজমঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংস সেই মৃত্যুরূপী কৃষ্ণকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া ত্বরায় অসিবর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিনা বাক্যব্যয়ে কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিম্নে

নিক্ষেপ করিয়া আপনিও তাহার উপর পতিত হইলেন, এইরূপে যখন তাহাদের মধ্যে বহুক্ষণব্যাপী যুদ্ধ হইতেছিল, তখন কংসের অষ্ট-ভ্রাতা এককালে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল। রোহিণীনন্দন বলরাম একা তাহাদিগকে অনায়াসে বিনাশ করিলেন, এবং রামকৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া মহাবীর কংসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, ঠিক্ সেই সময় পৃথিবী ভেদ করিয়া সর্ব্বসংহারকারী পার্ব্বতী-পতি, রামকৃষ্ণকে সভাস্থলে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "একের সহিত উভয়ে মিলিত হইয়া যুদ্ধ নিষিদ্ধ, এইরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিলে সর্ব্বজনে আপনাদের অপযশ কীর্ত্তন করিবে। অতএব আমার আদেশমত একের সহিত একজনে যুদ্ধ কর।" এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তিনি অন্তর্হিত হইলেন। শঙ্করের আদেশানুরূপ তখন শ্রীকৃষ্ণ একা কংসকে বধ করিলেন, কিন্তু বলদেব শ্রীকৃষ্ণকে বল দিয়াছিলেন। এইরূপে দুরাত্মা কংস নিধন হইলে, আকাশ হইতে দুন্দুভি বাজিতে লাগিল; রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ রামকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ কংসাদির বনিতা দ্বারা তাহাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, এবং বসুদেব ও দেবকীর বন্ধনমোচন করাইয়া বৃদ্ধ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাইলেন।

মথুরা সহরের পশ্চিম ভাগে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ঐ মন্দির স্বয়ং কংস প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য ভক্তিসহকারে ভূতেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেন। ভাদ্র মাসে বন প্রদক্ষিণ করিতে যে সকল যাত্রী গমন করেন, তাহারা সকলেই এই মহাদেবকে দর্শন করিতে পান, কিন্তু যাঁহারা কেবল মথুরায় আসেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতেশ্বরকে দর্শন করিতে পান না, ইহার কারণ এই যে, সকলেরই ভূতেশ্বরের মন্দির জানা নাই। মথুরায় গমনপূর্ব্বক ভূতেশ্বর মহাদেবের পূজা ও দর্শন না করিলে তিনি সকল তীর্থ ফল হরণ করিয়া থাকেন, অতএব যাত্রিগণ এই

তীর্থে আগমন করিয়া ভূতেশ্বর মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে ভুলিবেন না। এই স্থান হইতে গোকুল তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে সকল যাত্রী গোকুল (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্থান) দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মথুরা হইতেই যাত্রা করিবেন। যমুনার পূর্ব্বপার সমস্তই গোকুল নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম মহাবন। মথুরা হইতে যমুনার পূর্ব্ব তীরে প্রায় দশ মাইল বাঁধা পথে গোকুলস্থ নন্দালয়ে যাইতে পারা যায়। পথে কাম্যবন দর্শন করিবেন, এই বনে রাজা যুধিষ্ঠির পাঁশা খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর বাস করিয়াছিলেন এবং এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে কাম্যবনে অবস্থিতি করিতেন, এইস্থানে গোপবালা যশোদার একটী রমণীয় সরোবর আছে। ঐ সরোবরে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে স্বীয় অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। কাম্যবন দ্বাদশবনের মধ্যে চতুর্থ বন, ইহার ন্যায় সুন্দর বন আর ব্রজমণ্ডলের মধ্যে নাই, অতএব যাত্রীরা এই কাম্যবন দর্শন করিবেন। যাঁহারা ব্রজ-মণ্ডলের সমস্ত বনভ্রমণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহাদিগকে জানান হইল। তথায় সহস্র তীর্থ ও পৃথক সরোবর আছে।

কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ জীউর যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা দেখিলে মন মোহিত হয়। তাঁহার মন্দিরের নিকটেই বৃন্দাদেবী বিরাজ করিতেছেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দনাথজী দর্শন করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা হিসাবে ভেট দিতে হয়। কাম্যবনে চৌরাশী থাম্ব অর্থাৎ চৌরাশীটী কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরের থামযুক্ত একটী সুন্দর গৃহ আছে উহা দর্শন করিলে চিত্ত-রঞ্জন এবং প্রাণ শীতল হইবে। এখানে যাত্রীগণ কামেশ্বর দেবকে অর্চ্চনা করিতে ভুলিবেন না।

গোকুল।

উচ্চ পাহাড়ের উপর নন্দভবন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুধের গোপাল, ননীর পুত্তলি রামকৃষ্ণকে দর্শন করিলে সকল কষ্ট দূর হইবে, মন প্রাণ শীতল হইবে, মহারাজ ও মহারাণীর বাৎসল্যভাব স্মরণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইবেন। বহুভাগ্য ও পুণ্যফলে এস্থান দর্শনলাভ হয়। এই-স্থানকে নন্দীশ্বর বলে। যে নন্দীশ্বরে জরা, মৃত্যু, দ্বেষ, হিংসা নাই, যেস্থান তেত্রিশ কোটী দেবগণ বাঞ্ছিত, যেস্থানে সকলই আনন্দময়, যে নন্দীশ্বর-বাসীগণ মাত্রেই আত্মসুখ বর্জ্জিত ; যথায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-সুখে সুখী যথায় ভবযন্ত্রণা দূর হয়। ঐ নন্দীশ্বর দর্শনে নয়ন সার্থক করিলে, জন্মান্তরে সুখময় নন্দীশ্বর লাভ করিতে পারা যায়।

নন্দালয়ে প্রথমে গর্গমুনির দর্শন পাইবেন, তৎপরে বসুদেব দেবকী, কংস-কারাগারে যেরূপ বিষাদিতাবস্থায় দিনযাপন করিয়াছিলেন, সেই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের মলিনমুখ দেখিবেন। কংসের বহুসংখ্যক মল্ল, ভাগ্যবতী যশোদাদেবী, মহারাজ নন্দ প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা, পর্জ্জন্য গোপ (ইনি নারদ মুনির শিষ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন) উগ্রসেনের প্রতিমূর্ত্তি ও শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ লীলাক্ষেত্র "হাউবনে ঝাউ" এই সকল নয়নগোচর হইলে না জানি কত আনন্দ অনুভব করিবেন।

নারদ মুনির প্রিয় শিষ্য "পর্জ্জন্য গোপ" নন্দীশ্বরে বাস করিতেন ; যখন দুরাত্মা "কেশী দৈত্য" ব্রজপুরে গমন করিয়া উৎপাত আরম্ভ করে, তখন পর্জ্জন্য গোপ আত্মীয় স্বজন সহিত আগমনপূর্ব্বক বাস করেন। যাত্রীগণ সেই পুণ্যাত্মার প্রতিমূর্ত্তি গোকুলে দর্শন পাইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের নিকটেই একটী বৃহৎ কুণ্ড আছে, উহা বহুসংখ্যক প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত, ইহার নাম পোৎরা কুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণের

জন্ম হওয়ার পর সুতিকা-গৃহের বস্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহার নাম পোৎরাকুণ্ড হইয়াছে। মথুরাবাসীরা ইহাকে একটী তীর্থ বলিয়া মান্য করেন, এই কুণ্ডের জল পবিত্র জ্ঞানে স্নান, কেহবা স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হন, যাত্রীরাও এই স্থানকে মথুরাবাসীদিগের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। গোকুলে আসিলে তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিতে হয়, যথা প্রথম শ্রীকৃষ্ণ বলরামের, দ্বিতীয় মহারাজ নন্দালয়ে, তৃতীয় পর্জ্জন্য গোপালয়ে। এই তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিয়া পাণ্ডা ব্রজবাসীকে শ্রদ্ধাপুর্ব্বক দক্ষিণাসহ ভোজন করাইয়া ন্যূনকল্পে ॥• আট আনা দান করিয়া সুফল লইতে হয়।

এই নন্দালয়ের নিকট ব্রহ্মাণ্ড ঘাট দেখিতে পাইবেন। এক দিবস গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণসহ ক্রীড়া করিতে করিতে যশোদা রাণীর নিকট সংবাদ দিল, মা! কৃষ্ণ আজ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে। তৎশ্রবণে রাণী রাগান্বিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়দর্শন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইল, তিনি কিছুই প্রকাশ না করিয়া গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "গোপাল! তুই কি নিমিত্ত মাটী খাইয়াছিস? তোর ঘরে কিসের অভাব ছিল চাঁদ?" শ্রীকৃষ্ণ জননীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, "না মা, আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় যশোদার বিশ্বাস হইল না, মনে ভাবিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "মা! আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হইতেছে না, আপনি আমার মুখ দেখুন।" এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুখ-ব্যাদন করিলেন। রাণী সেই কৃষ্ণ-মুখমধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিলেন, এমন কি সেই ক্ষুদ্র মুখে সমস্ত ব্রজমণ্ডল ও আপনাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ান্বিতা হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, একি! আমি স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার বুদ্ধিভ্রম ঘটিল? যাহা হউক রাণী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং বারম্বার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হায়!

মায়ার কি বিচিত্র গতি! জগৎ যাঁহার নিকট কুশল যাচ্ঞা করে, আজ যশোমতী তাঁহারই কুশল কামনা করিতেছেন। ধন্য প্রেম! শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্য-মায়া বিস্তার করিয়া ও নন্দরাণীর বাৎসল্য প্রেমের কিছুমাত্র হ্রাস করিতে সক্ষম হইলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় মায়া সঙ্কোচ করিলেন। যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ এই আশ্চর্য্য ঘটনা যশোমতীকে দেখাইয়াছিলেন, সেই স্থানের নামই "ব্রহ্মাণ্ড ঘাট।"

যশোদা পুত্রকে অঙ্কে ধারণপূর্ব্বক সেই কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহাভিভূত হইলেন। শ্রীনন্দের নন্দন যে স্থানে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে স্থানের মৃত্তিকা কি সুস্বাদ ও পবিত্র। অনুরোধ করি এই "ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের" একটু মৃত্তিকা মুখে দিয়া আস্বাদ অনুভব করিবেন ও পবিত্র হইবেন। যাত্রীগণ! এই ঘাটে স্নান ও অর্চ্চনাদি করিয়া, যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, তাহার ফলে অন্তিমে সদ্গতি হইবে।

যদি কাহারও রূপ ও গুণ দুই বর্ত্তমান থাকে, তিনি যেমন স্বভাবতঃ সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন, যাঁহার এত মাহাত্ম্য তিনি কি আমাদের প্রিয় হইবেন না। আমরা কি সেই পুরুষপ্রধানকে বিস্ময়োৎফুল্লনয়নে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব না? বসুদেব ও দেবকী যাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া বাৎসল্য জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বহুপ্রকার স্তব ও আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম করিয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ বালকরূপ নারায়ণের স্বরূপ দর্শনে আমরা কি তাঁহার একবার স্তবও করিতে পারিব না?

ইহার নিকটেই কংসালয় দেখিতে পাইবেন। কংস ভবনের স্তূপাকার প্রস্তর ও রাশিকৃত ইষ্টক ভিন্ন আর কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব কংসের বাসভবন প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

ইহার অনতিদূরে শ্রীকেশবদেবের মন্দির। এই মন্দিরে কেশবজীর দর্শন

ও অর্চ্চনা করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়, এরূপ করিলে সপ্তদ্বীপ *সহিত পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয়। এই মন্দির ও শ্রীবিগ্রহদেব* মথুরায় কতকাল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না, ইহাতেই বোধ হয় যে, ইহা বহুকাল পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল।

গোকুলে যে সমস্ত গোপদিগের বাসস্থান, উহার অধিকাংশই খোড়ো ঘর, অপর অপর স্থানে যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে সেরূপ কিছুই নাই, কারণ অবগত হইলাম গোপগণ কাহাকেও এখানে ঐরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেয় নাই, এই নিমিত্ত এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া সহজেই গোয়ালার দেশ বলিয়া অনুমান হয়।

গোকুল হইতে মহাবন এক ক্রোশ ব্যবধান, সমস্তই পাকা রাস্তা। ইহা যমুনার নিকটবর্ত্তী, অতি রমণীয় স্থান। এইস্থানে শ্রীবল্লভাচার্য্য গোস্বামীদের কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবালয় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে গোকুলনাথের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

গোকুল হইতে প্রত্যাগমনের সময় মধুবন দর্শন করিয়া মথুরায় আসিবেন, এই বনে মধুনামক এক দৈত্যের বাসস্থান ছিল, বলদেব তাহাঁকে বধ করিয়া মধুপান করিয়াছিলেন, আর এখানে মধুনামে যে এক কুণ্ড আছে, যাত্রীগণ ঐ কুণ্ডে স্নান দানাদি করেন। ঐ কুণ্ডের এক মাইল ব্যবধানে উচ্চ টিলার উপরে ধ্রুবজীর তপস্যার স্থান; মধুবনে আসিবার সময় প্রথমে ঐ স্থান দর্শন করিয়া আসিলেই বিশেষ স্থবিধা হয়। এই স্থানটি পরম রমণীয়, অথচ জনশূন্য; দেখিলেই প্রকৃত তপস্যাস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

মানব পঞ্চ তীর্থে স্নান করিয়া যে ফললাভ করেন, মথুরায় "কৃষ্ণগঙ্গা" নামে যে বিখ্যাত তীর্থ বিরাজমান আছেন, উহাতে স্নান করিলে, এক দিনে তাহার দশগুণ ফল লাভ করিতে পারেন। দশহরা দিবসে এ দেশবাসী

বহুসংখ্যক লোক তথায় স্নান করিয়া থাকেন। মথুরাধামে "কৃষ্ণগঙ্গা" একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ।

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যমুনাতীরে স্ব স্ব বৎস সকল চারণ করিতেছিলেন, সেই সময় কংসচর এক দৈত্য বৎসরূপ ধারণপূর্ব্বক, বৎস-গণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে দৈত্যের মায়া দেখাইলেন এবং স্বয়ং তাহার নিকট গমন করিয়া সহসা তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুইটি পদ ধারণ করিয়া শূন্যমার্গে ঘুরাইয়া একটী কপিত্থ বৃক্ষে নিক্ষেপ করিয়া দৈত্যকে সংহার করিলেন।

তদনন্তর তাঁহার বয়স্যগণ উপহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল, সখে! বৎসাসুরকে বধ করায় তোমার গোহত্যা পাপ হইয়াছে, অতএব গঙ্গা-স্নানপূর্ব্বক তুমি পাপ হইতে মুক্ত হও। তখন শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে আনয়ন-পূর্ব্বক এইস্থানে স্নান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার "কৃষ্ণগঙ্গা" নাম হইয়াছে।

মথুরা সহরে অধিকাংশ ধর্ম্মশালা, দেবালয় ও তীর্থঘাট সকল মহারাজ ভরতপুরাধিপতি ও অন্যান্য বহু ভাগ্যবান পুরুষদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া সহরের এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করাইয়াছেন। যমুনার পুলের উপর হইতে এই সহরের দৃশ্য দেখিলে কাশী সহর বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে মথুরা তীর্থস্থান হইতে ফিরিতে সহজে মন হয় না, এইরূপ স্থানে আসিতে কাহার না ইচ্ছা হয়, এই মথুরাপুরীকে স্বর্গপুরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে সকল যাত্রী শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড তীর্থস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহরা এই মথুরা সহর হইতেই যাত্রা করিবেন, কেননা এখানে ভাল ভাল ঘোড়ার গাড়ী ও এক্কা গাড়ী পাওয়া যায়। শ্যামকুণ্ড মথুরা হইতে প্রায় আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তথায় যাইতে হইলে, ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা গাড়ী, উষ্ট্রের গাড়ী বা গোশকটে যাইতে হয়। এখানে বাঁধা প্রশস্ত রাস্তা

গিরিগোবর্দ্ধন। [৭৩ পৃষ্ঠা]
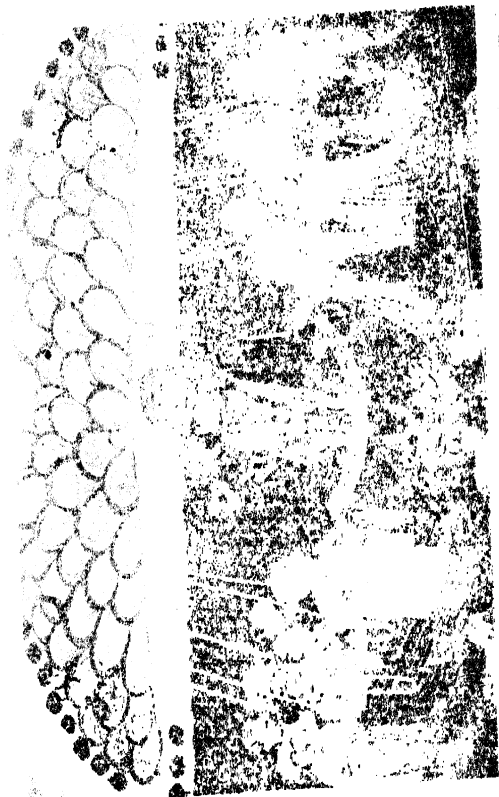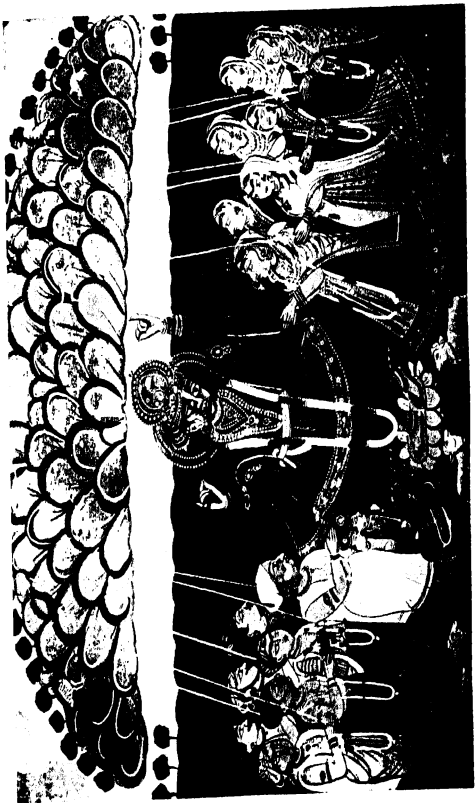
আছে. মধ্য পথে গোবর্দ্ধন তীর্থ, শান্তনকুণ্ড, মানসী গঙ্গাতীর্থ এই সমস্ত দেখিতে পাইবেন।

শান্তনকুণ্ড তীর্থ।

শান্তনকুণ্ডের অপর নাম গন্ধেশ্বরী তীর্থ। শান্তনুমুনি এই রমণীয় তীর্থে তপস্যা করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শান্তন-কুণ্ড হইয়াছে। এই তীর্থস্থানে যে সরোবর আছে, উহাতে ভক্তিসহকারে সঙ্কল্প করিয়া জলস্পর্শ করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই তীর্থস্থানে সঙ্কল্প করিয়া সাধ্যমত তীর্থগুরুকে এক পয়সা হইতে নগদ এক আনা দিতে হয়।

গিরি-গোবর্দ্ধন তীর্থ।

শান্তনকুণ্ড হইতে চারি মাইল দূরে গোবর্দ্ধন তীর্থ দর্শন হইবে। মথুরার পশ্চিমদিকে এই তীর্থ বিরাজমান আছেন। গিরি-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগ-বানের স্বরূপ বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বকালে মহারাজ নন্দ ও গোপসকল ইন্দ্রদেবের পূজা করিতেন, কারণ সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন রাখিতে পারিলে, সুবৃষ্টি হইবে, তদ্দ্বারা উত্তম রূপে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে।

গোপ সকলের গোপালন ও কৃষিকর্ম্মই একমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের উপায় ছিল। একদা মহারাজ নন্দ ও গোপ সকল ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া যুক্তিপূর্ণ বাক্যে তাঁহাদের নানাপ্রকারে বুঝাইয়া ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে উপদেশ দিলেন। গোপরাজ নন্দ ও অন্যান্য গোপ সকল বালক কৃষ্ণের সেই মধুর যুক্তিপূর্ণ তর্ক সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাসমারোহে

গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তিনি ভাবিলেন স্বয়ং শ্রীহরি এখানে বর্ত্তমান থাকিতে অন্য দেবতার কিরূপে পূজা হইতে পারে, সেই নিমিত্ত তিনি নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিয়া গিরিরাজের পূজা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজে গোপাল-রূপে গোবর্দ্ধন তাহা কোনরূপে প্রকাশ করিলেন না।

দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁহার পূজা নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘ সকলকে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। বর্ষণাধিপতি ইন্দ্রের আদেশমত মেঘ সকল প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, অশনিপাতও হইতে লাগিল, এইরূপে ব্রজমণ্ডলে মহাপ্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইলে, ব্রজবাসীদিগের হাহাকার ধ্বনিতে ব্রজমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সেই ক্লেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া গিরি-রূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগকে ধেনুসহ সেই গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিতে বলিলেন, তাঁহার আদেশমত গোপ ও গোপিনীগণ আপন আপন গোধন সহিত সেই গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

যাত্রীগণ যে গিরি-গোবর্দ্ধন দর্শন ও প্রদক্ষিণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ করিয়া ইহাকে সাত দিন সাত রাত্রি বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেই অলৌকিক ক্ষমতাদর্শনে লজ্জিত হইয়া মেঘ সকলকে বারি বর্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন, তাঁহার আদেশে বর্ষণ বন্ধ হইয়া আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে আপন আপন গোধন লইয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ করিলে পর গোবর্দ্ধনরূপ ভগবান্ যথাস্থানে সেই গিরিকে স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজবাসীদিগের আনন্দের অবধি রহিল না, তাঁহারা সকলেই গিরিরাজকে পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন এবং মহারাজ নন্দ ও যশোদা দেবী বারম্বার বালক কৃষ্ণের মুখচুম্বন

করিলেন, কেননা এই কৃষ্ণের উপদেশ মত গোবৰ্দ্ধনের পূজা করিয়াছিলেন, এবং তিনি বিপদের সময় মূৰ্ত্তিমান হইয়া সাক্ষাৎদানে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন। এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের কোপানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

এই তীর্থস্থানে শ্রীকৃষ্ণ সদাসর্ব্বদা ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীসহ বাস করিয়া থাকেন। এখানে যে বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন উহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বৃক্ষের পত্রে কত ঠোঙ্গার ন্যায় পাতা সকল দেখিতে পাওয়া যায়; কথিত আছে, ঐ ঠোঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট ননী খাইয়াছিলেন। এই তীর্থে গমন করিলে পাণ্ডাদ্বারা মানসীগঙ্গায় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া জলস্পর্শ বা স্নান করিতে হয় এবং সাধ্যমত ব্রজবাসী পাণ্ডাকে দক্ষিণা দিতে হয়।

যখন নন্দ মহারাজ ও গোপসকল কৃষ্ণের উপদেশমত গোবৰ্দ্ধনদেবের পূজা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মানসেই এইস্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয়, এই কারণে এই সরোবরের নাম "মানসীগঙ্গা" হইয়াছে। মানসীগঙ্গার উত্তর তীরে চক্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন, এই ব্রজমণ্ডলে মহাদেব চারি নামে বিখ্যাত ও পূজ্য হইয়া আছেন, যথা বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবৰ্দ্ধনে চাকলেশ্বর, আর কাম্যবনে কামেশ্বর। গোবৰ্দ্ধন তীর্থে গমন করিয়া চাকলেশ্বর মহাদেবকে অর্চ্চনা করিতে হয়।

গোবিন্দকুণ্ড তীর্থ।

মানসীগঙ্গার এক মাইল উত্তরে গোবিন্দকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের চারিদিগ নানাবিধ তরুমূলে সুসজ্জিত, এখানে ময়ূর, ময়ূরীগণ ও বানরগণের নানাপ্রকার নৃত্য দেখিলে, মনে হইবে যেন তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত

হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছে।—এই স্থান অতি রমণীয় এবং এই কুণ্ডের জল অতি নির্ম্মল। শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার স্তবে প্রসন্ন করিয়া দেবগণসহ এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন এবং নানা তীর্থের জল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করেন এবং কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ রাখেন, এই নিমিত্ত এই তীর্থ গোবিন্দের নাম অনুসারে গোবিন্দকুণ্ড হইয়াছে। এই কুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিলে বহু যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং পিতৃপুরুষদিগের স্বর্গে গতি হয়।

গোবিন্দকুণ্ডের তীরে দুগ্ধ দানছলে, মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে কৃপা-পূর্ব্বক দর্শন দান করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে গোপাল মৃত্তিকায় আচ্ছাদিত ছিলেন। পুরীগোস্বাই স্বপ্নে অবগত হইয়া, তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক মহা-সমারোহে অন্নকূট উৎসব করিয়াছিলেন, এই উৎসবে স্বয়ং গোপাল ভোজন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড তীর্থ।

এই তীর্থে যাত্রীদিগের থাকিবার খুবই সুবিধা, পাকা দ্বিতল ধর্ম্মশালায় বাস করিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থের সন্নিকটে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও মহলারকুণ্ড এই চারিটী কুণ্ড আছে, তন্মধ্যে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড এই দুইটীই বিখ্যাত, অপর দুইটী লুপ্তপ্রায়, কেবল চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুরাত্মা কংসচর অরিষ্টাসুরের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল; শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে পরিত্রাণ করেন, এই দুর্জ্জয় অসুরের বৃষের ন্যায় আকৃতি থাকায় সকলে ইহাকে বৃষাসুর বলিত। এই তীর্থের সন্নিকটে যে সকল দেবালয় আছে,
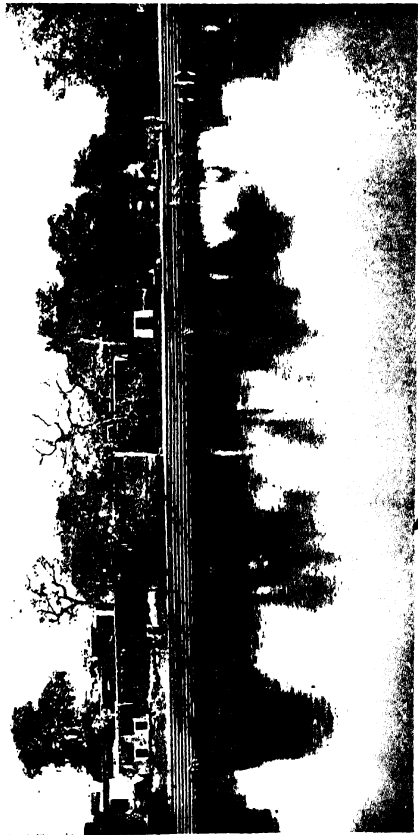
শ্যামকুণ্ড।

Lakshmibilas Press.

সে সকলগুলিতেই লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ। বানরগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায় যাত্রীদিগকে সদাসর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। এই বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ননী খাইয়া বৃক্ষে, হস্তলেপন করিয়াছিলেন অদ্যাপি সেই চিহ্ন সকল বর্ত্তমান আছে আরও এখানে মণিপুরের রাজবাটী আছে তথায় সুন্দর বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন।

শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি

শ্রীকৃষ্ণ বৃষাসুরকে বিনাশ করিয়া, সখা ও ধেনুবৎসদিগকে স্থানান্তরে রাখিয়া একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা প্রিয় সখীগণসহ পুষ্পচয়ন করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাদের নিকট যাইয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আমার এই মনোহর উদ্যানে কে প্রত্যহ শাখা পল্লবাদি ভগ্ন করিয়া পুষ্পচয়ন করে? অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোন্ সন্ধান করিতে পারি নাই, আজ ভাগ্যবলে তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি," এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ধরিতে গেলেন।

তখন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "এই মাত্র তুমি বৃষাসুরকে বধ করিয়া গোহত্যা পাপগ্রস্ত হইয়াছ, অতএব আমাদের স্পর্শ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বিনয়বাক্যে গোপিনীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ পাপ হইতে মুক্ত হইব তোমরা আমায় বল"। তখন শ্রীরাধা বলিলেন পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে স্নান করিয়া আসিলে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার বাক্যে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যদি আমি সর্ব্ব তীর্থে স্নান করিয়া আসি, তাহা হইলে হয়ত এই গোপবালিকাদের বিশ্বাস হইতে না পারে, অতএব

ইহাদের সম্মুখে এই কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। এইরূপ স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বংশী দ্বারা একটী সরোবর প্রস্তত করিয়া ভূমিতলে পদাঘাত করিবামাত্রই পাতাল হইতে ভোগবতীর জল ও তীর্থ সকল পৃথিবী ভেদ করিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন, এইরূপে সকল তীর্থ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার মধ্যে স্নান করিয়া পুনঃরায় গোপবালাদিগের নিকট গমন করিলে, তাহারা তীর্থের আগমন বিষয় অস্বীকার করিলেন। তখন তিনি তীর্থগণকে স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, তাঁহার আদেশ মাত্র তীর্থগণ নিজ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপিনীদিগের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন, এইরূপে শ্যামকুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কুণ্ডে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক স্নান, তর্পণ, দর্শন বা স্পর্শ করিবেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধি হইবে; কেননা পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় সলিল রূপে এই কুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন।

রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব।

শ্যামকুণ্ডের সৃষ্টি হইলে শ্রীমতী রাধিকাও একটী কুণ্ড প্রস্তত করিতে অভিলাষ করিয়া সখীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।. সখীগণ শ্রীরাধার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া উহা সম্পন্ন করিবার জন্য শ্যামকুণ্ডের উত্তরে বৃষাসুরের ক্ষুরক্ষত একস্থান খননপূর্ব্বক একটী মনোহর সরোবর নির্ম্মাণ করিলেন, লীলাময়ের ইচ্ছায় তিনি কৌতুক দেখিবার জন্য উহাতে জল উঠিতে দিলেন না, তখন সখীগণ বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন। শ্রীমতীকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া সেই জগৎচিন্তামণি ব্যঙ্গ-

ছলে বলিলেন 'তুম্মো! তোমাদের সরোবরে আমার ন্যায় জল উঠিল না, অতএব তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার কুণ্ড হইতে জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করিয়া দাও।' গোপবালাসহ শ্রীমতী রাধিকা একবাক্যে বলিলেন, তোমার কুণ্ডের জল পাতকযুক্ত, কেন না তুমি গোহত্যা করিয়া উহাতে স্নান করিয়াছ, ঐ জল ইহাতে পূর্ণ করিলে ইহাও অপবিত্র হইবে, আমরা মানস সরোবরের পবিত্র নির্ম্মল জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করিব। গোপিনীগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ সকলকে ইঙ্গিত করিলেন, তীর্থগণ তাঁহার মনোভাব অধগত হইয়া শ্রীরাধার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রীরাধা তাঁহাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তীর্থ সকলকে স্বীয় কুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; এইরূপে রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছে। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে ভক্তি-সহকারে এই কুণ্ডদ্বয়কে অর্চ্চনা করিবেন তিনি অক্ষয় হইয়া ত্রিসংসারে সুখে থাকিতে পারিবেন এবং রাধাকৃষ্ণের কৃপায় অন্তিমে বৈকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই কুণ্ড দ্বয় পূজা করিতে দুগ্ধ, চিনি, ফুল শাড়ী, থালা, গেলাস প্রভৃতি প্রদান করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় এবং ঐ পূজা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি ব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া এই কুণ্ডদ্বয়ের অর্চ্চনা না করেন, তাহার সমস্ত জীবন বৃথায় নষ্ট হইবে।

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড উভয় কুণ্ডই পাশাপাশি অবস্থিত এবং দেখিতে একই প্রকার। এই উভয় কুণ্ডই চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় সোপানশ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত এবং তীরে বৃহৎ বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে, দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছে। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে সকল পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল গুলিই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা খেলার শ্রীচরণ চিহ্ন বলিয়া জানিবেন।

আহা! ব্রজবাসীগণ, অতি পুণ্যাত্মা, যেহেতু পদচিহ্নধারী ও বিচিত্র-

ভূষণধারী কমলাদেবী যাঁহার আজ্ঞাবহ, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কত লীলা করিয়া গোচারণ করিয়া থাকেন। ভগবান যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কখন কোন জন্মে এত সুখ অনুভব করেন নাই, যেরূপ এই ব্রজমণ্ডলে ব্রজবালাদিগকে লইয়া সুখানুভব করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি পদবিক্ষেপে এই ব্রজপুরী শুদ্ধ হইয়াছে, ইহার ফলে ব্রজের সমস্ত রজগুলিও পবিত্র হইয়াছে।

যে কৃষ্ণ মথুরায় কংস-কারাগারে দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে কংস ভয়ে বসুদেব যমুনাপারে গোকুলনগরে গোপরাজ নন্দগৃহে রাখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যথায় নন্দরাণী যশোদাদেবীর যত্নে সুখসচ্ছন্দে ও গোপবালকগণের সহিত একত্রে গোচারণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করিতে অভিলাষী হইলেন?

একদা শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত গোকুলের বনে বনে বৎসচারণ করিতেছিলেন, সেই সময় বলদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এ বনে গোপালগণের সহিত ক্রীড়া আমাদিগের উচিত হইতেছে না, এ কাননের সমস্ত সুখ আমাদের উপভোগ করা হইয়াছে, এখানে পূর্ব্বের ন্যায় তৃণ নাই, কাষ্ঠ নাই, সে সকল বৃক্ষ নাই; গোপগণ প্রায় সকল বৃক্ষই ছেদন করিয়াছে। পূর্ব্বে এইস্থানে যে সকল উদ্যান ও উপবন সুশীতল ছায়াসমন্বিত পাদপরাজিতে বিরাজিত ছিল সে সমস্তই শূন্যপ্রায় হইয়াছে, নিবিড় তরুপল্লবে সমাচ্ছন্ন থাকাতে যেস্থান হইতে বহির্ভাগে দৃষ্টি সঞ্চারিত হইত না, এক্ষণে সেই সকল আশ্রয়তরুর অপসমেও অবশিষ্ট বৃক্ষসমূহের সমাবৃত পল্লববিগমে চতুর্দ্দিক পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

তৃণ, বারি ও আশ্রয়স্থান এ কাননে এক্ষণে নিতান্ত দুর্ল্লভ, পূজনীয় বনস্পতিগণ নিতান্ত বিরল। বৃক্ষগণ ফলশূন্য ও বিরল-পল্লব হওয়াতে বিহঙ্গগণ স্ব স্ব কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে প্রস্থান করিয়াছে, এ বনে

আর সে সুখ নাই, সে আনন্দ নাই, মনোহর পুষ্পপরিমলবাহী সে সুগন্ধি সমীর হিল্লোলও নাই। অরণ্যজাত তৃণকাষ্ঠাদি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে এই আভীর-পল্লীবাসীগণের পক্ষে তত্তৎদ্রব্য নিতান্ত দুর্লভ ও নগরসদৃশ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। যেমন পর্ব্বতের ভূষণ বন, তদ্রূপ গোপগণের ভূষণ গোধন। সেই গোধনই আমাদের পরম ধন। হে অগ্রজ! তৃণ জলাভাবে এই স্থান যখন সেই গোধনগণেরই কষ্টকর হইতে লাগিল, তখন আর এস্থানে অবস্থান করা কোনক্রমেই আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। যে স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ, কাষ্ঠ ও সলিলাদি সুলভ, তাদৃশ ভোগবহুল স্থানেই গমন করা আমাদিগের পক্ষে এক্ষণে শ্রেয়ঃকর। ধেনুবৎসগণ, নিত্য নব তৃণভক্ষণে সমৎসুক, অতএব তাদৃশ তৃণক্ষেত্র সমাযুক্ত বিরামপ্রদ স্থানে বাস করাই নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অধিকন্তু অত্রত্য গোষ্ঠসমূহের তৃণ পত্রাদি নিরন্তর গোময় ও গোমূত্র লিপ্ত থাকাতে, ধেনু-বৎসগণ তাহা প্রায়ই ভক্ষণ করে না, যদিও অগত্যা ভক্ষণ করে, তদ্দ্বারা দুগ্ধবতী গাভীগণের দুগ্ধ সঙ্কোচ হয়; বিশেষতঃ ব্রজবাসী সাধারণ গোপ-গণের নির্দ্দিষ্ট গৃহ অথবা নিরূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আশু এই জঘন্য স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সুবিমল শষ্পাচ্ছাদিত সমতলক্ষেত্রে আমাদিগের বাস করা কর্ত্তব্য। হে ভ্রাতঃ! আমি শ্রবণ করিয়াছি, যমুনাতীরে বৃন্দাবন নামে এক রমণীয় কানন বিদ্যমান আছে, তথায় সুকোমল তৃণ, ছায়াবহুল বৃক্ষ, সুস্বাদু ফল ও নির্ম্মল সলিল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রয়োজনীয় কোন বস্তুরই অভাব নাই।

অনতিদূরে মন্দরশৈলসদৃশ গোবর্দ্ধন নামে এক সমুন্নত শিখর, রমণীয় ভূধর বিরাজিত আছে, সেই গিরিগোবর্দ্ধনের শিখরদেশে কাননস্থ দেবদারু মন্দরসদৃশ সুপবিত্র ভাণ্ডীর বট বিদ্যমান। সুরনদী মন্দাকিনী সরিদ্বরা যমুনা ও তদ্রূপ সেই বৃন্দারণ্যের সীমান্তরূপে সুশীতল প্রবাহে বনান্ত-ভাগ নিরন্ত পরিবেষ্টিত করিতেছে। হে দেব! এক্ষণে এই কুৎসিত বন পরি-

ত্যাগ করিয়া সাধুবাঞ্ছিত সেই বৃন্দাবনে ঘোষবল সংস্থাপন করাই সৎপরামর্শ বিবেচনা করিতেছি, তথায় বিচরণ সময়ে সুচারু গোবর্দ্ধন, পুণ্যময় ভাণ্ডীর বট এবং সুনীলসলিলা তরঙ্গিণী কালিন্দীকে নয়নগোচর করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু উপস্থিত এক্ষণে এস্থানে কোনপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া গোকুলবাসীগণকে সন্ত্রস্ত না করিলে উঁহারা সহজে তথায় যাইতে সম্মত হইবেন না।

বিশ্বচক্রী বাসুদেব বলরামকে এই সকল বাক্য নিবেদন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার দেহ হইতে এককালে শতসহস্র বৃক (ব্যাঘ্র) আবির্ভূত হইয়া ব্রজমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল; সেই শোণিত মাংসলোলুপ ভীষণ ব্যাঘ্র সকল ব্রজপুরী মধ্যে গাভী, বৎস ও নরনারীগণকে আক্রমণ করাতে সকলেই মহাভয়ে আকুলিত হইয়া উঠিল। শ্রীবৎসলাঞ্ছনাঙ্কিত ভগবদ্দেহোৎপন্ন করাল শার্দ্দূলগণ স্থানে স্থানে শত পরিমিত সংখ্যানুক্রমে দলবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাভীভক্ষণ ও মাতৃক্রোড় হইতে শিশুহরণ আরম্ভ করিল। তাহাতেই সেই জনাকীর্ণ গোকুলনগর নিতান্ত ভয়স্থান হইয়া উঠিল। যে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে সেইদিকেই যেন মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ততুল্য বিকটাকার বৃকগণ করালবদন ব্যাদন করিয়া জীবকুল গ্রাস করিতে ধাবিত হইতেছে, এইপ্রকার দেখিতে পায়। মায়াময় শ্রীকৃষ্ণের এই কৌতুকময়ী বিভীষিকাপ্রভাবে, ব্রজবাসীগণের মনে এরূপ বিষম শঙ্কাকুল হইল যে, কেহই আর সাহস করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয় না। এইরূপে ব্রজবাসীগণের বনগমন, গোচারণ ও যমুনাস্নান এককালে রহিত হইল।

সমস্ত ব্রজমণ্ডলে আভীরপল্লীবাসীরা মন্ত্রণা করিল যে, ভয়ানক নখর দংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিচিত্র পিঙ্গলবর্ণ ব্যাঘ্রগণ সমূলে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার পূর্ব্বে এই বিপদসঙ্কুল স্থান পরিত্যাগ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। ঐ আমার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিল, এই আমি জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীধনে বঞ্চিত হইয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অনাথা ও বিধবা হইলাম, ঐ আমার দুগ্ধবতী

গাভীগণকে করাল ব্যাঘ্রে গ্রাস করিল, অহরহঃ প্রতি রজনীতে এইরূপ করুণার্ত্তনাদে ব্রজপুরী নিতান্ত আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, রমণীগণের অবিশ্রান্ত রোদনধ্বনিতে ও বৎসহারা গাভীগণের শোকার্ত্ত হাম্বারবে গোকুলে আর কর্ণপাত করা যায় না ; অতএব এই শ্বাপদপূর্ণ আপদাপন্ন ভীষণ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গোধনগণের সুখসেব্য এবং আমাদিগের সর্ব্ব-প্রকার শঙ্কাশূন্য নিরাপদ স্থানে বাসার্থ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হই-তেছে। ব্রজবাসীগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি হাস্যপূর্ব্বক সেই শান্তি রসাস্পদ, পরম সুখাস্পদ বৃন্দারণ্যকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, সেই রমণীয় স্থানে তোমরা স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা ও সুখাস্পদ গোধনগণ সমভিব্যাহারে নিরাপদে পরম সুখে অবস্থান করিতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশমত গোপপতি মহারাজ নন্দ নগরমধ্যে দূতগণ দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রজধাম গোকুল পরিত্যাগ করিয়া সবান্ধবে গোপ-গণকে বৃন্দাবনে যাত্রা করিতে হইবে ; অতএব হে পুরবাসীগণ ! তোমরা সত্বর সুসজ্জিত হও, শীঘ্র শকট যোজনা কর, গোগণের রজ্জুমুক্ত করিয়া দাও, আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই" গভীর সমুদ্র নির্ঘোষণ বাক্য বিনির্গত হওয়াতে ঘোষপল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুলিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ব্যাঘ্রভয় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বৃন্দাবন গমনার্থ সকলেই এককালে ব্যগ্র হইয়া উঠিল, যথানুক্রমে গমনোপযুক্ত সমস্ত আয়োজন সম্পা-দন করিয়া গোপগোপীগণ ব্যস্তসামর্থভাবে স্ব স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইল। তাহাদিগের সুবিচিত্র দীপ্তিমান শকটসমূহ দ্রুতবেগে পরিচালিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মহার্ণবহৃদয়ে দ্রুতগামিনী তরণীবৃন্দ অনুকুল মারুত হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছে।

গাভী-বৎসসমূহ নানাবর্ণে রঞ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পুচ্ছ সঞ্চালন, বিষাণ, বিকম্পন ও গ্রীবাভঙ্গী করিতে করিতে গমন করাতে বোধ হইল যেন বিচিত্র

সংএর পতাকাবলী পরিশোভিত বিবিধাকার তরণিমালা সফেন বীচিমালা সঙ্কুল জলধিস্রোত ঘূর্ণায়মান হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। পন্থাবিহারী গোপ-বৃন্দ স্কন্ধে বিলম্বিত রজ্জুদাম ধারণ করিয়া গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, পল্লবাকীর্ণ বটবৃক্ষের স্কন্ধদেশ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ শুভ্রমঞ্জরী নিম্নগামিনী হইয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। দধিপসরা ও গর্গরীশীর্ষ গোপনারীগণ কেহ শূন্য হস্তে, কেহ বা পুত্র ক্রোড়ে মরালগমনে সুচারু নূপুর শিঞ্জনে দশদিশি প্রতিশব্দিত করিয়া নানারঙ্গে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল, তাহাদের সুরঞ্জিত চাকৃচিক্যশালী টীকা পরি-শোভিত মনোহর বদনমণ্ডলগুলি যেন আকাশবিহারী নক্ষত্রমালার ন্যায় শোভাধারণ করিতেছে। নবযৌবন-দীপ্তিশালিনী সুচারুহাসিনী পীনোন্নত পয়োধরা সুন্দরী কামিনীগণের লীলাম্বর, পীতাম্বর, লোহিতাম্বর শোভা যেন বর্ষাকাল বিরাজিত ইন্দ্রধনুকে উপহাস করিতেছে। এইরূপে সশকট গোপ-গোপাঙ্গনাগণের মঙ্গলযাত্রা ও আনন্দ কোলাহলে বহুদূরব্যাপী বৃন্দারণ্যে অপূর্ব্ব শব্দ ও অপূর্ব্ব কলরবে পরিপ্লুত হইল।

এইরূপে অল্পকাল মধ্যে সেই বহুজনাকীর্ণ জনস্থান গোকুল নগর জনশূন্য হইল। ব্রজবন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমলার ন্যায় শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিল। ব্রজবাসীগণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বক গোধনগণের নির্ব্বিঘ্নে বিরামার্থে তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোপ-গোপীগণের শয়নার্থ বস্ত্রচর্ম্মাবৃত চতুষ্পদী খট্টা সকল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত সকল যথাযথ স্থানে সংস্থাপিত হইল। শিল্পচতুর গোপগণ বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখোপরি তৃণস্তবন বিস্তার করিয়া মন্থন ভাণ্ডের আবরণ প্রস্তুত করিল। নবযৌবনসম্পন্না গোপাঙ্গনাগণ গর্গরীমস্তকে সলিলানয়নার্থে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনের শোভাদর্শন করিতে লাগিলেন; নিত্য-নবলীলা-কৌতুকে গোপগোপীকাগণের আনন্দের ইয়ত্তা রহিল না।

গাভীগণ নন্দনসদৃশ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মনের আনন্দে নির্ভয়ে অজস্র-ধারে অমৃতধারার ন্যায় দুগ্ধপ্রদান করিতে লাগিল।

সর্ব্বচিত্তরঞ্জন সুকুমার শ্রীকৃষ্ণ বন-বিচরণকালে যখন গোপগণের সহিত বৃন্দাবনে সমাগত হইলেন, তখন নিদারুণ নিদাঘকাল সুখময় বৃন্দাবনকে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরে পরিতপ্ত করিতেছিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সুধাধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। যেন নবজলদ-কান্তি শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনার নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ বৎসচারণ করিয়া পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন, কালিন্দী সলিলে জলবিহার, কুঞ্জে কুঞ্জে বনবিহার এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠে গোষ্ঠবিহার করিয়া গোপালগণের সহিত দিন দিন তাঁহারা মহানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে বর্ষাকাল সমাগত, গগনমণ্ডল ইন্দ্রধনুসমলঙ্কৃত। জলধরগণ মুহুর্মুহুঃ গভীর গর্জ্জনসহকারে সুস্নিগ্ধ বারিধারা বর্ষণে ধরাতল পরিসিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। নবনীরসিক্ত ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহে বনভূমি সম্মার্জ্জিত হইয়া যেন নবযৌবনশালিনী সুন্দরী কামিনীর ন্যায় শোভাধারণ করিল, কানন মধ্যে দুঃসহ সৌরানল ও দাবানলের সম্পর্কমাত্র রহিল না।

এইরূপে দিবারাত্রি বৃষ্টি, কখন দিবস, কখন শর্ব্বরী, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, মানবগণ দিনমানকে রজনী বলিয়া অনুমান করিতেছে, বস্তুতঃ দিবা যামিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। হে কেশব! নিদাঘাবসানে জলদাগমে সেই বৃন্দাবন যেন নন্দনবন সদৃশ পরম রমণীয় বোধ হইতেছে। রোহিনীনন্দন বলরাম কমললোচন কৃষ্ণের সহিত নবব্রজে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের চিত্ত প্রীতিসম্পাদনপূর্ব্বক তদানীন্তন জ্ঞাতি গোপবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। এইরূপে তথায় তাঁহারা গোপালগণের সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ কৌতুকে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

স্বেচ্ছাবিহারী বাসুদেব একদা লতাপাদপ পরিশোভিত যমুনাকূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় সুশীতল জলকণাস্পর্শী সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে, কল্লোলিনী যমুনা তুরঙ্গরূপ অপাঙ্গ বিস্তার করিয়া বংক্কাবিকম্পনপূর্ব্বক বায়ুসহ ক্রীড়াচ্ছলে ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছেন। প্রফুল্ল—কমল—কুমুদ অপরাপর জলজ—কুসুম ও জলচর জীবকুলে যমুনা সমাকীর্ণা, স্থানে স্থানে রমণীয় তীর্থ; বর্ষাবেগ প্রভাবে তীরতরুগণ উৎপাটিত হইয়া স্রোতমধ্যে নিপতিত হইতেছে। হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষীগণের কলরবে কলিন্দনন্দিনী যমুনা নিরন্তর নিনাদিত হইতেছেন। বর্ষারম্ভে আদিত্যনন্দিনী যেন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছেন। খরতর স্রোত তাঁহার চরণ, সমুন্নত তীর ভূমি তাঁহার নিতম্ব, ঘূর্ণমান আবর্ত্ত তাঁহার নাভিপদ্ম, সলিল—বিকশিত তাঁহার রোমরাজি, তরঙ্গত্রয় তাঁহার সুললিত-ত্রিবালী, চক্রবাকযুগল তাঁহার পয়োধর, তীর পার্শ্ব সংযোগ তাঁহার প্রফুল্ল আনন ও হাস্য, রক্তোৎপল তাঁহার ওষ্ঠ, নীলোৎপল তাঁহার ভ্রূ, শতদল তাঁহার নেত্র, সুপ্রশস্ত হ্রদ তাঁহার ললাট, সুনীল শৈবাল তাঁহার কেশকলাপ, সুদীর্ঘ স্রোত তাঁহার বিস্তীর্ণ বাহু, বিকশিত কাশকুসুম তাঁহার শুভ্রবাস, শাখাপল্লবাকীর্ণ তীরতরুগণ তাঁহার অলঙ্কার, মৎস্যগণ তাঁহার খেলনা, পদ্মপত্র তাঁহার উত্তরীয়, সারসের সুস্বর তাঁহার নূপুর, নক্রকূর্ম্মাদি তাঁহার অনুলেপন এবং সুবিমল স্বচ্ছ সলিল তাঁহার স্তনদুগ্ধ।

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদ্রমোহিনী আশ্রমশোভিনী যমুনাকে নয়নগোচর করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন; তিনি সেই নদীতীরে বিচরণ করাতে শোভাময়ী সূর্য্যতনয়ার লাবণ্যমাধুরী যেন শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইল, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপ ও গোপিনীগণের সহিত নানাস্থানে নানাপ্রকার লীলাপ্রকাশ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

একদা জিঘাংসাপরায়ণ দুর্দ্দান্ত কেশীদৈত্য কংস রাজার নির্দেশানুসারে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া গোপ গোপাল ও গোধনগণের প্রাণসংহারপূর্ব্বক

তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ; সেই দুরাচার দানবের অনিবারিত উপদ্রবে বৃন্দাবন মানবাস্থিপূর্ণ হইয়া যেন শ্মশানভূমি সদৃশ বীভৎসদর্শন হইয়া উঠিল। তাহার প্রচণ্ড খুরক্ষেপে ও গতিবেগে বৃক্ষসকল ভগ্ন এবং অবস্থানস্থানের ভূমিখণ্ড বিদারিত হইতে লাগিল। ভীষণ চীৎকারে পবনগর্জ্জন পরাভূত করিয়া সেই দুরন্ততুরঙ্গ লম্ফপ্রদানে আকাশপথ অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহ প্রচণ্ড পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড কেশরজাল সপ্তপত্র পাদপের ন্যায় সমুন্নত, আক্রোশ ও জিঘাংসায় কংসের ন্যায় ভয়াবহ।

সেই দুরাত্মা প্রমত্তভাবে গোপ ও গোধনগণের জীবনবিনাশে প্রবৃত্ত হইলে, বৃন্দাবন যেন জীবসমাগম শূন্য হইয়া পড়িল। একদা সেই গোমাংস ও নরমাংসলোলুপ দুরাশয় অশ্বরূপী দানব যেন কালপ্রেরিত হইয়া সাহঙ্কারোন্মত্তভাবে ঘোষপল্লী মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গোপ গোপীগণ সেই ভীষণাকার তুরগাসুরকে দর্শন করিবামাত্র ভয়বিহ্বলচিত্তে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে স্ব স্ব পুত্রকন্যাগুলিকে বক্ষেধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইল। অরাতিনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সান্ত্বনাবাক্যে অভয়প্রদানপূর্ব্বক প্রফুল্লবদনে সেই পাপাশয় কেশীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কালপ্রেরিত কংসদূত কেশী কৃষ্ণকে পাইয়া ক্রোধবিস্ফারিতলোচনে বিকটদর্শন বিকাশপূর্ব্বক গ্রীবা উন্নত করিয়া হ্রেষারব করিতে করিতে পবনবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইল, শ্রীকৃষ্ণও তাহার আগমনপথে অগ্রবর্ত্তী হইলেন ; তাঁহাকে সেই ভীষণ অশ্বাসুরের সম্মুখীন হইতে দর্শন করিয়া সামান্যমানববুদ্ধি গোপগণ সভয় সংশয়ফুল্লচিত্তে কহিতে লাগিল, হে বৎস! নিবৃত্ত হও, ঐ দুরন্ত অশ্ব মহাপরাক্রান্ত, তুরঙ্গদল মধ্যে উহার তুল্য হিংস্র ও বলবান আর দ্বিতীয় নাই, কেহই উহাকে দমন করিতে সমর্থ নহে। তুমি বালক, কদাচ উহাকে পরাভব করিতে পারিবে না, ঐ দুর্দ্দান্ত তুরগাধম দুরাচার নৃপাধম কংসের সহোদরতুল্য প্রিয়তম সহচর, উহাকে বিনাশ করা কাহারও

সাধ্যায়ত্ত নহে। সর্ব্বদর্পহারী মধুসূদন মানবস্নেহে কাতর গোপগণের তাদৃশ সভয়বাক্য শ্রবণে মনে মনে মৃদুহাস্য করিয়া অবলীলাক্রমে সেই দুর্জ্জয় অসুরকে যুগল হস্তদ্বারা তাহার মস্তক অবধি সর্ব্বশরীর দ্বিধা করিয়া সংহার করিলেন। তখন দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কেশীদৈত্যকে বধ করিলে বৃন্দাবনে সকলেই নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইলেন, গোপরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা-দর্শনে বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে যেস্থানে কেশীদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন সেই অবধি ঐ স্থান কেশীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাপমতি দুর্জ্জয়কেশী শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শে গতিলাভ করিয়াছিল, এই নিমিত্ত কেশীঘাটে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক স্নানদান করিলে পরম গতিলাভ হয়। এই ঘাটেই যমুনাদেবীর অর্চ্চনা করিতে হয়।

বৃন্দাবন তীর্থদর্শন যাত্রা।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাইতে হইলে, রেলযোগে গমন করিলে খরচার সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু যাহাদের গাড়ী ভিন্ন যাওয়া হইবে না তাহাদের বৃথা এগাড়ী ওগাড়ীতে লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া মথুরা হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে যাত্রাই শ্রেয়ঃ। মুটে খরচ ও গাড়ীভাড়া একত্রে হিসাব করিলে প্রায় একই পড়ে। মথুরা হইতে বৃন্দাবন সাত মাইল ব্যবধান মাত্র। পাকা প্রশস্ত বাঁধারাস্তা আছে, বৃন্দাবন গেট নামক যে

ফটক আছে উহারই মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মথুরা হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবন প্রবেশকালে অর্থাৎ যেস্থান বৃন্দাবন গেট বলিয়া বিখ্যাত ঐ স্থানেই গোকর্ণ মহাদেব বিরাজমান। গোকর্ণ ত্রিলোক বিখ্যাত তীর্থ। ইহা বিশ্বনাথ বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়স্থান।

পথিমধ্যে যমুনাতীরে ও নগরের কত লীলাখেলাই দেখিতে পাইবেন। হাটাপথে বা গাড়ীতে যাইলে এইটুকুই লাভ বলিয়া জানিবেন। শ্রীধামে পৌছিলে প্রথমেই মথুরা অতিক্রম করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে যত অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ তৃষিত চাতকের ন্যায় যাত্রীদিগের আশাপথ চাহিয়া থাকেন। যাত্রীগণ শ্রীধামে পৌছিলেই কিয়ৎক্ষণের জন্য মহা গোলযোগ পড়িয়া যায়। ব্রজবাসী (পাণ্ডা)গণ যাত্রীদিগকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করেন। শ্রাবণমাসের বারিধারার ন্যায় "আপনার বাড়ী কোন্ জিলা? নিবাস কোথায়? ব্রজবাসী কে?" কোন জাতি? পদবী কি? ইত্যাদি" অবশেষে যাত্রীগণ, আপনাপন ব্রজবাসী মনোনীত করিয়া লন।

এই ব্রজবাসী (তীর্থগুরুর) নিকট যাত্রীগণকে পুত্তলিবৎ ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনের লীলাসকল দর্শন করিতে হয়। তাঁহারা যাহা দেখান তাহাই দেখিতে পাইবেন, যাহা না দেখাইবেন উহা কিরূপে দেখিতে পাইবেন কিন্তু এই পুস্তকখানি নিকটে থাকিলে প্রাচীন লীলাস্থলী ও মন্দিরাদি কোন্ স্থানে কিরূপ দর্শন করিলে সমস্ত দর্শন ঘটাবে এবং ঐ সকল দেবালয় কত দিন প্রকটিত হইয়াছে ও কোন মহাত্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির, পরে জগৎবিখ্যাত শেটজীর মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে। এই সকল মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে ব্রজবাসী ভিক্ষুকগণের সুললিত মধুর গানে যাত্রীদিগকে এই স্থানই যে বৃন্দাবন উহা অবগত করাইবে।

কোন ভিক্ষুক এই গানটী শুনাইবে ;—

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।
মৃদু মৃদু বংশী বাজে এই সেই বৃন্দাবন॥

কেহ বা ভূমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গাহিতে থাকিবে ;—

ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপীপদ রেনু।
এই ধুলা মেখেছিল, নন্দ বেটা কেনু।

কেহবা জয়রাধে শ্রীরাধে, কেহ বা রাধাশ্যাম রবে মন মাতুয়ারাস্বরে ভিক্ষা করিতেছে, কেহবা খোল করতাল লইয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া ব্রজরজে বিলুণ্ঠিত হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতেছে, আহা! সেই প্রেমময় চিত্ত সকল দর্শন করিলেও ভক্তির উদয় হয়। এইরূপ নানাছলে নানাপ্রকার ভিক্ষার্থী আসিয়া চতুর্দ্দিক্‌ বেষ্টন পূর্ব্বক গাহিতে থাকিবে।

ভক্তবৃন্দ আসি, কহে হাসি হাসি।
গয়া কাশী ছোড়কে, সবে হব বৃন্দাবনবাসী॥

যখন এইরূপ ভক্তি রসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে পশিবে, তথনই জানিবেন যে, এইস্থানই বৃন্দাবনধাম। যে ধাম দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া পিতা, মাতা পুত্র কন্যা ও সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া কত অর্থ কত কষ্ট সহ্য করিয়া, কত বন, উপবন, পর্ব্বত উলঙ্ঘনপূর্ব্বক সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া, দয়াময়ের কৃপায় আজ সেই ব্রজধামে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইলেন কোন বিষয় ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, এক্ষণে যুগলমূর্ত্তির শ্রীচরণ দর্শনে সেই মহাব্রত উজ্জাপন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করুণ।

বৃন্দাবনধাম বৈষ্ণবদিগের একটী পবিত্র মহাতীর্থস্থান এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। যমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজমান, তন্মধ্যে শেঠজীর স্বর্ণ তালবৃক্ষযুক্ত দেবালয়. গিরিগোবর্দ্ধন, লালাবাবুর মন্দির, গোবিন্দ জীর মন্দির, মদনমোহনের, গোপীনাথের, সাহাজীর মন্দির, ব্রহ্মচারীর মন্দির

এবং নিকুঞ্জকানন এই সকল একান্ত দর্শন যোগ্য। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও অনেক মন্দির ও দেবালয় সকল বর্ত্তমান আছে। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদিগের মান্য অধিক হইয়া থাকে এবং প্রায়ই তাহারা জীবনের শেষভাগ এই তীর্থ স্থানে বাস করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গৌরবান্বিত হন।

শ্রীবৃন্দাবনধামে—যমুনা ও বৃন্দাবন এই দুই স্থানে ভগবদ-লীলার প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। ভক্তগণ যাহা দর্শন করিয়া জন্ম সফল জ্ঞান করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দনের বৃন্দাবন কতই না প্রিয় ছিল, এখানে ময়ূর ময়ূরীগণ শিখিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয়া স্বভাব সুলভ কেওয়া কেওয়াস্বরে প্রতিধ্বনিত করিয়া শ্রীরাধামাধবের গুণগানে মত্ত হইয়া তালে তালে নৃত্য করে, ভ্রমর ভ্রমরী গুণ্ গুণ্ স্বরে গুঞ্জন করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের যশোগুণগান করিতে করিতে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের মধুপান করিয়া কৃতার্থ হয়।

শ্রীমতী যমুনাদেবী—বংশীবদনের মনপ্রাণ মাতোয়ারা সুমধুর বংশীবাদনে উত্তাল তরঙ্গমালা উত্থিত করিয়া প্রেমময়ের প্রেমে গদগদ হইয়া স্বীয় গন্তব্যপথ পূর্ব্বদিক ভুলিয়া পশ্চিমদিকে ধাবিত হইতেন, ব্রজবাসীগণ যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ফণীর ন্যায় মুগ্ধ হইয়া ঐ বংশীর তাল লহরী শুনিয়া কত সুখ অনুভব করিতেন, ব্রজঙ্গনাগণ ব্রজেশ্বর ও ব্রজেশ্বরীর কেলীক্রীড়ার স্থানে উন্মত্ত হইয়া দর্শন করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বামে বিদ্যুল্লতারূপিণী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণীর সম্মিলন দেখিয়া অচৈতন্য অবস্থায় নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতেন। গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শুনিয়া হাম্বারবে উর্দ্ধে পুচ্ছ তুলিয়া বনের দিকে ধাবিত হইত সেই বৃন্দাবন কিরূপ রমণীয় স্থান, একবার হৃদয়ঙ্গম করিলে সমস্তই বুঝিতে পারা যায়।

এই ধামে বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য কত :—

সদাচার ত্রিভুবনে দেখ পূর্ব্বাপার।
বৈষ্ণব সেবা মাত্র ব্রত সবাকার॥

বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাদোদক পদরজ।
উল্লাস করিয়া সেব ত্যজ বৃথা লাজ।
যাহার মহিমা বলে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
প্রত্যক্ষ দেখহ তার প্রভার মহত্ত্ব॥
বৈষ্ণবের অধরামৃত যেই নাহি খায়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে বহু সংসার না যায়॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী মতে আর সকাম বিধানে।
ফিরিয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মর্ম্ম নাহি জানে॥
লোকাচার দেখ নারী বালবৃদ্ধ যুবা।
বৈষ্ণবের স্থানে কুণ্ঠ কিবা দেবীদেবা॥
দান প্রজা সেবার স্থলে সবার বচন।
বৈষ্ণবের করবলি সবার বটন॥
অদ্যাপিহ তার পূর্ব্বাবস্থা সবে জানে।
তথাপি নমস্কারি ঠাকুরাণী ভনে॥
ধর্ম্মজ্ঞান মিথিলাতে ব্যাভিচারী হয়।
শুদ্ধ ভক্ত নহে সেই কৃষ্ণ পায়॥
অতএব শুদ্ধ ভক্ত হয় মহাবাধ্য।
সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্ত্তি শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ॥
এই জ্ঞান কভু বিনা চারি সম্প্রদায়।
কদাচ না হয় কুঞ্জে শৌচ প্রায়।
সম্প্রদা বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে।
নিষ্ফল তাহার সব ভক্তি নাহি স্ফরে॥

বৃন্দাবনে ব্রহ্মমোহন কুণ্ড, নিধুবন, অঘাসুর নির্ব্বাণ প্রভৃতি অনেকগুলি তীর্থ বিরাজিত। বৃন্দাবন নিত্যধাম ব্রহ্মাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেবগণেরও পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পরমানন্দময়। পৃথিবীতলে বৃন্দাবনই

পূর্ণধাম বলিয়া জ্ঞান করিবেন। এখানে পাঁচ সহস্রের অধিক দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে সাতটি দেবালয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ যথা শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্যাম সুন্দর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীরাধা দামোদর এই সাতটি দেবালয়ই গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ।

এখানে জয়পুর, সিন্ধিয়া হুলকার এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহারাজাদের এবং অন্যান্য অনেক জমিদারদিগের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্থাপিত আছে।

বৃন্দাবনে যাত্রীদিগকে পৃথক বাসা ভাড়া দিতে হয় না। যাহাকে তীর্থগুরু মান্য করা যায় তিনিই বাসা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধ্যানুসারে একটী ভেট ও ১/০ সতন্ত্র বৃন্দাপূজার নিমিত্ত দিতে হয়। ভেটের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। আট আনা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ভেট আছে উহা যাত্রীদিগের ইচ্ছা বা সাধ্যানুযায়ী করিবেন, তবে নিয়ম এই যে যিনি এক দেবালয়ে যেরূপ ভেট করিবেন, তাহাকে সেইরূপই ছয় স্থানে ভেট দিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্যামসুন্দর, কুঞ্জবাসী, (যাহার কুঞ্জে থাকা হইবে) যমুনাদেবী এবং গুরুর পাঠ এই ছয় স্থানে সমানভাবে ভেট করিতে হইবে এবং শ্রীরাধারমণ, শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীরাধা দামোদরের দেবালয়ে এক আনা ভেট দিয়া দর্শন করিতে হয়। যমুনাদেবীকে যে ভেট দিবেন উহা তীর্থগুরু (ব্রজবাসীর) প্রাপ্ত। যমুনা পূজার সময় যে সকল দ্রব্য আবশ্যক মায় দক্ষিণা উহা সমস্তই তীর্থ গুরু দিবেন আপনাদের নিকট যে একটী ভেট লইবেন ঐ মূল্য হইতে ; আর তীর্থ সমাপনান্তে সুফলের জন্য যাহা দান করিবেন উহাও পাণ্ডার প্রাপ্ত এই দুইটী তীর্থগুরুর প্রাপ্য, বাকি সমস্ত যাহা দান করিবেন উহা পৃথক্ পৃথক্ দেবালয়ে জমা হইবে। এইধামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে,

কোথায় গুরুরপাট উহা উত্তমরূপে অবগত হইয়া যাইবেন নচেৎ তথায় কষ্ট পাইতে হইবে। দেবালয়ে ভেট করিবার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভেট দিবেন ও দেবতাদিগকে দর্শন করিবেন। কাহারও মারফতে ভেট পাঠাইবেন না তাহা হইলে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ মনে করুণ, আপনি কাহার ও মারফতে ভেট পাঠাইয়া দিয়াছেন পরে পুনরায় যত্মপি দিতে হয়, তাহা হইলে হয়ত রাগান্বিত হইয়া দুএকটী ককথা বলিতে পারেন, ইহাতেই কুফল ফলিতে পারে; কেননা তীর্থস্থানে কাহারও সহিত কলহ বা কাহারও মনে কষ্ট দিতে নাই ইহাই তীর্থ নিয়ম। গুরুর পাটে ভেট দিবার সময় উত্তমরূপে জানিয়া শুনিয়া ভেট করিবেন, এখানে অনেক স্থানের অনেক গুরুর পাঠ আছে, সকলেই স্বীয় পাটে জমা লইবার চেষ্টা করেন। এখানে ভক্তগণ শ্রীরাধা গোবিন্দজীকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমেই শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করিবেন।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তীর্থপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে কেশীঘাটে স্নান করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কেশীনামক দুর্জ্জয় দৈত্যকে এই স্থানে বধ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই ঘাটের নাম কেশীঘাট হইয়াছে। এই কেশীঘাটে যমুনাদেবীর উদ্দেশে সঙ্কল্প করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়। এই কেশীঘাটে স্নান দান করিলে গঙ্গাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। পরে গোবিন্দঘাট, ভ্রমরঘাট, চিড়ঘাট, যমুনাপুলিন ইত্যাদি পর পর চব্বিশটী ঘাটে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্নান বা জলস্পর্শ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়, তৎপরে শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরাধারাণীদেবীকে ভক্তি-সহকারে প্রণামকরতঃ ব্রজরজে লুটিপাটি করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিবেন এবং সাধ্যমত হরিরলুট দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবেন। এই-রূপে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন রাধাদামোদর ও শ্যামসুন্দরের দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া অভিলাষিত প্রার্থনা ভিক্ষা লইবেন। অনন্তর কেশবজী, গোকুলেশ্বর, বৃন্দাদেবী প্রভৃতি যথাশক্তি অর্চ্চনা-

পূর্ব্বক দর্শন করিবেন। তৎপরে ব্রহ্মমোহন কুণ্ডাদিতে স্নান ও তর্পণ করিবেন।

এখানে বৃন্দাবন, গোকুল, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধনগিরি ইত্যাদিকে ব্রজমণ্ডল বলে। ইহার পরিমাণ চৌরাশী ক্রোশ হইবে, সকল যাত্রী ইহা প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। কেবলমাত্র পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনধাম প্রদক্ষিণ করিলে, সমস্ত ব্রজমণ্ডলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বৃন্দাবন তীর্থ যাত্রীগণের কর্ত্তব্যজ্ঞান করিয়া এই পঞ্চক্রোশী পরিভ্রমণ করিবেন। এই পঞ্চক্রোশী প্রদক্ষিণকালে তরুতলা বেষ্টিত, বিহঙ্গকূলকূজিত, মনোহর কুঞ্জ সকল দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন এবং নির্ম্মল সলিলপূর্ণ পবিত্র সরোবরে অবগাহন করিয়া কত সুখ অনুভব করিবেন। ময়ূর ময়ূরীগণের নৃত্য, নিরীহ মৃগকুলের কেলীসহ আশ্চর্য্যগতি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইবেন ও ব্রজমণ্ডলের নানাপ্রকার শোভাসন্দর্শন করিয়া অশেষ ক্লান্তিসুখ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। যদ্যপি কাহারও দলমধ্যে বৃদ্ধ বা অসমর্থ লোক থাকে তাহা হইলে বৃন্দাবন হইতে ডুলি ভাড়া করিয়া সঙ্গে নিযুক্ত করিবেন পঞ্চক্রোশীর জন্য একখানা ডুলির ভাড়া ।/০ আনা হইতে ।৵০ ছয় আনা মাত্র। প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্বীয় ব্রজবাসী পাণ্ডার নিকট হইতে একটী ব্রাহ্মণ বারঘাটের সঙ্কল্প করিবার জন্য লইবেন তিনি সঙ্গে থাকিলে সমস্ত পথ ও বার ঘাটের সঙ্কল্পের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন। এই শুভযাত্রা করিবার পূর্ব্বে বারটী পয়সা বারটী পৈতা ও বারটী সুপারি সঙ্গে লইবেন।

বৃন্দাবনে বাজারের সময়। এখানে যতগুলি বাজার আছে তন্মধ্যে গোবিন্দবাজারটীই বৃহৎ। এই বাজারে সকলপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়, প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত বাজার থাকে তাহার পর বাজারে আর কোন তরীতরকারী পাওয়া যায় না, অবগত হইলাম এই ব্রজমণ্ডলে প্রায় পচিশ হাজার লোকের বাস আছে।

লীলাময়ের লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার। ভাবুক যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে চান, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকেন। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপই তাহাকে পরিচালনা করেন। প্রমাণস্বরূপ দেখিবেন যে, কেহ ভক্তিভরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ভক্তিরসে রোদন করিতেছেন, কেহ জলে ও স্থলে বানর ও কচ্ছপদিগকে লইয়া কত আমোদ অনুভব করিতেছেন, কেহ বা গাঁজায় টিপ্পী দিয়া অসতী যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা খোল করতাল ও নিশান তুলিয়া হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন, আবার কেহ বা নরম ছোলা ভাজার আস্বাদে বিভোর হইয়া তাহারই গুণগান করিতেছেন। দয়াময় কৃপা করি সুমতি প্রদান করুণ, যেন দুষ্টমতি লোকের কুচক্রে মিলিতে না মতি হয় এবং আপনার মহামহিমান্বিত পবিত্র নামে কলঙ্ক না করিতে বাসনা হয়। হায়! এই পবিত্র স্থানে যাহা দেখিলাম উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির।

এই মন্দির নগরের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এমন কি দিল্লী নগর হইতে ইহার চূড়া দেখা যাইত, ইহার শিল্পকার্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এই নিমিত্ত হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের শিখরদেশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরের পশ্চিম দিকে গলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তথায় তিনি শ্রীমতী রাধিকা সহ বিরাজ করিতেছেন। গোবিন্দজী বনমধ্যে লুক্কাইত ছিলেন। গাভীসকল প্রত্যহ হৃষ্টচিত্তে যাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া আসিত পরিশেষ রূপসনাতন স্বপ্নে অবগত হইয়া ঠাকুর বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

[৯৭ পৃষ্ঠা]

লীলাময়ের লীলা বোঝা কঠিন ব্যাপার। ভাবুক যে ভাবে তাঁহাকে দর্শন করিতে চান, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকেন। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তিনি সেইরূপই তাহাকে পরিচালনা করেন। প্রমাণস্বরূপ দেখিবেন যে, কেহ ভক্তিভরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ভক্তিরসে রোদন করিতেছেন, কেহ জলে ও স্থলে বানর ও কচ্ছপদিগকে লইয়া কত আমোদ অনুভব করিতেছেন, কেহ বা গাঁজায় টিপ্পী দিয়া অসতী যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতেছেন, কেহ বা খোল করতাল ও নিশান তুলিয়া হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছেন, আবার কেহ বা নর- ছোলা ভাজার আস্বাদে বিভোর হইয়া তাঁহারই গুণগান করিতেছেন। দয়াময় কৃপা করি সুমতি প্রদান করুন, যেন দুষ্টমতি লোকের কুচক্রে মিলিতে না মতি হয় এবং আপনার মহামহিমান্বিত পবিত্র নামে কলঙ্ক না করিতে বাসনা হয়। হায়! এই পবিত্র স্থানে যাহা দেখিলাম উহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির।

এই মন্দির নগরের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এমন কি দিল্লী নগর হইতে ইহার চূড়া দেখা যাইত, ইহার শিল্পকার্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এই নিমিত্ত হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের শিখরদেশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে শ্রীগোবিন্দজী এই মন্দিরের পশ্চিম দিকে গলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তথায় তিনি শ্রীমতী রাধিকা সহ বিরাজ করিতেছেন। গোবিন্দজী বনমধ্যে লুক্কাইত ছিলেন। গাভীসকল প্রত্যহ স্বচ্ছচিত্তে যাইয়া দুগ্ধ খাওয়াইয়া আসিত পরিশেষে রূপসনাতন অবগত হইয়া ঠাকুর বাহির করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের শেঠজীর মন্দিরের দৃশ্য।

[৯৭ পৃষ্ঠা]

রূপ ও সনাতন দুই ভাই। পূর্ব্বে মুসলমান বাদশার নিকট কর্ম্ম করিতেন, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রূপগোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনের মধ্যে ইহাদের সমাজ বৃহৎ ও বিখ্যাত। সমাজের নিকট তেঁতুলতলায় অদ্যাপি শ্রীচৈতন্যদেবের পদচিহ্ন দর্শন করিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে রূপ নবাব সরকারে কর্ম্ম করিতেন, একদা বর্ষাকালের অন্ধকার রজনীতে নবাব তাহাকে তলপ করেন, সেই অন্ধকারে জলে ও কাদায় অতিকষ্টে যখন তিনি নবাবের নিকট গমন করিতেছিলেন ঠিক্ সেই সময় এক হীনজাতীয় চণ্ডাল কুটীরমধ্যে তাহার গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে জলে ভিজে কে যাইতেছে বলদেখি? তদুত্তরে চণ্ডালনী বলিল তোমার কিরূপ অনুমান হয়? চণ্ডাল বলিল আমার বোধহয় একটী কুকুর যাইতেছে। চণ্ডালনী বলিল, কখনই নয় এ নিশ্চয় কাহারও চাকর হইবে, নচেৎ এ দুর্য্যোগে অন্য কেহ হইতে পারে না; কারণ একটী সামান্য জীব, যাহাকে সকলে কুকুর বলে, তাহারও স্বাধীনতা আছে, তাহারা ইচ্ছামত অনেক কাজ করিতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য চাকরের ভাগ্যে তা হইবার যোটী নাই। রূপ তাহাদের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আপনাকে ধিক্কার দিয়া এবং নিজেকে কুকুরের অধম জানিয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণব হন ও ক্রমে রূপগোস্বামী উপাধি প্রাপ্ত হন।

শেঠের মন্দির।

স্বনাম ধন্য লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দির ১২৬৩ সালে নির্ম্মাণ করাইয়াছেন মন্দিরের দেয়ালে এইরূপ খোদিত আছে, এই মন্দিরের শোভা দেখিবার উপযুক্ত। মন্দির অভ্যন্তরে শেঠজীর স্থাপিত শ্রীরঙ্গজী বিরাজ করিতেছেন ও স্বর্ণের বৃহৎ একটী স্তম্ভ আছে যাহাকে সাধারণে

সোনার তালগাছ বলিয়া থাকেন কিন্তু বারম্বার পরীক্ষা করিয়াও ইহার কেন তালগাছ নাম হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইই মন্দিরের চতুস্পার্শে দুর্গের ন্যায় সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর আছে এবং মাধ্য একটী সুন্দর পাথর দ্বারা বাঁধান পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণীতে সময়মত শ্রীবিগ্রহ-দেবের লীলা হইয়া থাকে। এই ধামে সকল দেবালয়ের মধ্যে ইহাই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুশোভিত।

ব্রহ্মচারীর মন্দির।

এই মন্দির গোয়ালিয়ারের মহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়াদিয়াছেন। ইহার মধ্যে ব্রহ্মচারীর স্থাপিত শ্রীরাধাগোপাল, হংসগোপাল, এবং নৃত্যগোপাল বিরাজমান আছেন। মন্দিরের কারুকার্য্য সকল দর্শনে মহিত হইতে হয়, ইহা কত পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু দেখিলেই নূতন বলিয়া অনুমান হয়।

লালাবাবুর মন্দির।

প্রাতস্মরণীয় পরম ভগবত স্বর্গীয় লালাবাবু এই মহাত্মার প্রকৃত নাম ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ইং ১৮১০ খৃঃ এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবকে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনধন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলে নয়ন চরিতার্থ হয়। এই মহাত্মা একদা এক মেছুনীর বাক্যে সংসার ত্যাগ করিয়া দানশালা, অতিথশালা ও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের শেষভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন কথিত আছে, একদা এক মেছুনী তাঁহার বাটীতে মৎস্য বিক্রয় করিতে আসিয়া বলিল, "হরিহে পার কর, সময় বয়ে যায়" এই সার বাক্য তিনি চিন্তা করিলেন,

আমারও ত সময় বয়ে যাইতেছে, পর পারের নিমিত্ত আমিও ত কিছুই করি নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণাপন্ন হইলেন।

শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দির।

এই মন্দির মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিলে আনন্দে অধির হইবেন, ইনি গোপীদিগের কর্ত্তা ছিলেন এই নিমিত্ত গোপীনাথ নাম হইয়াছে। এই শ্রীমূর্ত্তি গোবিন্দ ও মদনমোহনের শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা দেখিতে ছোট।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রতিদিন মথুরায় ভিক্ষা করিতে যাইতেন। সেইস্থানে কোন চোবের বাটীতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হন। কুব্জাদেবী এই মূর্ত্তিরে পূজা করিতেন, মথুরাধ্বংশ হইলে এই শ্রীমূর্ত্তিও অদৃশ্য হয়। ভাগ্যবান সনাতন গোঁসাইকে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় প্রভুকে পাইয়া নিজালয়ে আনায়নপূর্ব্বক পুরাতন মন্দিরের নিকট প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, রামদাস নামক জনৈক বনিক নৌকাযোগে এইস্থানের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, হটাৎ তাহার নৌকা মদনমোহনজীউর মন্দিরের সম্মুখে বাধিয়া যায়। রামদাস দু তিনদিন বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না তখন হতাশ হইয়া গোস্বামীজীর স্মরণ লন। বনিকের করুণ বিলাপে এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার সরল [illegible] দয়ার সঞ্চার হইল, তখন তিনি বনিককে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি নৌকায়

যাইলেই প্রভুর কৃপায় সহজেই নৌকা চালিত হইবে।" তদন্তর তাঁহার আদেশমত বনিক নৌকায় উঠিয়া দেখিলেন যে যথার্থই নৌকা মুক্ত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বনিক সেই স্থানে মানত করিলেন যে, যদি আমার ব্যবসায় বিস্তর লাভ হয় এবং নির্ব্বিঘ্নে বাটী প্রত্যাগমন করিতে পারি তাহা হইলে আমি নিজ ব্যয়ে প্রভুর একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিব। দয়াময়ের কৃপায় বনিকের কোন কিছুরই অভাব ঘটে নাই। আজকাল যে মন্দির দেখা যায় উহা এই রামদাসের নির্ম্মিত।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির।

এই মন্দির শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ নয়নানন্দ দায়ক নবজলধর শ্রীশ্যামসুন্দর ও পার্শ্বে স্থিরা সৌদামিনী শ্রীরাধিকাদেবী একত্র দর্শন করিতে /০ এক আনা ভেট দিতে হয়। এমন মূর্ত্তি বৃন্দাবনধাম মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাহাজীর মন্দির।

এই মন্দির অতি মনোহর ও নানাবিধ শ্বেত, কৃষ্ণ মারবেল পাথরের উপর কারুকার্য্য খচিত, বস্তুত ইহার শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয় এখানে নানাপ্রকার ফোয়ারা সংযুক্ত করিয়া এই দেবালয়ের শোভা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিলে নয়ন চরিতার্থ হইবে।

শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর দেবালয়

বা

অদ্ভুত সালগ্রামশিলা।

এই মূর্ত্তি পূর্ব্বে শালগ্রাম মূর্ত্তিতেই ছিলেন, অবগত হইলাম কোন ধনাঢ্য জমিদার শ্রীধামে আসিয়া বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহ মূর্ত্তিকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন, এই দেবালয়েও সেইরূপ দিয়াছিলেন কিন্তু সেবাএত গোস্বামী মহাশয় ঐ সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে অত্যান্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! আমি এই সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া কি করিব। আজ যদি আমার ইষ্টদেব হস্তপদ বিশিষ্ট হইতেন তাহা হইলে এই সমস্ত অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া আমি কতই আনন্দ অনুভব করিতাম ভক্তবৎসল ভক্তের আন্তরিক দুঃখ অবগত হইয়া, ইহা দূরীকরণার্থ ঐ শিলা হইতেই দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আহা! ভক্তাধীন তুমি ভক্তের আশাপূর্ণ করিবার জন্য সকলই করিতে পার! এই শ্রীরাধারমণ মূর্ত্তি এবং পূর্ব্বঘটনা সকল অবগত হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। এই মন্দির শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের স্থাপিত। ইহার পশ্চাতে শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামীদিগের সমাজ আছে। মহাত্মাদিগের সমাজস্থল দর্শন করিলেও পুণ্য হয়।

শ্রীবঙ্কবিহারীর মন্দির।

এই মন্দির হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে যে কিরূপ আনন্দ হয় তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

সেবা কুঞ্জ।

এই কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন। রাত্রি-কালে এখানে জন মানুষ থাকিতে নিষেধ আছে, এই নিমিত্ত কেহ রাত্রিকালে এখানে থাকিতে পান না। ব্রজবাসীগণ কতকগুলি লীলাচিহ্ন ইহার মধ্যে দেখাইয়া থাকেন।

শ্রীনিধুবন।

পূর্ব্বে এই বন অত্যান্ত নিবিড় ও সুদৃশ্য ছিল, এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীসুন্দরীগণ সহ গুপ্তভাবে এইস্থানে বিহার করিতেন। এখানে সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটীও বানরকে দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রভাত হইতে না হইতে ইহাদের সমাগম হয়! এই নিধুবনে অনেক নুড়ি ইষ্টক পতিত থাকে, কথিত আছে ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যেরূপ প্রকারে এই পতিত ইষ্টকদ্বারা এখানে বাটী নির্ম্মাণ করেন, রাধারাণীর কৃপায় তিনি সেইরূপই বাটী প্রাপ্ত হন। আরও শ্রুত আছে যে এক কাক (পক্ষি বিশেষ) রাত্রিকালে এই বনে চিৎকার করিয়া শ্রীরাধার নিদ্রাসুখে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়া রাধারাণী বায়সকুলকে বৃন্দাবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন এই নিমিত্ত বৃন্দাবনে একটীও কাককে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যমুনা পুলিন।

এইস্থানে শ্রীনন্দদুলাল গোপীবালাগণকে লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ঐ রজস্তুপ মস্তকে লেপন করিলে সকল পাপ হইতে পরি-ত্রাণ পাওয়া যায় এই বৃন্দাবনধামে যে সমস্ত মন্দির ও দেবালয় বর্ত্তমান আছে উহার এক একটী বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়।

সেবা কুঞ্জ।

এই কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ রাধাসহ সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে এখানে জন মানুষ থাকিতে নিষেধ আছে, এই নিমিত্ত কেহ রাত্রিকালে এখানে থাকিতে পান না। ব্রজবাসীগণ কতকগুলি লীলাচিহ্ন ইহার মধ্যে দেখাইয়া থাকেন।

শ্রীনিধুবন।

পূর্ব্বে এই বন অত্যান্ত নিবিড় ও সুদৃশ্য ছিল, এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সীমন্তিনীগণ সহ গুপ্তভাবে এইস্থানে বিহার করিতেন। এখানে সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটীও বানরকে দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রভাত হইতে না হইতে ইহাদের সমাগম হয়।" এই নিধুবনে অনেক কুড়ি ইষ্টক পতিত থাকে, কথিত আছে ভক্তিপূর্ব্বক যিনি যেরূপ প্রকারে এই পতিত ইষ্টকদ্বারা এখানে বাটী নির্ম্মাণ করেন রাধারাণীর কৃপায় তিনি সেইরূপই বাটী প্রাপ্ত হন। আরও শ্রুত আছে যে এক কাক (পক্ষি বিশেষ) রাত্রিকালে এই বনে চিৎকার করিয়া শ্রীরাধার নিদ্রাসুখে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়া রাধারাণী বায়সকুলকে বৃন্দাবন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন এই নিমিত্ত বৃন্দাবনে একটীও কাককে দেখিতে পাওয়া যায় না।

যমুনা পুলিন।

এইস্থানে শ্রীনন্দদুলাল গোপীবালাগণকে লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ঐ রজস্তূপ মস্তকে লেপন করিলে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এই বৃন্দাবনধামে যে সমস্ত মন্দির ও দেবালয় বর্ত্তমান আছে উহার এক একটী বর্ণনা করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়।

যমুনা পুলিনে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী ১০২ পৃঃ

শ্রীশ্রীগোপেশ্বর দেবের মন্দির।

৺গোপেশ্বর মহাদেব বৃন্দাবনের জাগ্রত দেবতা। এখানে আসিলে এই মহাদেবকে দর্শন একান্ত আবশ্যক, কেননা তাঁহার অর্চ্চনা না করিলে, বৃন্দাবন তীর্থ-দর্শনের সমস্ত ফল তিনি হরণ করিয়া থাকেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদিগের সহিত যখন রাসে মত্ত ছিলেন, সেই সময় তথায় কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না। বিশ্বেশ্বরের ঐ রাসলীলা দর্শনের একান্ত বাসনা হইল, তিনি মায়াপ্রভাবে স্বয়ং গোপনারী বেশ ধারণ করিয়া ঐ মহারাস খেলা দেখিতে যান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়া অবগত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে এই নারীমূর্ত্তিকে হে গোপেশ্বর! বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই অবধি মহাদেব এই ধামে গোপেশ্বর নামে অবস্থান করিতেছেন। রাসের সময় ইনি এখানে গোপীরূপ ধারণ করেন।

বেলবন।

কেশীঘাটের পরপারে কিয়ৎদূরে প্রায় এক মাইল পথে অবস্থিত। এই বন বহুসংখ্যক বিল্ববৃক্ষে শোভিত, লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে রাসলীলা করেন, তখন একমাত্র মাধুর্য্যরসের অধিকারিণী গোপবালা সকলেই তথায় গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তথায় যাইতে না পারিয়া বিষাদ মনে এই বনে অদ্যাপিও তপস্যা করিতেছেন। এই বন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে চাউল, সিন্দুর, লোহা, আলতা প্রভৃতি শুক্ল পুষ্পের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে হয়।

কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যখন মহারাসলীলা করেন, তখন বৃন্দা-দেবী শ্রীরাধার দূতীরূপে নিযুক্ত হইয়া শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ঘটান, এই কারণবশতঃ শ্রীরাধিকা মান করেন, ঐ মানভঞ্জন করিবার নিমিত্ত

শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এমন কি শ্রীরাধার পদধারণ ও তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইয়া সেই মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ মনদুঃখে প্রিয়সখি বৃন্দাদেবীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাদ প্রদান করেন যে তুমি শ্রীরাধার নিকট আমায় যেরূপ অপদস্থ করিলে তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমার ইচ্ছানুসারে তোমায় সর্ব্বস্থানে অবস্থান করিতে হইবে এবং তুলসীবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইতে হইবে। আরও কুকুর তোমার মহিমা অগবত না হইয়া তোমার উপর প্রস্রাব করিবে। এই নমিত্ত একটী প্রবাদ আছে ;—

হেঙ্গল মানে না তুলসী বন।
ঠ্যাঙ্গ তুলে মুত্তোই মন॥

বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া মনদুঃখে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিদানস্বরূপ অভিসম্পাদ দিলেন যে তোমায় শীলারূপ হইয়া শালগ্রাম নামে নারায়ণমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। মানবগণ ঐ শালগ্রাম-শীলা মূর্ত্তি পূজা করিবে এবং তুলসীপত্র ব্যতিরেকে তুমি সুশ্রী হইতে পারিবে না।" বৃন্দাদেবী মনদুঃখে শ্রীকৃষ্ণকে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা চরণ দুখানি হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া তাঁহারই ধ্যানে রত হইলেন।

বৃন্দাদেবীর স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভিলাষিত "বর" প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বৃন্দাদেবী সুযোগ পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি রোষভরে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়া গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি, অবশেষ নানাপ্রকার চিন্তার পর স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু! যদ্যপি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া এই বর প্রদান করুণ যেন আমার তুলসী পত্র ব্যতিরেকে আপনার পূজা না হয়" তাহা হইলে আমি সদাসর্ব্বদা শ্রীচরণে স্থানপ্রাপ্ত হইব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া বৃন্দাদেবীর সকল আশাই পূর্ণ করি-

লেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ প্রসাদে তুলসীদেবী সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছেন কিন্তু অভিসম্পাদ হেতু তুলসী পত্র না ধৌত করিয়া নারায়ণের পূজা হয় না।

বেলবন হইতে ২ ক্রোশ গমন করিলে "মান সরোবর।" এইস্থানে শ্রীমতী রাধিকা মান করিয়া তাঁহার নয়ননীরে এই সরোবর হইয়াছিল। সুতরাং ইহার নাম মান সরোবর হইয়াছে। ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে আরও চারি ক্রোশ রাস্তা গমন করিলে পাণিগ্রামে উপস্থিত হইতে পারেন, তথায় "আনন্দী বিনন্দী" দর্শন প্রাপ্ত হইবেন এই পাণিগ্রাম হইতে বলদেব নামে যে তীর্থ আছে তথায় শ্রীবলদেবকে দর্শন করিবেন। শ্রীবলদেবের মন্দিরের নিকট যে একটী সরোবর দেখা যায় উহাকে "ক্ষীর সরোবর" বলে। এই ক্ষীর সাগরেই রোহিণীনন্দনকে দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন।

যে ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে একটী তুলসী বেদী প্রতিষ্ঠা করেন তিনি নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠপতির কৃপায় পিতৃগণসহ বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হন।

ব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ বন যাত্রার কোন শুভাশুভ দিনের আবশ্যক থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের দশমীতিথির অপরাহ্নে শুভযাত্রা করিতে হয়। এই ব্রজমণ্ডলীর দ্বাদশ বন ও বহুসংখ্যক উপবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ফল পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রন্থে এইরূপ প্রকাশিত আছে। অতএব হিন্দুসন্তান মাত্রেই ইহা প্রদক্ষিণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। একদা গোপরাজ বৃদ্ধ নন্দ ও রাণী যশোমতীর তীর্থপর্য্যটনের বাসনা হইল, কিন্তু তাঁহারা রামকৃষ্ণের স্নেহে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, কি প্রকারে স্নেহপ্রতিমা রামকৃষ্ণকে দৃষ্টের বহির্গত করিয়া তীর্থভ্রমণ করিতে যাইবেন কেবল এই চিন্তাতে তাঁহাদিগকে কাতর হইতে হইত। অবশেষে তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইলেন, তখন এক দৈববাণী আকাশপথে শ্রুত হইল, "নন্দরাজ

ও মহিষী, আপনাদের অন্য তীর্থে গমন নিষ্প্রয়োজন, কেননা এই ব্রজমণ্ডলেই ভারতের সমস্ত তীর্থসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে"। তখন তাঁহারা সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আশ্বাসিত হইলেন এবং সপরিবারে এই ব্রজমণ্ডলের সমস্ত বন ও উপবন সকল ভ্রমণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের ফললাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত।

ক্রমান্বয়ে কংস কর্তৃক দেবকীর ছয়টী সন্তান বিনাশ হইলে পর, সপ্তম গর্ত্ত উৎপন্ন হইল। ঐ গর্ত্তে বিষ্ণুর অনন্তকলা প্রকাশ পাইল এবং ভগবান নারায়ণ জানিলেন যে যদুগণ কংসভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন; তখন তিনি যোগমায়াকে স্মরণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন, ভদ্রে! তুমি গোকুলে গমন কর। বসুদেব পত্নী রোহিণী তথায় বাস করিতেছেন, অনন্ত নামে আমার অংশ দেবকীর গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি সেই গর্ত্ত আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর গর্ত্তে স্থাপন কর। তাহার পর আমি দেবকীর গর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিব আর তোমায় নন্দপত্নী যশোদার গর্ত্তে জন্ম লইতে হইবে। যোগমায়া আদেশ প্রাপ্ত মাত্র অবনীতে আগমন করিয়া সেইরূপ করিলেন। ঐ গর্ত্ত হইতেই বলরামের জন্ম হয়।

পুরবাসীগণ দেবকীর গর্ত্ত নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান স্বপ্নে পূর্ণব্রহ্মরূপে বসুদেব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। বসুদেব কখন কখন সেই নবজলধর শ্যামসুন্দর, পীতাম্বর চতুর্ভূজমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! যাহাতে এই বিশ্বজগৎ বাস করিতেছে' আজ লীলাবশে তাঁহাকে দেবকীর গর্ত্তে বাস করিতে হইল; মায়াময়ের অনন্ত লীলা। তিনি ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিতে সকলই করিতে পারেন।

একদা দেবকীকে কংস দীপ্তিপূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার প্রাণহর হরি বোধ হয় ইহার গর্ত্তে আবির্ভূত হইয়াছেন, তা না হ'লে আমি পূর্ব্বে দেবকীকে এরূপ কখন দেখিতে পাই নাই, এইরূপ মহাচিন্তান্বিত হইয়া তাহার জন্ম প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাদেব ব্রহ্মা নারদাদি মুণিগণ অন্তরীক্ষে দেবকীর নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবকীর কারাগারে শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর যথা সময়ে রেহিণীনক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনি প্রভৃতি নক্ষত্র ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, আকাশে তারকারাজি প্রকাশ পাইতে লাগিল, নদীর জল নির্ম্মলভাব ধারণ করিল, সমীরণ পবিত্র গন্ধবাহী হইল, দ্বিজাতীগণের অগ্নি শান্তভাব ধারণ করিল, এই সকল সুলক্ষণ অবলোকন করিয়া গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,সিদ্ধ ও চারণগণ বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন এবং ভগবানের জন্ম আসন্ন বুঝিতে পারিয়া অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেব ও মুণিঋষিগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিযোগে ঘন তিমিরাবৃত নিশিতে ভগবান শ্রীহরি অবনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার জ্যোতিতে সুতিকালয় এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। দেবকী, বসুদেব সেই তেজোময় অদ্ভুত রূপলাবণ্য বালককে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া উভয়ে তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় এক দৈববাণী শ্রুত হইল "বসুদেব তুমি ঐ বালককে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আইস ; এবং রোহিণীর যে কন্যা হইয়াছে তাহাকে লইয়া এইস্থানে আইস।" বসুদেব আদেশ মত সেই স্নেহের পুত্তলি দেবকীর কোল হইতে লইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন। মায়াময়ের মায়া প্রভাবে কংসের প্রহরীগণ কিছুই জানিতে পারিল না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য

নহে। কিন্তু যাহার লীলাখেলা বর্ণনা করিতেছি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ তাহার জন্য প্রকাশিত হইল। বৃন্দাবনে জন্মাষ্টমীর উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয় কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঝুলনযাত্রা আরও অধিক সমারোহে হয় এই মেলা পনর দিবস থাকে তখন বৃন্দাবনে তিলমাত্র স্থান থাকে না।

যাত্রীদিগের সুবিধার্থে এই উপদেশটি মনে রাখিবেন। যাহারা বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর রাজবাটী, জয়পুরসহর ও দেবালয়, পুস্কর, সাবিত্রীদেবীকে দর্শনাভিলাষ করিবেন এবং যদ্যপি বন পরিভ্রমণের সময় বৃন্দাবন যাত্রা করেন অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর সময় হয় তাহা হইলে জন্মাষ্টমীর অন্ততঃ চারি পাঁচ দিবস পূর্ব্বে তাহাদের দ্রব্য সকল নিজ কুঞ্জে স্থাপিত করিয়া সামান্যরূপ নিত্য ব্যবহারানুযায়ী আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি লইয়া যাত্রা করিবেন আর তীর্থ সামগ্রী বৃন্দাবনে যাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ক্রয় করিলেই হইবে।

প্রথমেই বৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে আগ্রায় যাইবেন। আগ্রায় যাইতে হইলে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নামক ষ্টেশনে নামিতে হইবে তথা হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন ঐ গাড়ী ক্রমান্বয়ে আগ্রায় যাইবে।

আগ্রা একটী বিখ্যাত সহর। রাস্তা প্রশস্ত, সহরের বাজার, চক, কেল্লা ও অদ্ভুত তাজমহলের দৃশ্য দেখিবার জন্য যাত্রীগণ তথায় গমন করিয়া থাকেন।

এই সহর পূর্ব্বে আকবর নামে এক বাদসার রাজধানী ছিল। তাহারই নামানুসারে এই সহরের নাম আগ্রা হইয়াছে। এইস্থানের যমুনাতীরস্থ বালুকার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার সেতুগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।
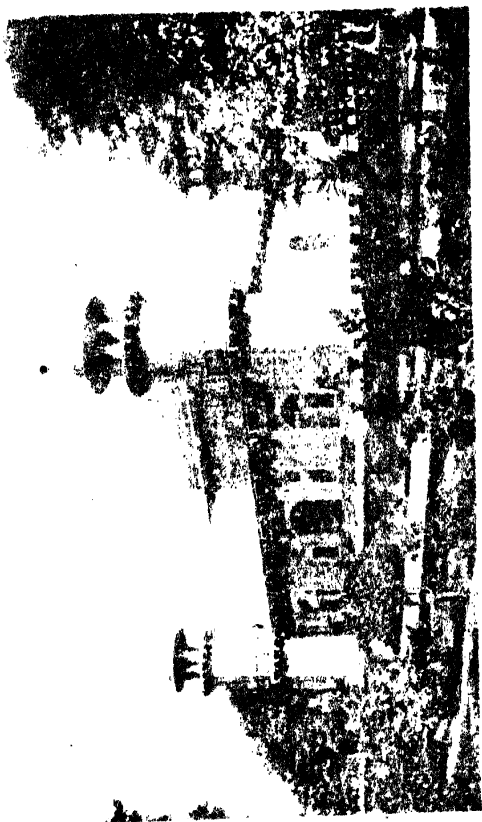
নহে। কিন্তু যাহার লীলাখেলা বর্ণনা করিতেছি সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ তাহার জন্ম প্রকাশিত হইল। বৃন্দাবনে জন্মাষ্টমীর উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয় কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঝুলনযাত্রা আরও অধিক সমারোহে হয়। মেলা পনর দিবস থাকে তখন বৃন্দাবনে তিলমাত্র স্থান থাকে না।

যাত্রীদিগের সুবিধার্থে এই উপদেশটি মনে রাখিবেন। যাহারা বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর, রাজবাটী, জয়পুরসহর ও দেবালয় পুষ্কর, সাবিত্রীদেবীকে দর্শনাভিলাষ করিবেন এবং যদ্যপি বন পরিভ্রমণের সময় বৃন্দাবন যাত্রা করেন অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর সময় হয় তাহা হইলে জন্মাষ্টমীর অন্ততঃ চারি পাঁচ দিবস পূর্ব্বে তাহাদের দ্রব্য সকল নিজ কুঞ্জে স্থাপিত করিবে। আবশ্যকমত নিজ এবং রাস্তার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া যাত্রা করিবেন আর তীর্থ সামগ্রী বৃন্দাবনে যাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিবেন তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ক্রয় করিলেই হইবে।

প্রথমেই বৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে আগ্রায় যাইবেন। আগ্রায় যাইতে হইলে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নামক ষ্টেশনে নামিতে হইবে তথা হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন ঐ গাড়ী ক্রমাগত আগ্রায় যাইবে।

আগ্রা একটী বিখ্যাত সহর। রাস্তা প্রশস্ত, সহরের বাজার, চক, কেল্লা ও অদ্ভুত তাজমহলের দৃশ্য দেখিবার জন্য যাত্রীগণ তথায় গমন করিয়া থাকেন।

এই সহর পূর্ব্বে আকবর নামে এক বাদসার রাজধানী ছিল। তাহারই নামানুসারে এই সহরের নাম আগ্রা হইয়াছে। এইস্থানে যমুনাতীরস্থ বালুকার উপর ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার সেতুগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

আগ্রা এৎমদাদ উদ্যানের রামবাগের দৃশ্য।

[১০৯ পৃষ্ঠা]

এম্‌দাদ উদ্যান।

সম্রাট আকবরসাহের রাজত্বকালে এই সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে রামবাগ নামক একটী উৎকৃষ্ট বৈঠকখানা আছে উহা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়।

মতি মসজিদ্।

কালীবাড়ীর অনতিদূরে মতি মসজিদ্ বিরাজমান আছে। ভাল ভাল শ্বেতপ্রস্তর মতির সহিত মিলাইয়া এই মসজিদ প্রস্তুত। এই নিমিত্ত ইহার নাম মতি মসজিদ হইয়াছে ইহার কারুকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন।

কালীবাড়ী।

আগ্রায় মুসলমান বাদসাদিগের রাজত্বকালে হিন্দুদিগের আহারের অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত থাকায় হিন্দুরা একটী সভা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং আগ্রার পশ্চিমে স্থানে স্থানে কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রীশ্রীকালী মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন এবং তথায় ভাল ব্রাহ্মণদ্বারা মহামায়ার ভোগের প্রসাদ হিন্দু তীর্থযাত্রীদিগকে আহার করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অদ্যাপিও ঐ কালীবাড়ী বর্ত্তমান আছে যাহারা ইচ্ছা করিবেন তথায় যাইলেই মহামায়ার প্রসাদ পাইবেন।

তাজমহল।

যমুনার তীরে পাঁচটী চূড়াবিশিষ্ট তাজমহল অবস্থিত! ইহার সৌন্দর্য্য যমুনানদীর উপর নৌকায় উঠিয়া দেখিলে আরও সুন্দর দেখায়। তাজের ন্যায় উচ্চ সুন্দর মসজিদ্ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার প্রবেশ দ্বার বা ফটকের দৃশ্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইবে। জানিনা বাদসা অকাতরে কত অর্থ ব্যয় করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কথিত আছে বাইশসহস্র লোক বাইস বৎসরে এই অদ্ভুত তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন আগ্রা তাজমহলের নিমিত্ত বিখ্যাত। জাহাঙ্গীর বাদসার প্রিয় বেগমের কবর স্থানকে মম তাজ বলে এবং সাজাহান বাদসার সুন্দরী বেগম জগৎ বিখ্যাত নুরজাহান সুন্দরীর কন্যা অজবজা এই কয়টী কবর পাশাপাশি আছে। তাজের সংলগ্ন উদ্যানটী অতি চমৎকার। বাগানের মধ্যে যাইবার রাস্তার উভয়দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ৮৪টী জলের সুন্দর ফোয়ারা আছে ও মধ্যে মারবেল প্রস্তর নির্ম্মিত একটী অত্যাশ্চর্য্য সেতু দেখিলে চমৎকৃত হইবেন।

আগরার চক্।

আগ্রা যমুনার উভয় তীরে অবস্থিত। আগ্রার চকে একবার প্রবেশ করিলে মণি, মুক্তার দোকান, আসন, কারপেট ও অন্যান্য সুন্দর খেলনা সকল একবার নয়নগোচর হইলে, যাহার নিকট যত টাকা থাকুক না কেন সমস্তই খরচ করিতে ইচ্ছা হইবে আগ্রায় তাজ, চক্ ও কেল্লা দেখিবার যোগ্য।

জয়পুরের প্রধান রাস্তার দৃশ্য ।

[১১১ পৃষ্ঠা

জয়পুর।

আগ্রা ষ্টেশন হইতে মেলট্রেনে যাইতে পারিলে পথিমধ্যে কোথাও গাড়ী
বদল করিতে হয় না। জয়পুর একটী পুরাতন হিন্দু স্বাধীন বিখ্যাত রাজ্য।
এখানকার রাস্তা সকল সুবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা সকল সুদৃশ্য সুশোভিত
দোকান সকল ও বাজার সকল চক্, মহারাজের গোলাপ বাগ, পশুশালা
প্রভৃতি পর পর দেখিতে দেখিতে মনোমুগ্ধকর সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মহা-
রাজের জগৎবিখ্যাত অট্টালিকাতে পৌছিবেন এবং অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা, হস্তি-
শালা আলালগৃহ সমস্তই দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন। এখানে যে
টাকা প্রচলিত বিক্রয় হয় উহা কেবল জয়পুর রাজ্যমধ্যে প্রচলিত হয়।

জয়পুর প্যালেস, বঙ্গ মহিলাদিগের ভাগ্যে দর্শনলাভ হয় না এবং যাত্রী-
গণের মধ্যে চৌদ্দআনা পুরুষের ভাগ্যে ও ঘটেনা। ইহার কারণ এই
মহারাজের আদেশ অনুসারে শূন্যমস্তকে কাহাকেও প্যালেস মধ্যে প্রবেশ
করিতে দেন না। যদ্যপি বিশেষ অনুরোধে কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন হয়,
তাহা হইলে তাহাকে পাগড়ী বা টুপি মস্তকে পরিধান করিয়া প্রবেশ করিতে
হইবে এবং প্যালেস দেখিবার ছাড়পত্রের সহিত যে ব্যক্তি সঙ্গে থাকিবেন,
তিনি রাজ পরিবারবর্গের মধ্যে যাহাকে নির্দ্দেশ করিবেন তাহারই নিকট
গিয়া পাগড়ী উত্তোলন করিতে হইবে, উহাই তাহাদের সম্মানসূচক
... যাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে অর্থাৎ যিনি প্যালেস দেখিবার প্রবেশ-
অধিকার লাভ করিবেন, তিনি রাজ সরকারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুন্দর সুন্দর
... দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া দেবতুল্য স্বর্গসুখ অনুভব করিবেন সন্দেহ
নাই।

... মধ্যস্থলে একটী মহারাজ উদয়সিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত যন্ত্রাগার
... ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বার, তিথি, নক্ষত্রের গমনাগমন জ্ঞাত হওয়া
... একটী কাশীর মানমন্দিরে দেখিয়াছেন। এই দুই যন্ত্রই

।

আগ্রা ষ্টেশন হইতে মেলট্রেনে যাইতে পারিলে পথিমধ্যে কোথাও গাড়ী বদল করিতে হয় না। জয়পুর একটী পুরাতন হিন্দু স্বাধীন বিখ্যাত রাজ্য। সহরের রাস্তা সকল সুবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা সকল সুদৃশ্য সুশোভিত দোকান সকল ও বাজার সকল চক্, মহারাজের গোলাপ বাগ, পশুশালা প্রভৃতি পর পর দেখিতে দেখিতে মনোমুগ্ধকর সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মহারাজের জগৎবিখ্যাত অট্টালিকাতে পৌছিবেন এবং অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা, হস্তিশালা আদালগৃহ সমস্তই দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন। এখানে যে সকল ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হয় উহা কেবল জয়পুর রাজ্যমধ্যে প্রচলিত হয়।

জয়পুর প্যালেস, বঙ্গ মহিলাদিগের ভাগ্যে দর্শনলাভ হয় না এবং যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দআনা পুরুষের ভাগ্যে ও ঘটেনা। ইহার কারণ এই যে, সরকারের আদেশ অনুসারে শূন্যমস্তকে কাহাকেও প্যালেস মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। যদ্যপি বিশেষ অনুরোধে কাহারও ভাগ্য প্রসন্ন হয়, তাহাহইলে তাহাকে পাগড়ী বা টুপি মস্তকে পরিধান করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে এবং প্যালেস দেখিবার ছাড়পত্রের সহিত যে ব্যক্তি সঙ্গে থাকিবেন, তিনি রাজ পরিবারবর্গের মধ্যে যাহাকে নির্দ্দেশ করিবেন তাহারই নিকট টুপি বা পাগড়ী উত্তোলন করিতে হইবে, উহাই তাহাদের সম্মানসূচক চিহ্ন। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে অর্থাৎ যিনি প্যালেস দেখিবার প্রবেশ-অধিকার লাভ করিবেন, তিনি রাজ সরকারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া দেবতুল্য স্বর্গসুখ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

রাজবাটীর মধ্যস্থলে একটী মহারাজ উদয়সিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত যন্ত্রাগার আছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বার, তিথি, নক্ষত্রের গমনাগমন জ্ঞাত হওয়া যায় এইরূপ যন্ত্র একটী কাশীর মানমন্দিরে দেখিয়াছেন। এই দুই যন্ত্রই

একইপ্রকার তবে জয়পুর রাজবাটীর যন্ত্রটি চলিত অবস্থায় আছে। যাত্রী-গণ বৃন্দাবন হইতে জয়পুর আসিতে যে সমস্ত ক্লেশভোগ করিয়াছেন সে সমস্তই মহারাজের অদ্ভুত বৃহৎ সুন্দর দেবালয়দ্বয়ে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ ও গোপীনাথজীউর ভুবনমোহন চাঁদমুখের ঝাঁকি দর্শনে যথার্থই এক নূতন স্বর্গীয়ভাব উদয় হইবে। এখানে ভেটের কোন বাধা নিয়ম নাই। তবে সাধ্যানুসারে কিছু প্রণামি দান করিতে হয়।

যদ্যপি কোন ভক্ত শ্রীগোবিন্দজীর প্রসাদ অভিলাষ করেন তাহা হইলে পূজারী ব্রাহ্মণকে ভোগের কিছু পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া স্বীয় বাসার ঠিকানা সহ পাঠাইলে যথাসময়ে প্রসাদ আপন স্থানে পৌছিয়া দেন। জয়পুর দেবালয়ে আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণদ্বারা পূজা হইয়া থাকে, তাঁহারা ও স্বদেশ-বাসী বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে সমাদর করিয়া থাকেন।

হিন্দুরাজ্যে বিশেষতঃ দেবালয়ের প্রবেশদ্বারে একটী মুসলমান দ্বারবানকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ইহার অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে পূর্ব্বে কোন সময়ে কতকগুলি হিন্দুযাত্রী জয়পুরে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন আশে যাত্রা করিলে পথিমধ্যে এক যবনের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং নানা-প্রকার বাক্যালোপের পর হিন্দুদিগের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দজীউর পরিচয় পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া প্রভুর দর্শন অভিলাষ করে তখন হিন্দুরা বিধর্ম্মি যবনের প্রবেশ নিষেধ জানাইলেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। সে ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে হিন্দুদের অরাধ্য দেব শ্রীগোবিন্দ-জীকে দর্শন করিবার স্থির সংকল্প করিয়া ভক্তদিগের পশ্চাৎগামী হইল কিন্তু দেবালয়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারপাল তাহার পরিচয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া সরকারের আদেশমত বাধাপ্রদান করিল তখন যবন নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুতেই কোনরূপ ফলোদয় না দেখিয়া হতাশপ্রাণে শ্রীগোবিন্দজীউকে হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিয়া প্রেমে নয়ননীরে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে করিতে দ্বারপালকে রাজার নিকট
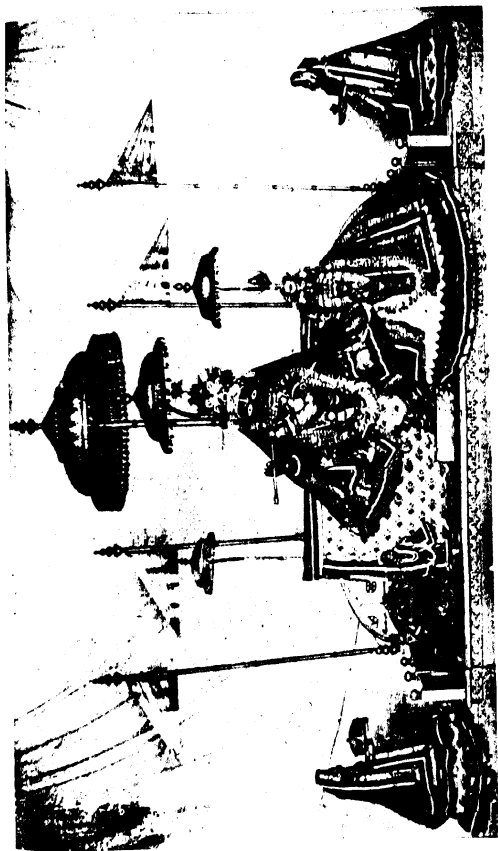
জয়পুরের শ্রীগোবিন্দ জীউ। [১১২ পৃষ্ঠা]

হাজির করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল তাহার করুণবিলাপে দুঃখিত হইয়া দ্বারী হুজুরে হাজির করিয়া যবনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। মহারাজ তাহার পরিচয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন কিন্তু তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় ও ভক্তি ভাব অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিধর্ম্মী যবনকে কিরূপে প্রবেশ-অধিকার দিবেন ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহারও নিকট নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিতে লাগিল। অবশেষ মহারাজ তাহার তর্কের মর্ম্ম অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়া রাজ-সরকারে চাকরীর প্রার্থনা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন তখন সেই ভক্ত-হৃদয় যবন নিরুপায় বিবেচনা করিয়া হতাশপ্রাণে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া এই স্থির করিল (যদ্যপি দেবালয়ের বহির্ভাগে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত হইতে পাই তাহা হইলে কখন না কখন কোনরূপে প্রভুকে দর্শন করিতে পাইব) এইরূপ স্থির করিয়া সে দেবালয়ের বহির্ভাগে দ্বাররক্ষকের পদ প্রার্থনা করিল তখন মহারাজ বুঝিলেন যে, চাতক যেরূপ একবিন্দু জলের আশায় আকাশপানে চাহিয়া থাকে এই যবনও সেইরূপ আমার নিকট সকল সুখ আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের দর্শন আশা বলবৎ করিয়াছে যাহা হউক তিনি সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া এই চুক্তিতে তাহার আশা পূরণ করিলেন যে দিবাভাগে তাহাকে বিশ্রাম করিয়া রাত্রিকালে দেবালয়ের বহির্দ্বারে প্রহরীর পদে থাকিতে হইবে এইরূপ করিলে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইবে না। এক্ষণে সেই যবনরূপী মহাবীর ভক্ত' রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মনের সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু দিবারাত্র ভগবানকে চিন্তা করিতে লাগিল এবং সুধিধা অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইব। ভক্তের বারম্বার আন্তরিক কাতর প্রার্থনায় তাঁহাকেও বিচলিত হইতে হইল তখন তিনি রাত্রিকালে সদয় হইয়া যবনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া দর্শন দানে সুখী করিলেন। আহা ! ভক্তাধীন তোমার ভক্তের আশা পূর্ণ করি-বার জন্য সকলেই সম্ভবে ! এই নিমিত্ত তোমার অপর একটী নাম বাঞ্ছাকল্প-

ভক্ত হইয়াছে। যবন সেই নবজলধর শ্যামসুন্দর তেজোময় অপরূপ রূপ হিন্দুদিগের ত্রাণকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দজীউকে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে ভক্তি দান করিল।

একদা রাত্রিকালে শ্রীগোবিন্দজীউ লীলাখেলা প্রকাশছলে এই যবন প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া জয়পুর হইতে বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার সহিত কেলীকৌতুক করিবার জন্য পদব্রজে গমন করিলেন এবং পরীক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মুক্তাকণ্ঠহার এই যবনের সন্নিকটে পাতিত করিয়া উন্মত্তভাবে কেলীকৌতুকে প্রবৃত্ত হইলেন, যবন ঐ হার স্বীয় প্রভুর অবগত ছিল সুতরাং উহা উঠাইয়া রাখিলেন কিন্তু তাঁহার কৌতুকে কোন-রূপ বাধা দিল না, রাত্রি অবসানে অতি প্রত্যূষে ভগবানের আজ্ঞানুসারে যথাসময়ে তাঁহার সহিত স্বীয় পুরে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন পূজারী ব্রাহ্মণ দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রভুর মুক্তাকণ্ঠহার দেখিতে না পাইরা ভয়বিহ্বলচিত্তে নানারূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে দুঃখিত মনে মহারাজের নিকট সংবাদ দিলেন নরপতি ব্রাহ্মণের প্রশ্ন উত্তরে অসন্তুষ্ট হইলেন কেননা দেবালয়ের যাবতীয় আসবাব পূজারীর জিম্মায় থাকে এবং দ্বারের চাবী পূর্ব্বপ্রথানুসারে পূজারীর নিকটেই থাকিত সুতরাং তিনি কোনরূপ সৎ কৈফেৎ প্রদান করিতে না পারিয়া নিজেই লজ্জিত হইলেন তখন মহারাজ ব্রাহ্মণের কুৎসিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া কারাগারে আটক রাখিতে আদেশ করিলেন মূহুর্ত্তমধ্যে নগরের প্রতিপল্লীতে পল্লীতে এই সমাচার প্রচার হইল এমন কি ঐ যবনের নিকটও পৌঁছিল। যবন ব্রাহ্মণকে নির্দ্দোষী জানিয়া মুক্তাকণ্ঠহার সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা সকল প্রকাশপূর্ব্বক প্রভুর হার প্রত্যার্পণ করিলে পর, মহারাজ মনে মনে সেই ভক্তবীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, যাবৎ আমার রাজ্য থাকিবে আমার বংশানুক্রমে তোমার বংশে যে

কেহ বর্ত্তমান থাকিবে এইস্থানে আমার আদেশমত তাবৎ একজন মাত্র এই পদে সদাসর্ব্বদা প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকিবে এইরূপে যবন ভগবানের লীলা খেলা প্রকাশ করিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে মুক্তি করিয়াছিল।

জয়পুর সহরের প্রান্তভাগে যে পাহাড় (গলদার গোমুখি) নামে খ্যাত আছে তথায় গমন করিবেন এবং ঝরণা হইতে কিরূপে জল নিঃসরণ হয়, পাহাড়ী বালক বালিকাগণ কিরূপে পর্ব্বত হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে। আরও ব্যাঘ্রাদি কিরূপে ঝরণার জলপান করে? এই সমস্ত নয়নগোচর হইলে কত আনন্দ অনুভব করিবেন। জয়পুর সহর হইতে পাহাড় প্রায় ছয় মাইল যাইতে হয় ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, পাকা রাস্তা সত্ত্বে প্রায় একপোয়া হাটা পথে যাইতে হইবে কিন্তু স্মরণ রাখিবেন যাত্রীদিগের দলমধ্যে লোক সংখ্যা অধিক না থাকিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে।

সহরের পশ্চিমে (যশোরেশ্বরী) বা জয়পুরেশ্বরী দর্শন করিবেন। যশোরে মহাপ্রতাপশালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাভূত হইলে পর মহারাজ মানসিংহ এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করান সেই অবধি "মা জগজ্জননী কালীমূর্ত্তিতে" এখানে বিরাজ করিতেছেন এই নৃপমুণ্ডধারী কালীকাদেবীকে দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন।

পুষ্কর তীর্থদর্শন-যাত্রা।

জয়পুর হইতে পুষ্কর তীর্থ যাইতে হইলে আজমীর নামক বিখ্যাত ষ্টেশনে নামিতে হইবে। ষ্টেশন হইতে পুষ্কর তীর্থস্থানে পৌছিতে পর্ব্বতবেষ্টিত ন্যূনাধিক সাত মাইল পর্ব্বত মধ্যপথ দিয়া গমন করিতে হয়। যাহারা এক্কা বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবেন তাহাদের পাহাড়ে উপস্থিত হইবামাত্র গাড়ী

হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ৩ মাইল পাহাড় হাটিয়া যাইতে হইবে গাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে; ইহাতে যাত্রীদিগের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে (রক রাইড টম্‌টম্) একপ্রকার ঘোড়ায় টানা গাড়ী আছে উহাতে সহজে পাঁচজন লোক বসিতে পারে ঐরূপ গাড়ী ভাড়া করিতে অনুরোধ করি, কেননা উহা অত্যন্ত দ্রুতগামী ও পাহাড়ে উঠিবার সময় এই গাড়ীতে যাইলে নামিতে হয় না অথচ ভাড়া অধিক দিতে হয় না। ব্রজমণ্ডলে যেরূপ লালমুখ বানরের উৎপাত এই পুষ্কর তীর্থেও সেইরূপ কালমুখ মরকট হনুমানের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইবে। পূর্ব্বে ঋষিগণের যজ্ঞ করিবার সময় বৃহদাকার হনুমান সকল তাঁহাদের যজ্ঞ নষ্ট করিত এই নিমিত্ত ঋষিদিগের অভিশাপে এখানে তাহারা মরকটরূপে অবস্থান করিতেছে।

বিধাতৃবিহিত পুষ্কর তীর্থ সর্ব্বলোক বিশ্রুত। ইহা একটী বৃহৎ চৌকনা পুষ্করিণীর ন্যায় দেখিলে বোধ হয়। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরের সোপান দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত। ইহার চারিদিকে চারিটী সুন্দর বাঁধা ঘাট আছে। ঘাটের উপর দক্ষিণদিকে একটী উচ্চ নহবৎখানা শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে ঘাটের দুই পার্শ্বে দুইটী উচ্চ বেদী বাঁধান আছে। ঐ বেদীর উপরে যাত্রীদিগকে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। তৎপরে পুষ্কর তীর্থপদ্ধতি অনুসারে স্নান তর্পণ সঙ্কল্প প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া তীর্থঘাটের পূর্ব্বাংশে যে সকল দেবালয় আছে সে সমস্তই দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। এই তীর্থস্থানে শেটজীর দেবালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার মধ্যে একটী তাম্রের স্তম্ভ, যাহা তালগাছ নামে খ্যাত দেখিতে পাইবেন। সন্ধ্যাকালে পুষ্কর তীরে ও দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক দেব আরতি দর্শন করিয়া চরিতার্থ বোধ করিবেন।

এই পুষ্করতীর্থে ভূমণ্ডলের সমুদায় দশ সহস্র কোটি তীর্থ সান্নিধ্য

আছেন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্বগণ নিত্য এই তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব দৈত্য ও ঋষিগণ এই স্থানে তপস্যা করিয়া দিব্য যোগসম্পন্ন ও পুণ্যশালী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধচিত্তে মনে মনে পুষ্করতীর্থ গমন অভিলাষিত হন, তিনি সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া সুরলোকে পূজিত হন। সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি পরম প্রীতমনে সদত তথায় বাস করিতেছেন। পূর্ব্বকালে দেব ও ঋষিগণ এই পুষ্করতীর্থে মহৎ পুণ্য উপার্জ্জন ও সিদ্ধলাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের অর্চ্চনে রত থাকিয়া অভিষেক করেন, তাঁহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের অধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মহাতীর্থ তীরে ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণভোজন করান, তিনি ইহকাল ও পর-কালে পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। কি ব্রাহ্মণ, কি বৈশ্য, কি ক্ষত্রিয়, কি শূদ্র যে কেহ এই পুষ্করতীর্থে স্নান করেন, তাহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে গমন করেন, তাঁহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে স্বায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্করতীর্থ স্মরণ করেন, তাঁহার সকল তীর্থ স্নানের ফললাভ হয়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষ জন্মাবধি যে সকল পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকেন, একবারমাত্র পুষ্করে স্নান করিলে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। যেরূপ ভগবান মধুসূদন সর্ব্বদেবের আদি, তেমতি এই তীর্থ, সকল তীর্থের আদি, হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ হইতে যে তিন প্রস্রবন প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুষ্করতীর্থ পাতাল ভেদ করিয়া বিদ্যমান, উঁহার উৎপত্তি রহিত। এই নিমিত্ত উঁহার জন্মকারণ কেহই জানেন না। পুষ্করতীর্থে গমন, তপস্যা, দান ও বাস করা বহুপুণ্যে ঘটে।

এই তীর্থতীরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে মনুষ্য পুতাত্মা হয়, অর্থাৎ তাহার কোন দুর্গতি হয় না। লোক ত্রিরাত্রি উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গো সমুদয় প্রদান না করিয়াই দরিদ্র হয়; বহুপুণ্যে

মানবজন্ম সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই দুর্ল্লভ মানব জন্ম ধারণ করিয়া তীর্থাভিগমন সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই পুষ্কর তীর্থে বহু মৎস্য, কুম্ভীর, মকর, হাঙ্গর, সর্প, গুগলি, শাম্বুক প্রভৃতিকে একত্রে খেলা করিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে মৎস্য ও কুম্ভীর ক্রিড়া দেখিবার নিমিত্ত যাত্রীগণ নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সকল প্রদান করিয়া উহাদিগকে একত্রিত করিয়া নানাপ্রকার আমোদ অনুভব করিয়া থাকেন।

পুষ্কর তীর্থতীর হইতে সাবিত্রী-পাহাড় অতি নিকট বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে; পুষ্কর-তীর্থস্থান হইতে সাবিত্রী-পাহাড় প্রায় চারি মাইল যাইতে হয়।

শ্রীশ্রীসাবিত্রী দেবী।

পুষ্কর তীর্থের পশ্চিমদিকে প্রায় চারি মাইল দূরে উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে সাবিত্রীদেবীর বাসস্থান। এই মহাদেবীকে শুদ্ধচিত্তে অর্চ্চনা করিলে পতির দীর্ঘায়ু ও পতিপ্রাণা হয়। মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক, সত্যপ্রিতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি ছিলেন, তিনি সাবিত্রীদেবীর অর্চ্চনা করিয়া সাবিত্রীসম পদ্মপলাসলোচনা তেজস্বিনী কন্যালাভ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যা সাবিত্রীদেবীর বরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিয়াছিলেন। তাহার পদ্মপলাসলোচনা এবং তেজস্বিনীমূর্ত্তি অবলোকনে কোন নরপতি, দেবীজ্ঞান বোধ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, অবশেষ অশ্বপতি স্নেহের পুতলি সাবিত্রীকে আত্মস্বরূপ পতিলাভ করিতে আদেশ করিলেন, কারণ যে পিতা কন্যারে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি

ভর্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, এই তিন ব্যক্তিই ধর্ম্মে পতিত হন এবং দেবস্থানে নিন্দনীয় হন।

রাজা অশ্বপতি কন্যারে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পদাতি বন্দন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় বন গমনপূর্ব্বক তীর্থে তীর্থে ধন প্রদান করতঃ অবশেষ পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন নামা ভূপতির পুত্র সত্যবানকে অল্পায়ু জানিয়াও তাঁহাকে পতিত্যে বরণ করিলেন এবং নিজগুণে ধর্ম্মপুত্র যমরাজাকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরপ্রভাবে পতিসনে বহুকাল পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এই সাবিত্রীদেবীর মন্দির অভ্যন্তরে গাইত্রীদেবী বিরাজমান আছেন। যাত্রীগণ সাবিত্রীদেবীর ললাটে সিন্দুর ও হস্তে লৌহ (চুড়ি) স্পর্শ করাইয়া চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন এবং নূতন সাড়ী ও সোনায় নথ দান করেন, তাঁহার পূজার জন্য সাবিত্রীদেবীর পূজারী ব্রাহ্মণকে পৃথক এক টাকা চারি আনা দক্ষিণা দান করিতে হয়। এই পর্ব্বতে উঠিতে ৩১৩ তিনশততেরর অধিক সোপান উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। যে সকল ভক্ত এই অত্যচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে অসমর্থ অথচ উঠিবার একান্ত বাসনা করেন, তাঁহারা পুষ্কর তীর্থস্থান হইতে একখানি ডুলি সংগ্রহ করিবেন; উহার সাহায্যে বিনা ক্লেশে যাওয়া আসা হইবে। প্রতি ডুলির ভাড়া যাতায়াত ॥৹ আট আনা মাত্র দিতে হয়। পুষ্করতীর্থ সকল পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীধাম বৃন্দাবনে আসিবেন।

এইরূপে শ্রীধামে শ্রীকৃষ্ণের জন্মউৎসব দর্শন করিয়া যাহারা যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাহারা সেইরূপই করিয়া থাকেন। কেহ দশমী তিথির অপরাহ্নে স্বদেশ আর কেহবা বনযাত্রায় বহির্গত হন। দশমীর পরদিবস বৃন্দাবনধাম যাত্রীশূন্য প্রায় দেখা যায়।

যে সকল যাত্রী ব্রজমণ্ডলের চৌরাশী ক্রোশ বনযাত্রা করিবেন। তাহারা যেন বৃন্দাবনের আপন আপন ব্রজবাসী (পাণ্ডা) সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাহা হইলে তাহাদের তত্ত্বধানে পরমসুখে বনপ্রদক্ষিণ করিতে পারিবেন কোন বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। বন মধ্যে সকল স্থানে গৃহাদি পাওয়া যায় না। সুতরাং বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে রক্ষার নিমিত্ত একটী তাম্বুর প্রয়োজন। একখানা দশ বারজন লোক থাকা যায় এরূপ একটী তাম্বুর ভাড়া আট টাকা হইতে দশ টাকা দিলেই ভাড়া পাওয়া যায়। আর একখানি গোশকট একান্ত আবশ্যক কেননা তাম্বুর ও যাত্রার সমস্ত সরঞ্জাম বহনের নিমিত্ত। স্থানে স্থানে তাম্বু খাটান এবং জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত একটী ভৃত্যের অত্যন্ত প্রয়োজন অতএব একটী ভৃত্য সঙ্গে রাখিবেন। তাহাদের প্রত্যেককে প্রতি রোজ ॥৶৹ আনা হইতে ৸৹ বার আনা দিতে হয়। বনপরিভ্রমণ করিতে অন্তত চৌদ্দ দিবস সময় লাগিবে। বনে আহারীয় সকল সামগ্রীই পাওয়া যাইবে, কেবল সিদ্ধ চাউল ও ভাল সরিসার তৈল এই দুইটি জিনিস বৃন্দাবন হইতে সংগ্রহ করিবেন।

যাহারা বহুদিবস সংসারমায়া ত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়া নিজ পুত্র কন্যার মুখ দর্শনে বিমুখ হইয়াছেন এক্ষণে তীর্থস্থানের চাঁদমুখ সকল দর্শন করিয়া নিজপুরের চাঁদমুখ সকল নিরীক্ষণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন।

তীর্থস্থান হইতে ভগবানের কৃপায় নিজালয়ে নির্বিঘ্নে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিতে হয় এবং বিপ্রগণকে ভুজ্যি, মৎস্য প্রদান করিয়া ভক্তি-সহকারে তাঁহাদিগকে সাধ্যমত ভোজন করাইয়া দক্ষিণাসহ সন্তুষ্ট করিতে হয়, এইরূপ করিলেই তীর্থফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তীর্থ পর্য্যটনের পর গঙ্গাস্নানের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল। রাজা ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভাগীরথী মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইবার সময় ভগবান মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু! আমি, তুমি ও পার্ব্বতী

এই ত্রিশক্তি একত্রে সংযুক্ত থাকায় মর্ত্ত্যে পাপীগণ গঙ্গাস্নান করিলে, অনায়াসে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ সকল পাপী-দিগের পাপরাশি গঙ্গায় নিমগ্ন থাকিবে, হে প্রভু! কিরূপে ঐ পাপরাশি লয়প্রাপ্ত হইবে অনুমতি করুণ। সদাশিব ভাগীরথীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, দেবী! তুমি নিঃসন্দেহে মর্ত্ত্যে গমন কর। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্য্যটনের পর গঙ্গাস্নান করিবে, আমার বরপ্রভাবে সেই পুণ্যফলে ঐ পাপরাশি নাশ করিবে। যদ্যপি কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্য্যটনের পর গঙ্গাস্নান না করে তাহা হইলে স্বয়ং আমি গুপ্তভাবে তাহার সকল পুণ্য হরণ করিব। ভগবান মহেশ্বরের নিকট এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভাগীরথী হৃষ্টচিত্তে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তীর্থপর্য্যটনকারীকে গঙ্গাস্নান করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ একটী প্রাচীন উপদেশ প্রকাশিত হইল।

একদা হর, পার্ব্বতী ও গনেশ একত্রে কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থান করিতে-ছেন এমন সময় দেব সেনাপতি কার্ত্তিক তীর্থ পর্য্যটনে কৃতনিশ্চিত হইয়া হরপার্ব্বতীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা উভয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকের বাসনা পূর্ণ করিলেন। ঠিক্ সেই সময় তদীয় ভ্রাতা গনেশ দুঃখিত মনে মহেশ্বরের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন যে, কার্ত্তিক দাদা তাঁহার দ্রুতগামী শক্তিসম্পন্ন বাহন "ময়ূরের" সাহায্যে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে তীর্থ সকল পর্য্যটন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু পিতঃ! আমার বাহন দুর্ব্বল "ইন্দুর" আমি কিরূপে তীর্থদর্শন ফলপ্রাপ্ত হইব অনুমতি করুণ? মহেশ্বর গনেশের মনভাব অবগত হইয়া তাহার দুঃখ দূরীকরণার্থ বলিলেন, বৎস গনেশ! তোমার কোন তীর্থ পর্য্যটনের আবশ্যক নাই। তুমি যে তীর্থে গমন করিতে ইচ্ছা করিবে আমার উপদেশ মত তোমার জননী পার্ব্বতীদেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাস্নান করিলে তদনুরূপ ফলপ্রাপ্ত হইবে, তখন গনেশজী পিতৃ উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে একে একে তীর্থ

সকলকে স্মরণপূর্ব্বক জননী পার্ব্বতীদেবীর পদধূলি গ্রহণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে গনেশজী পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল পর্য্যটনের ফললাভ করিয়াছিলেন। অতএব যে কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্য্যটনে অক্ষম, অথচ তীর্থদর্শন অভিলাষী হইবেন তাহারা নিঃসন্দেহে সিদ্ধিদাতা গনেশজীর অনুকরণ করিয়া সকল তীর্থের ফলভোগ করিবেন।

কোন তীর্থে কোন মধ্যম পুত্রকে পিণ্ডদান করিতে নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন পিণ্ড অধিকারী হন না। মধ্যম পুত্রের পিণ্ড পিতৃপুরুষগণ স্বর্গীয় রাজা অজপুত্র দশরথের আদেশ অনুসারে গ্রহণ করেন না।

কথিত আছে রাজা দশরথ তাঁহার প্রিয়তমা মধ্যম মহিষী কৈকেয়ীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং সেই কৈকেয়ীর অসম্ভব "বর" প্রার্থনায় তাঁহার স্নেহের পুত্তলি শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্যেশ্বরের পরিবর্ত্তে বনবাস দিয়া, সেই রামশোকে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন কিন্তু নির্দ্দোষী ভরত যখন তাঁহাকে পিণ্ডদান করেন, সেই সময় স্বর্গীয় দশরথ পিশাচরূপিণী মধ্যমমহিষীর কুব্যবহার স্মরণ করিয়া, ক্রুদ্ধ মনে মধ্যম পুত্রের পিণ্ড গ্রহণ করেন নাই। প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাইবেন যখন শ্রীভরত গয়াতে ষোড়শোপচারে স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি রোষভরে চণ্ডালনীর পুত্রজ্ঞানে ভরতের পিণ্ড গ্রহণ না করিয়া ক্ষুধায় কাতর হইলেন এবং সতী সীতাদেবী যখন শ্রীরাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতে খেলাচ্ছলে ফল্গুতীরে তাঁহার প্রিয় বাল্যসখিগণকে কৃত্রিম বালির রন্ধনপূর্ব্বক পরিবেশন করিতেছিলেন সেই সময় সীতাদেবীর নিকট হৃষ্টচিত্তে সেই বালির পিণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি ভরতের পিণ্ড গ্রহণ করেন নাই। সীতাদেবী স্বর্গীয় রাজাকে ভরতের পিণ্ডদানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে "আমি পিশাচিনী কৈকেয়ীর অসম্ভব বর প্রার্থনায় অসন্তুষ্ট হইয়া মধ্যম পুত্রের পিণ্ডদান অগ্রাহ্য

করিয়া অভিসম্পাদ করিয়াছি, অতঃপর আমার মনস্তাপের জন্য কোন পিতৃপুরুষ কোন মধ্যম পুত্রের পিণ্ডগ্রহণ করিবে না।

নারী লক্ষণ সংগ্রহ।

সকল তীর্থের ও সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ধর্ম্ম। এই সংসার ধামে সকল প্রকার তীর্থ ও ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিয়া মনুষ্যগণকে তাহাদের শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোগ প্রদান করিয়া থাকে। স্ত্রী সুলক্ষণা হইলে গৃহী নিরন্তর সুখভোগ করিতে পারেন। অতএব সুখ সমৃদ্ধির জন্য প্রথমে স্ত্রীলোকের লক্ষণ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেহ, দেহের আবর্ত্ত, গন্ধ, কান্তি, অন্তঃকরণ স্বর, গতি এবং বর্ণ পণ্ডিতেরা লক্ষণের এই অষ্টবিধ স্থান পরীক্ষা করেন। পদতল হইতে কেশ অবধি সমস্ত অবয়ব রমণীজাতির অঙ্গ লক্ষণের উত্তম স্থান। স্ত্রীলোকের স্নিগ্ধ, মাংসল কোমল সমবিন্যস্ত স্বেদহীন উষ্ণ ও রক্তবর্ণ পদতল বহুভোগের সূচক বলিয়া জানিবেন। রুক্ষ, বিবর্ণ, কর্কশ, খণ্ডিত প্রতিবিম্ব (ভূমিতে যাহার দাগ সম্পূর্ণভাবে পড়ে না) সূর্পাকৃতি এবং বিশুষ্ক পদতল দুঃখ দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। চক্র স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মীন এবং আতপত্র রেখা যাহার পদতলে থাকে সে রাজপত্নী হয়। যে রমণীর পদতলে ঊর্দ্ধরেখা মধ্যমাঙ্গুলির সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সুখভোগ হয়। মুষিক, সর্প এবং কাকের ন্যায় রেখা দুঃখ দরিদ্রের সূচক। উন্নত, মাংসল ও বর্ত্তুল অঙ্গুষ্ঠ অতুলনীয় সুখভোগের সূচক। বক্র, হ্রস্ব এবং চেপ্টা অঙ্গোষ্ঠ সুখ সৌভাগ্যের বিনাশক। বিশাল অঙ্গুষ্ঠ হইলে বিধবা হয়, আর দীর্ঘাঙ্গুষ্ঠা নারী দুর্ভাগা হইয়া থাকে। ঘন সন্নিবেশ সমুন্নত কোমল অঙ্গুলিই প্রশস্ত। দীর্ঘ অঙ্গুলি হইলে কুলটা এবং কৃশ অঙ্গুলি হইলে অতি নির্ধনা হয়। শাস্ত্রে প্রকাশিত আছে স্ত্রীভাগ্যে ধন

ও পুরুষ ভাগ্যে সন্তান হইয়া থাকে। হ্রস্ব অঙ্গুলি অল্প আয়ুর লক্ষণ, এবং কুটিল অঙ্গুলি হইলে কুটিল ব্যবহারযুক্তা হয়। চেপ্টা অঙ্গুলি হইলে দাসী হয়। বিরলাঙ্গুলি দরিদ্রের চিহ্ন বলিয়া জানিবে। পদাঙ্গুলিদ্বয় যদি পরস্পর উপর্য্যুপরি আরূঢ় হয়, তবে সে রমণী পতিকে বিনষ্ট করিয়া পরের দাসী হইয়া থাকে যে রমণীর গমনকালে ভূমি হইতে ধূলি উত্থিত হয় যে নিশ্চয় কুলক্ষয় বিনাশিনী পাংশুলা হইয়া থাকে। যে রমণীর গমন সময়ে কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমি স্পর্শ করে না, সে এক স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া দ্বিতীয় স্বামী পরিগ্রহ করে। যাহার অনামিকা অঙ্গুলি ভূতল স্পৃষ্ট না হয়, সে দুই স্বামীকে নিহত করে, আর যাহার মধ্যমাঙ্গুলি ভূতলস্পর্শ না করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে। অনামিকা এবং মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলি যাহার নাই অথবা ক্ষুদ্র, সে নারী পতিহীনা হয়। যাহার তর্জ্জনী অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠের সহিত একেবারে মিলিত, সে কন্যাকালেই কুলটা হয়। স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ ও ও সুবৃত্ত পদনখ শুভসূচক। স্ত্রী লোকের উন্নত, স্বেদহীন, কোমল, মসৃন, মাংসল এবং শিরাবিহীন পাদপৃষ্ঠ রাজ্ঞীত্বের সূচক। মধ্য নম্র চরণপৃষ্ঠ দারিদ্রের আর যাহার চরণপৃষ্ঠ শিরা বহুল, সে নিরন্তর ভ্রমণশীলা হয়। যে নারীর পাদপৃষ্ঠ রোমশ, তাহাকে দাসী হইতে হয়। মাংসবর্দ্ধিত পাদপৃষ্ঠ দুর্ভাগ্যের চিহ্ন। শিরাশূন্য সুবর্ত্তুল গূঢ়গুলফ কল্যাণজনক। যাহার গুলফ্ (গোড়ালী) শিথিল ও দেখিতে নিম্ন তাহাকে দুর্ভাগ্যবতী হইতে হয়। পাষ্ণিভাগ সমান হইলে সেই রমণী কল্যাণভাগিনী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর পাষ্ণি স্থূল সে দুর্ভাগ্যবতী হয়। পাষ্ণি উন্নত হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর জঙ্ঘাযুগল সম, স্নিগ্ধ, রোমশূন্য, শিরাবর্জ্জিত, ক্রমবর্ত্তুল ও অতি মনোরম হয়, সে নিশ্চয় রাজমহিষী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক একটী রোমকূপে এক একটী রোম বিদ্যমান থাকিলে সেই স্ত্রী রাজপত্নী হয়, দুইটি রোমও সুখের চিহ্ন, কিন্তু যাহার রোমকূপে তিন তিনটী রোম

থাকে, তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হইতে হয়। যাহার জানুদ্বয় বর্ত্তুল ও মাংসল সে সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত। জানু মাংসহীন হইলে সেই নারী স্বৈরিণী হইয়া থাকে। অবর্ত্তুল জানু দারিদ্র্যের চিহ্ন। যাহার উরু যুগল শিরাশূন্য, হস্তিশুণ্ডাকার, ঘন, মসৃণ, সুগোল ও রোমশূন্য সে নারী রাজমহিষী হইয়া সুখভোগ করে। রোমশ উরু বৈধব্যের চিহ্ন। উরু চেপ্টা হইলে সেই রমণী দুর্ভাগ্যবতী হয়, মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট উরু মহাদুঃখের চিহ্ন এবং কঠিন ত্বক্‌বিশিষ্ট উরু দারিদ্র্যের চিহ্ন। যে নারীর কটি চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলি প্রমাণ সমুচ্চ নিতম্ব শোভিত ও চতুরস্র, সেই নারী সুখভাগিনী হয়। নারী জাতির কটিদেশ নিম্ন, চিপিট, দীর্ঘ, মাংসবর্জ্জিত, কর্কশ ও হ্রস্ব ও রোমশ হইলে দুঃখ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। নারীজাতির নিতম্ব উচ্চ, মাংসল ও বিশাল হইলেই প্রশস্ত। যে রমণীর স্ফিকযুগল কপিত্থ ফলের ন্যায় বর্ত্তুল, মাংসল, ঘন ও বলিবর্জ্জিত, তাহার প্রীতি ও সুখবৃদ্ধি হয়। বস্তি বিপুল, কোমল ও অল্প উন্নত হইলে সুলক্ষণ জানিবে। যে নারীর নাভী দক্ষিণাবর্ত্ত ও গম্ভীর, সে সুখসম্পদভাগিনী হয়। নাভী ব্যক্তগ্রন্থি, উত্তান ও বামাবর্ত্ত হইলে কুলক্ষণ জানিবে। যে নারীর কুক্ষী বিশাল, সে সুখ-ভাগিনী এবং বহু পুত্রপ্রসবিনী হয়। যাহার কুক্ষি মণ্ডুকের জঠরের ন্যায়, তাহার গর্ভজাত পুত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুক্ষি উন্নত হইলে সেই নারী বন্ধ্যা হইয়া থাকে। বলিবিশিষ্ট কুক্ষি হইলে প্রব্রজিতা হয় এবং কুক্ষি আবর্ত্তবিশিষ্ট হইলে সে দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। নারীজাতির পার্শ্বদেশ সম, মাংসল মগ্নাস্থি, কোমল ও সুদৃশ্য উহা সুখসূচক এবং যাহার পার্শ্বযুগল দৃশ্যশিরা, উন্নত ও রোমশ হয়, সে বন্ধ্যা, দুশ্চরিত্রা ও দুঃখিনী হইয়া থাকে। যাহার জঠরাদেশ ক্ষুদ্র, শিরাশূন্য ও মৃদুত্বকবিশিষ্ট, সে ভোগাঢ্যা হয় ও মিষ্টান্ন সেবন করে। উদর কুম্ভ, কুষ্মাণ্ড, মৃদঙ্গ ও যবাকৃতি হইলে তাহা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না; তাদৃশ উদর দুঃখ দারিদ্র্যের লক্ষণ; যে রমণীর জঠর লম্বিত, সে শ্বশুরঘাতিনী ও দেবরঘাতিনী হয়। মধ্যভাগ ক্ষীণ হইলে

সেই স্ত্রী সুখ সৌভাগ্যশালিনী হয় এবং যাহার মধ্যভাগ ত্রিবলিবিশিষ্ট, সে ভোগসম্পন্না হইয়া থাকে। স্তনদ্বয় ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও সম হইলেই প্রশস্ত। স্থূলাগ্র, বিরল ও শুষ্ক স্তনদ্বয় দুঃখের চিহ্ন। যে রমণীর স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, সে পুত্রবতী হইয়া থাকে এবং বামে উন্নত হইলে সৌভাগ্যসুন্দরী কন্যা প্রসব করে সন্দেহ নাই। যাহার স্তন ঘটীযন্ত্রস্থ, ঘটীতুল্য সে স্ত্রী দুঃশীলা হইয়া থাকে। সুদৃঢ়, শ্যামবর্ণ ও সুবর্তুল চুচুকদ্বয়ই শুভ চিহ্ন। যাহার চুচুকদ্বয় অন্তর্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ সে নারী চিরদিন ক্লেশভোগ করে। যে স্ত্রীর জক্রযুগল পীবর সে বহু ধনধান্যবতী হয় এবং জত্রু শ্লথাস্থি, বিষম নিম্ন হইলে দুঃখভাগিনী হয়। যাহার স্কন্ধযুগল অকৃশ, অদীর্ঘ অনত ও অবদ্ধ সে সুখ ভাগ্যবতী হয় এবং যাহার স্কন্ধ বক্র; স্থূল ও রোমশ, তাহাকে বিধবা হইয়া পরের দাসীত্ব করিতে হইয়া থাকে। যে নারীর বাহুযুগল রোমশূন্য, শিরাশূন্য, গূঢ়গ্রন্থি, কোমল ও গূঢ়াস্থি, সে ভাগ্যবতী ও সুখভাগিনী হয়। বাহুদ্বয় হ্রস্ব হইলে দুর্ভাগ্যের অধিনী হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও অন্যান্য অঙ্গুলি সমূহ একত্র করিয়া সম্মুখে আকুঞ্চিত করিলে যাহদের করদ্বয় কোমল কোরকের মত হয় সেই হরিণলোচনাগণের বহু সুখভোগ হইয়া থাকে। যে নারীর হস্ততল কোমল, মধ্যোন্নত রক্তবর্ণ, অবক্র ও সুন্দর এবং যাহার হস্ততল প্রশস্ত অল্প রেখা বিদ্যমান আছে সেই নারী চিরদিন সুখভোগ করে। স্ত্রীলোকের বামহস্তে গজ বাজী, বৃষ, প্রাসাদ ও বজ্রাকৃতি রেখা বিদ্যমান থাকিলে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে তীর্থপর্য্যটক হয়। যে রমণীর করতলে শকট বা যুগ কাষ্ঠাকৃতি রেখা দৃষ্টি হয়, সে কৃষকের ভার্য্যা হইয়া থাকে। যাহার করতলে চামর, অঙ্কুশ ও ধনরেখা বিদ্যমান থাকে সে রাজমহিষী হয়। যে রমণীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বহির্গত হইয়া একটী রেখা কনিষ্ঠার মূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, সে স্বামীঘাতিনী হয়। তাদৃশী রমণী সর্ব্বদা পরিত্যজ্যা। যে নারীর করতলে শৃগাল, মণ্ডুক, অহি, কঙ্ক, বৃক, বাসব, বৃশ্চিক, মার্জ্জার ও উষ্ট্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে চিরদিন দুঃখ

ভোগ করিয়া থাকে। অঙ্গুলি সমূহ অত্যন্ত হ্রস্ব, কৃশ, বিরল ও বক্র হইলে চিররুগ্না হয়। যে সকল নারীর নখসমূহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু বিদ্যমান থাকে। তাহারা প্রায়ই স্বৈরিণী হয়। পুরুষের নখে ঐরূপ চিহ্ন থাকিলে তাহাকে চিরদুঃখী হইতে হয়। যে নারীর পৃষ্ঠদেশ রোমশ সে নিশ্চয়ই বিধবা হয়। যাহার চিবুক অঙ্গুলিদ্বয় পরিমিত, সুকোমল, পীন ও বৃত্ত সে সুখ সৌভাগ্যবতী হয়। কপোল যুগল রোমশ, কর্কশ, নিম্ন ও মাংসহীন হইলে উহা অপ্রশস্ত, যাহার মুখ পিতার মুখের ন্যায়, সে নারী সুখভাগিনী হয়। অধর পাটলবর্ণ, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ ও মধ্যভাগে রেখাঙ্কিত হইলে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। দন্তসমূহ গোদুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, দ্বাত্রিংশৎ পরিমিত নীচে ও উপরে সমভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত হইলে উহা শুভসূচক। যাহার দন্ত পীতবর্ণ, শ্যাব, স্থূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্তাকৃতি ও বিরল, তাহাকে চিরদিন দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দন্ত বিকট হইলে কুলটা হইয়া থাকে। যাহার জিহ্বা শ্বেতবর্ণ, জলে তাহার মৃত্যু হয়। জিহ্বা শ্যামবর্ণ হইলে সে নারী বিবাদপ্রিয় এবং জিহ্বা মাংসল হইলে দরিদ্র হয়। জিহ্বা লম্বা হইলে অভক্ষ্য ভক্ষিণী এবং বিশাল হইলে সেই নারী প্রমাদভাগিনী হয়। হাস্যকালে যাহার দশনসমূহ বহির্গত না হয়, গণ্ডদেশ ঈষৎ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এবং চক্ষুদ্বয় নিমীলিতনা হয় সেই নারী সুলক্ষণা, সমবৃত্ত সমপুট ও স্বল্প ছিদ্র বিশিষ্ট নাসিকা শুভসূচক। যাহার নয়ন গোলাকার সে নিশ্চই কুলটা হয়। যে নারী মেষাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেকরাক্ষী, তাহারাই চিরদুঃখ ভোগ করে।' যে নারীর বামচক্ষু কাল সে পুংশ্চলী হয়। কিন্তু দক্ষিণচক্ষু কাল হইলে বন্ধ্যা হইয়া থাকে। অমিলিত, সুবর্ত্তুল, কোমল রোমবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ও কার্ম্মুকাকার ভ্রূযুগলই প্রশস্ত। ললাটে স্বস্তিরেখা থাকিলে সে নারী রাজমহিষী হইয়া থাকে। যে নারীর মস্তক লম্বিত সে দেবরঘাতিনী হয়। মস্তক রোমশ, উন্নত ও বিশাল হইলে চিররোগিণী হইয়া থাকে; সরল সীমন্তদেশই শুভসূচক। মস্তক

স্থূল হইলে সে নারী বিধবা হয় এবং দীর্ঘ হইলে কুলটা হইয়া থাকে। যাহার কেশ অলিকুলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ, কোমল ও কিঞ্চিৎ অকুঞ্চিততাগ্র, সেই নারী সুখভাগিনী হয়। স্ত্রীজাতির বাম কপালদেশে রক্তবর্ণ মশকরেখা থাকিলে, সে মিষ্টান্ন ভোজের পাত্রী হইয়া থাকে। যে নারীর দক্ষিণ স্তনে রক্তবর্ণ তিলক বা পদ্মাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার গর্ভে চারি কন্যা ও তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। যাহার বাম স্তনে তিলক বা পদ্মাদি চিহ্ন থাকে, তাহার একটী পুত্র সন্তান জন্মে। গুহ্যের দক্ষিণভাগে তিলক থাকিলে রাজমহিষী বা রাজমাতা হয়। নাসিকার অগ্রদেশে কৃষ্ণবর্ণ মশক চিহ্ন থাকিলে সে নারী পতিঘাতিনী হয়! যে নারী প্রসুপ্তা· বস্থায় দন্তে দন্তে কট কট শব্দ বা প্রলাপ করে, সে অলক্ষণা বলিয়া গননীয়। কটিদেশে অবর্ত্ত থাকিলে, সেই নারী দুঃশীলা হয়। নাভিতে অবর্ত্ত থাকিলে পতিব্রতা হইয়া থাকে, এবং পৃষ্ঠে অবর্ত্ত থাকিলে পতি· ঘাতিনী বা কুলটা হয়। বিশ্বেশ্বরের কৃপাতেই গৃহীগণ সুশীলা, সাধ্বী, সুলক্ষণা স্ত্রীলাভ করিয়া থাকে। যে নারী সুলক্ষণা হইয়া ও দুশ্চরিত্রা হয়, সে কুলক্ষণার শিরোমণি এবং যে অলক্ষণা হইয়াও পতিব্রতা হয়, সে সর্ব্বসুলক্ষণের আধার সন্দেহ নাই। যে সকল স্ত্রী ইহজন্মে কুমারি· গণকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে, পরজন্মে তাহারাই সুরূপা ও সুলক্ষণা হয়। জন্মান্তরে যে সকল রমণী ভক্তিসহকারে ভবানীদেবীর অর্চ্চনা করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে সুশীলা ও পতি বশবর্ত্তিনী হয়। যাহাদের প্রতি স্বামী অনুকূল থাকেন, সেই সকল নারীই অবলীলাক্রমে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ করিতে পারে। সুলক্ষণা পরীক্ষান্তে নারী গ্রহণ করা সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ নামে একটী প্রাচীন গল্প প্রকাশিত হইল। একদা মহর্ষি নারদ বীণা যন্ত্রে হরিগুণ গানে বিভোর হইয়া পিনোলা নদীর তীর দিয়া গমন করিতেছিলেন, হটাৎ তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য হওয়ায় বিশ্রাম

হেতু একটী নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে ঐ নদীকূলোপরি স্বয়ং ব্রহ্মা স্তূপিকৃত কুশরাশি স্থাপনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া কি করিতেছেন। নারদমুণি ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের দর্শন পাইয়া মনের আনন্দে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং দেখিলেন যে তিনি ঐ কুশরাশির মধ্য হইতে এককালীন দুই গাছি কুশাকর্ষণ করিয়া গাঁইট বন্ধনপূর্ব্বক নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। ব্রহ্মার ঈদৃশ ব্যাপার দর্শনে তাহার কারণ নির্দ্দেশ হেতু নারদ আর অগ্রসর না হইয়া সেই স্থানেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করিতে লাগিলেন, এইরূপে বহুক্ষণ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়াও ইহার হেতু নির্দ্দেশে অক্ষম হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি এই নির্জ্জন জনশূন্য তটে বসিয়া কি করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছে, অতএব কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মা নারদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অকপটচিত্তে বলিতে লাগিলেন, বৎস! ইহা আর কিছুই নয়, কেবল কোন্ পুরুষের সঙ্গে কোন্ নারী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে কিরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিবে, সেই সকল বিচার করিয়া তাহার সংঘটন করিতেছি, কেননা ইহজন্মে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেইরূপই ফলভোগ করিতে হইবে।

বিধাতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়া তাঁহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার কুশবন্ধন নিক্ষেপ সময় অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাতঃ! আপনি এইমাত্র যে গ্রন্থি প্রদান করিলেন ইহার মধ্যে স্ত্রীই বা কে আর পুরুষই বা কে এবং নিবাসই বা কোথায়? ব্রহ্মা স্নেহসহকারে উত্তর করিলেন, বৎস! যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ উহাদের দুএরই মধ্যে কেহই এক্ষণে জন্মগ্রহণ করে নাই। তাঁহার নিকট এরূপ উত্তর পাইবেন তাহা নারদ কখন আশা করেন নাই; সুতরাং তাঁহার কৌতূহল শতগুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে

স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যখন এক্ষণে ইহারা জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন যাহাতে ইহাদের দুএর মধ্যে পরস্পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে না পারে তাহার নিমিত্ত আমায় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যদ্যপি সফল হয়, তাহা হইলে জানিব যে ইনি যে সকল গ্রন্থি নিক্ষেপ করিতেছেন বা পরে করিবেন উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা হইল ইহারা কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিবে? অন্তর্যামী বিধাতা নারদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, বৎস! অধিক কিছুই বলিবার নাই, তবে এইমাত্র স্থির জানিও যে বালকটী গৌরাষ্ট্র রাজার পুত্ররূপে আর কন্যাটী জম্বুনাদ্বীপের অধিপতি মহারাজ চন্দ্রশেখরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে। নারদ বারম্বার নানাপ্রকার বাক্যের ছলে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করেনা সে আপন মনে একই ভাবে চলিতে থাকে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, গত হইল কিন্তু সেই বালক বালিকার বিষয় একবারও নারদের মনকে অধিকার করিল না। কোন সময় বিষ্ণুলোকে নারদ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া সেই কুশগ্রন্থির বিষয় স্মৃতিপটে উদিত হইল। তখন নারদ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজা গৌরাষ্ট্রের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন এবং অবগত হইলেন যে রাজা এতাবৎকাল অপুত্রক ছিলেন সম্প্রতি একটী সর্ব্বসুলক্ষণ পুত্রলাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনায় মনের উল্লাসে নানাপ্রকার দান ধ্যান করিতেছেন। ছদ্মবেশী নারদ মনে মনে ভাবিলেন যে ব্রহ্মা যথার্থ বলিয়াছিলেন যে এই বালক বালিকা অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। এইরূপে বালকের তত্ত্ব অবগত হইয়া জম্বুনাদ্বীপাধিপতির নিকট বালিকার তত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক দিবস মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার প্রিয়তম মহিষীর সহিত উদ্যানের

সরসীতটে সুশীতল মরুত হিল্লোলে বসিয়া সুখানুভব করিতেছেন এমন সময় একটী শ্লোক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। জিস্‌কা ঝুটামে এত্বে মজা না জানে সাচ্চামে কেয়া হ্যায়।” এইরূপ শ্রুত হইয়া মহারাজ তৎক্ষণাৎ একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন যে যিনি ঐরূপ বলিলেন, তাঁহাকে আমার নিকট সমাদরে লইয়া আইস। ভৃত্য রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়া এক দীর্ঘকায় শুষ্ককলেবর দীর্ঘ জটাবিশিষ্ট সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত শ্লোকটী অনুমান করিয়া তাঁহাকে রাজ আজ্ঞা জ্ঞাপন করাইলেন। সন্ন্যাসীও বিনা আপত্তিতে তাহার সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই তেজপুঞ্জ শুষ্ককায় সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া দম্পতিদ্বয় যথা বিহিত বিধানে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন।

ক্রমে নানাপ্রকার কথোপকথনের পর সন্ন্যাসী জানিতে পারিলেন যে রাজার অদ্যাপি কন্যা হয় নাই, তখন তিনি বলিলেন মহারাজ! এই আসার সংসার স্বভাবতঃ শোক দুঃখেই পরিপূর্ণ। ইহার কি বিচিত্রগতি, ধনীই হউন আর নির্ধনীই হউন ভবিষ্যত উন্নতির আশা চেষ্টা করিয়া সকলেই এ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন এমন কি আমাদিগকেও নানাপ্রকার প্রলোভনে মোহিত করিয়াছে এরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইবেন না যিনি আশার মোহময়ী শক্তিতে ভুলেনা। অতএব রাজন্! আপনি সকল দুঃখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই সর্ব্বশক্তিমান স্বেচ্ছাময় শ্রীহরির আরাধনা করুন। তাঁহার কৃপা হইলে আপনার অদৃষ্টে সন্তানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। প্রমানস্বরূপ দেখুন সমুদ্রমন্থণকালে স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু মহাদেব কালকুট বিষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র। এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে ভাগ্যই সর্ব্বত্র বলবান্ হয়, বিদ্যাতে বা শক্তিতে কিছুই হয় না দৃষ্টান্তস্বরূপ বিচার করুন হরিহর উভয়ে তুল্য হইয়া এক যাত্রায় পৃথক ফললাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যালাপের পর সন্ন্যাসী বিদায় প্রার্থনা করিলে মহারাজ নানাছলে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এমন সময় রাজ্ঞী অতিথি সৎকার হেতু পান ভোজনের নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী আয়োজন-পূর্ব্বক স্বহস্তে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, যোগীবর! ভাগ্যক্রমে অদ্য আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি কৃপাদানে অদ্য আতিথ্যস্বীকার করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সন্ন্যাসীর ইচ্ছা না থাকিলেও রাণীর সেই অলৌকিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার বাৎসল্যভাব অবলোকনে প্রীত হইয়া পিতৃবাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন মাতঃ! তোমার ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই কথা বলিয়া স্বীয় কুমণ্ডল হইতে একটী সুপক্ক ফল গ্রহণপূর্ব্বক মহিষীকে প্রদান করিয়া বলিলেন জননী! আমার এই ফলটী অতি গোপনে শুদ্ধচিত্তে ভক্ষণ করিবেন আশীর্ব্বাদ করি আমার এই ফলভোজনের ফলস্বরূপ আপনি শীঘ্রই এক পরম রূপলাবন্যময়ী পদ্মপলাশলোচনা কন্যার মুখদর্শন করিবেন।

রাণী সন্ন্যাসীপ্রদত্ত সেই অমূল্য ফলপ্রাপ্ত এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দৈবশক্তিকে ধন্য, কেননা অসম্ভবকে মূহুর্ত্তেক মধ্যে দৈব ব্যতিত কে সংঘটন করিতে পারে। পুত্রমুখ দর্শন আশে এতাবৎকাল কতবার ব্রত করিলাম এক নিমিষের জন্য কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি গর্ত্তবতী হইব কিন্তু জানিনা আজ কোন দেব কোনছলে সন্ন্যাসীরূপে অতিথি হইয়া আমার আশা বলবতী করাইল। এই মুণিপ্রদত্ত ফলটি ভক্ষণ করিলে আমি কন্যার মুখদর্শন করিব সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া মনের সুখে পুনরায় পতিসনে মিলিত হইলেন!

কালপ্রভাবে রাণীর গর্ত্তলক্ষণ প্রকাশ পাইল, গগণমণ্ডলস্থ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখিয়া একবিন্দু জলের আশায় চাতকপক্ষী যেরূপ আনন্দিত হয় মহা-

রাজ চন্দ্রশেখর, মহিষীর গর্ভলক্ষণে সন্তানের মুখদর্শন আশে সেইরূপ দিন গনণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যথাসময়ে রাণী এক সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যারত্ন প্রশব করিলেন, তাঁহারা আশাপথের পথিক হইয়া কন্যালাভ করিলেন বলিয়া ঐ কন্যার নাম আশাময়ী রাখিলেন।

আশাময়ী দিন দিন মাতৃস্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রাজগৃহের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। নারদের মনে সদাসর্ব্বদা এই বালক বালিকাদের পরিণয় বিষয় জাগরূপ ছিল, তিনিও যথাসময়ে নানাবেশে রাজভবনে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং আশাময়ীর সুন্দর্য্যমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু ইহাদের উভয়েবর মধ্যে যাহাতে কোনরূপ প্রকারে পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ না হয় সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কালপ্রভাবে আশাময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, রাজা চন্দ্রশেখর নানাস্থানে সর্ব্বসুলক্ষণ সুশ্রী পাত্র অনুসন্ধানার্থে ঘটকদিগকে নিযুক্ত করিলেন। নারদঋষি সদাসর্ব্বদা নানাবেশে বালক বালিকাদের পিতা মাতার নিকট গমনাগমন-পূর্ব্বক বিবিধপ্রকার উপদেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না কিন্তু নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন। ঘটকগণ স্ব স্ব দক্ষতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া ভারতের নানাস্থানে যাত্রা করিলেন। কেহবা মহারাজ চন্দ্রশেখরের সমকক্ষ রাজার পুত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত করিবার জন্য দিগ্‌দিগান্তর হইতে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। জম্বুদ্বীপাধিপতি ঐ সকল সংবাদ স্বীয় মহিষীকে শ্রবণ করাইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এইরূপে আশাময়ীর সুন্দর্য্য ভারতের সর্ব্বস্থানেই প্রকাশিত হইল। মহিষী সকল পাত্রের গুণাগুণ অবগত হইয়া প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হেতু তাঁহার অধীনস্থ রাজা গৌরাষ্টের পুত্রকেই মনোনীত করিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর সন্ন্যাসীর উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া গোপনপূর্ব্বক রাণীকে নানাপ্রকার শান্তনা করিতে লাগিলেন যে, রাজা গৌরাষ্ট আমার অধীনস্থ, অন্যান্য প্রজাগণ আমায় যেরূপ করপ্রদান করে, তিনিও তদ্রূপ

আমায় কর দিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার পুত্রকে আমি কন্যা সম্প্রদান করিলে আমার মানের হানি হইবে। রাজা হাস্তদ্বীপাধিপতি সকল বিষয়ে ধনে, মানে, কুলে, আমার সমকক্ষ এবং তাহার একমাত্র সুশ্রী পুত্রকে আমি মনোনীত করিয়াছি, প্রাণের আশাময়ীকে ঐ পাত্রের সহিত সম্প্রদান করিতে পারিলে আমার মান ও গৌরব উজ্জ্বল হইবে।

এতৎশ্রবণে রাণী রাজসমীপে নানাপ্রকার যুক্তিতর্ক করিয়া স্বীয় প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! নারীজাতির সর্ব্বপ্রকার সুখ দুঃখ একমাত্র পতির উপর নির্ভর করে। হাস্তদ্বীপাধিপতি রাজা উত্তালপাদ স্বয়ং বিদ্যা, বুদ্ধি, ও ঐশ্বর্য্যে শোভিত সন্দেহ নাই কিন্তু লোকমুখে শুনিতে পাই তাঁহার একমাত্র পুত্রটী মাকালফলের ন্যায় সুশ্রী এবং শিমুল ফুলের ন্যায় নির্গুণ। কথিত আছে যে ধনবান ব্যক্তিদিগের পুত্রেরা প্রায়ই বিদ্যা ও বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে, ঐ সকল পুত্র যখন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়, তখন তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, ভাল মন্দ কোন বিষয় দৃকৃপাত করেনা এমন কি স্বীয় জন্মদাতা পিতা মাতাকেঁও ঘৃণা করে আপন পত্নীকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে আশক্ত হয়। চাটুকারদিগের প্রলোভনে মান সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট করে, সেই সকল ব্যক্তি নিজেই যখন সুখী হইতে পারেনা তখন কিরূপে আপন পত্নীকে সুখী করিবে?

আমার আশাময়ী আপনার একমাত্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, তখন ঐশ্বর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে মেহের আশা সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয় সেইরূপই প্রার্থনা করিতেছি। গৌরাষ্ট্র রাজার সর্ব্বগুণসম্পন্ন কোটীকন্দর্প অনুপম রূপলাবণ্য পুত্র সম আর দ্বিতীয় দেখিতেছি না। স্বামীন! যদ্যপি আমার প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে গৌরাষ্ট রাজপুত্রের সহিত আশার বিবাহ স্থির করুণ নচেৎ আপনার ইচ্ছানুরূপ যাহা ভাল বুঝিবেন সেইরূপই করিবেন দাসীর মতামতের কোন আবশ্যক করেনা।

মহারাজ চন্দ্রশেখর মহিষীর যুক্তপূর্ণ উপদেশ বাক্যে মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু নারদের কুহকে পতিত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বসঙ্কল্প অনুসারে হাস্তদ্বীপাধিপতির পুত্রের সহিত আশাময়ীর শুভবিবাহ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত করিলেন। সেই দিবস হইতে রাজ্যমধ্যে উৎসবের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহিষী মহারাজের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। কর্ম্মসূত্র প্রজাপতির আজ্ঞায় রাণীর সহায় হইল, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতিত কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। একদিকে নারদ মুণি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে গৌরাষ্ট্র রাজার পুত্রের সহিত বিবাহ না হয়, অপর দিকে কর্ম্মসূত্র মহিষীর সহায় হইয়া উক্ত রাজপুত্রের সহিত যাহাতে বিবাহ হয়, এইরূপ প্রকারে তাহাদের উভয়ের মনোমধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

মহিষী রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বুদ্ধিবলে স্বীয় কন্যার একখানি অলেখ্য সহিত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অতি গোপনে গৌরাষ্টরাজার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র সেই পত্রে রাজ্ঞীর নানাপ্রকার উৎসাহ বাক্যে আরও যৌবন স্বভাব হেতু রাজকন্যার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করিলেন।

এদিকে হাস্তদ্বীপাধিপতি বিবাহের দিন সমাগত দেখিয়া স্বীয় সৈন্য সামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া পুত্রের সহিত জম্বুনাদ্বীপাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর ভবনে অতি সমারোহে বিবাহের জন্য শুভযাত্রা করিলেন, তখন নারদঋষির আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি একবার পাত্র ও একবার পাত্রীর বাটীতে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিবাহ দিবসে হাস্তদ্বীপাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের শুভাগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় রাজধানীর প্রান্তভাগে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বিশ্রামস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। হাস্তদ্বীপাধিপতিসহ সকলেই বিশ্রামের পর জম্বুনা-দ্বীপের মনোমুগ্ধকর স্থান সকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নকালে তিমিরবসনে অবগুণ্ঠণবতী হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া গৌরাষ্ট্ররাজপুত্র আশায় পূর্ণহৃদয়ে চন্দ্রশেখরের ভাবি উত্তরাধিকারিণীর পাণিগ্রহণে উত্তেজিত হইলেন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজ্ঞীর উপদেশ মত রাজধানীর প্রান্তভাগে নদীর তটে ষষ্টীদেবীর আলয়ের সন্নিকটে উপস্থিত হইবার সময় পথিমধ্যে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন নারদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কিরূপ প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হয় উহা দর্শন ইচ্ছায় রাজধানীতে বিচরণ করিতে ছিলেন। সম্মুখে হটাৎ গৌরাষ্ট্ররাজার পুত্রকে তথায় অবলোকন করিয়া আপন গতিরোধ করিলেন, রাজপুত্র নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি তাহার সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপে অবগত হইলেন যে রাজকন্যার সহিত সেই দিন তাহার গুপ্তভাবে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে, যদিচ তাহার ভর্ত্তা মহা সমারোহে তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। তখন চিন্তারূপ তরঙ্গ নারদের মনোমধ্যে আলোড়িত হইয়া ব্যকুল করিল। কি উপায়ে হাস্তদ্বীপাধিপতির পুত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয় উহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষ এক উপায় স্থির করিয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক খগরাজ গড়ুরকে স্মরণ করিলেন।

গড়ুর তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে নারদ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল প্রভু! আমাকে কোন্ আজ্ঞা পালন করিতে হইবে? সেই সময় পিতা পুত্রের যুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্তরীক্ষে দেবগণ, অপ্সরাগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উপস্থিত হইলেন। নারদ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ঐ গৌরাষ্টপতির পুত্রকে অনতিবিলম্বে মনুষ্যের অগম্যস্থান সুমেরুপর্ব্বতের গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আসিতে আজ্ঞা করিলেন!

রাজকন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজভক্ত প্রজাগণ রাজপথগুলি আলোকমালায় ও পুষ্পপতাকাদিতে নানাবর্ণে সুশোভিত করিয়াছিল গৌরাষ্টরাজপুত্র উহাই দর্শন করিতেছিলেন, তাহার অদৃষ্টে কি হইবে কিছুই অবগত

ছিলেন না! এমন সময় হটাৎ গড়ুর তাহাকে ধরিয়া পর্ব্বতের শিখরদেশে উচ্চ গহ্বরে স্থাপনপূর্ব্বক নারদসমীপে যথাযথ নিবেদন করিল।

কর্ম্মসূত্রের গতি কে রোধ করিতে পারে, গড়ুরের বাক্যে নারদের দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে দুঃখিত হইয়া খগপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, গড়ুর আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে তোমায় আর একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। যাহাকে তুমি এইমাত্র পর্ব্বতের গুহার মধ্যে স্থাপন করিয়া আসিলে উহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় করিতে হইবে; যে কোন স্থানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী নয়নগোচর করিবে তুমি স্বীয় বাহুবলে উহা লাভ করিয়া তাহার নিকট রাখিয়া আসিবে। নারদের আদেশমত পক্ষীরাজ গড়ুর আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া নারদের ইচ্ছানুরূপ খাদ্য অন্বেষণ করিতে লাগিল।

নারদ ঋষি এইরূপে নিষ্কণ্টক হইয়া ও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় কাতর হইলেন এবং যাহাতে শুভলগ্নে চন্দ্রশেখরের কন্যার সহিত হাস্যদ্বীপাধিপতির পুত্রের সহিত শুভপরিণয় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতক্ষণ তিমির বসনাবৃত প্রকৃতিদেবী তাঁহার অবগুণ্ঠন উত্তোলনপূর্ব্বক নারদ ঋষির গর্হিত কার্য্যকলাপ অবলোকন করিতেছিলেন, এক্ষণে অতিশয় বিষণ্ণবদনে পুনরায় অবগুণ্ঠিত হইলেন।

রাজমহিষী এতক্ষণ প্রকৃতিদেবীর ভয়ে অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন নাই। এই সময় সুবিধা বুঝিয়া ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে উপাদান সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন উহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন অবশেষে এক উপায় স্থির করিয়া পরিচারিকাকে আদেশ প্রদান করিলেন যে, মহারাজ যেখানেই থাকুক না কেন, তুমি শীঘ্র তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে। আদেশ প্রাপ্ত দাসী রাজসমীপে যথাযথ নিবেদন করিলে, মহারাজ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

সমাগত মহারাজকে রাজ্ঞী সাদর অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! আমি আসাময়ীর শুভ কামনায় বিবাহের সময় ষষ্ঠীদেবীর পূজা মানসিক করিয়াছিলাম অদ্য প্রজাপতির কৃপায় সেই শুভ সময় উপস্থিত। পূজার আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি। মহারাজ চন্দ্রশেখর পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন যে, মহিষীর দেবদেবীর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও বিশ্বাস আছে এই নিমিত্ত তিনি যখন তখন দেবতাস্থানে মানত করেন। যাহা হউক রাণীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি বলিলেন, রাণী! যদি আজ আমি বিবাহকার্য্যে এত ব্যস্ত না থাকিতাম, তাহা হইলে স্বয়ং আমিও তোমার সহিত মিলিত হইয়া দেবীস্থানে গমন করিতাম এক্ষনে পূজার যাহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হও। এইরূপে মহিষীকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি রাজসভায় প্রস্থান করিলেন। রাণী রাজার অনুমতি পাইয়া প্রফুল্লচিত্তে অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে তোমাদের মধ্যে এক জন সত্বর পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া নদীতটে ষষ্ঠীদেবীর আলয়ে লইয়া যাও আর এই যে সুবৃহৎ নৈবেদ্যখানি দেখিতেছ, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া উহা যত্নের সহিত সাবধানে দেবীস্থানে আমার সহিত লইয়া চল।

পূর্ব্ব হইতে রাণী এই নৈবেদ্যখানি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাহার স্নেহের পুত্তলি হৃদয়সর্ব্বস্ব আশাময়ীকে তন্মধ্যে এরূপভাবে লুকাইত রাখিয়াছিলেন যে, কেহই উহার বিন্দুমাত্র অবগত হইতে পারে নাই। যাহাতে অতি সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে পারে এইরূপ প্রকারে একটী ঝুড়ি ঢাকা দিয়া তৎপরে আতপ তণ্ডুল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফলফুল মিষ্টান্ন দ্বারা স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাহকেরা আজ্ঞামাত্র উহা লইয়া গমন করিতে লাগিল এইপ্রকারে মহিষী গুপ্তভাবে স্বীয় কন্যার শুভবিবাহ দিবার নিমিত্ত শুভযাত্রা করিলেন।

খগরাজ গড়ুর নারদের উপদেশমত রাজপুত্রের আহার সংগ্রহের জন্য

এতাবৎকাল আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে ঐ সুবৃহৎ নৈবেদ্যখানি তাহার নয়নগোচর হইল এবং অতি যত্নের সহিত পক্ষ সঞ্চালনে তথায় উপস্থিত হইয়া দৃঢ়রূপে সেইখানি ছোঁ মারিয়া সুমেরু পর্ব্বতোপরি রাজপুত্রের ক্ষুধা নিবারনার্থ উহা স্থাপনপূর্ব্বক গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে স্বয়ং বিধাতা পূর্ব্ব হইতে নরনারীর শুভাশুভ বিচার করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, এতাবৎকাল ঋষিবর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও উহা পণ্ড করিতে সমর্থ হইলেন না। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল।

দিনমনি অস্তাচলে গমন করিলে শুধাংশুদেব গগণের নীল জলদজালের মধ্যে তারকারাজি পরিবেষ্টিত হইয়া বসুধাকে শুক্লবস্ত্রে সুশোভিত করিলেন, আহা নিয়মের কি বিচিত্রগতি! গৌরাষ্ট রাজপুত্র সেই জনশূন্য উচ্চ পাহাড়ের গহ্বরে কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন হতাশপ্রাণে চন্দ্রালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহারই চেষ্টায় চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং আপন অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ এই অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হওয়ায় তিনি বিস্মর বিস্ফারিতনেত্রে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঐ ভোজ্য সামগ্রী সকল দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

আশাময়ী বহুক্ষণ অবধি আচ্ছাদিত থাকায় এ বিষয়ের কিছুই জানিতে পারিল না তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কোনরূপ জনবর শ্রুতিগোচর না হওয়ায় ভীতমনে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। রাজপুত্র ঐ নৈবেদ্য মধ্য হইতে বামাকণ্ঠবিনিঃসৃত ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রথমে ভীত হইলেন কিন্তু পরক্ষণেই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই তণ্ডুলরাশি অপসারিত করিয়া দেখিলেন যে এক অনুপম রূপলাবণ্যবিশিষ্ট সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা তন্মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তখন তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবামাত্র স্বর্গ হইতে দেববালাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জন্মাবধি তাহারা কখন পুষ্পবৃষ্টি কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না সুতরাং উহার

কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিরূপে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন এই আশ্চর্য্য ঘটনা জানিবার নিমিত্ত তাহাকে প্রথমেই রাজপুত্র সাদর সম্ভাষণে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশাময়ী এই নির্জ্জন গিরিগহ্বরে যুবরাজের মধুরবচনে অকপটচিত্তে অন্তোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। রাজপুত্র বালিকার মুখনিঃসৃত অমৃতময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনার নিকটস্থ আলেখ্যখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পত্রখানি কাহার বল দেখি? বালিকা অনিমিষ নয়নে বারম্বার উহা অবলোকন করিয়া বলিলেন, আপনি আমার লিপিপত্র কিরূপে কোথায় সংগ্রহ করিলেন আর কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে অবস্থান করিতেছেন? রাজপুত্র তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন, এইরূপে তাহারা উভয়ে পরিচিত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ষষ্ঠী-দেবীর নৈবেদ্য হইতে পূজার মালা উত্তোলনপূর্ব্বক উহা বদল করিয়া গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

মহর্ষি নারদ হাস্তদ্বীপাধিপতির নিকট হইতে পুনরাগমন করিয়া যাহা শ্রবণ করিলেন তাহাতে তাঁহার আর বুঝিবার কিছু বাকি রহিল না তখন তিনি লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনতটে উপস্থিত হইয়া নিজের সন্দেহ মোচনার্থ যোগাবলম্বন করিয়া দেখিলেন যে নবীন দম্পতিদ্বয় পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন গিরিগহ্বর মধ্যে মনের সুখে কথোপকথন করিতেছেন, ঋষিব তখন নিজের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন।

পরদিবস নারদ প্রভাত হইবামাত্র এক বৃদ্ধ গণতকারের বেশে একখানি অতি জীর্ণ পুঁতি হস্তে করিয়া শোকাতুর রাজার সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং দ্বাররক্ষককে বলিলেন যে, গত কল্য অপরাহ্নে রাজকন্যার সহসা অন্তর্হিত হওয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহার উদ্ধার হেতু মহারাজের নিকট সাক্ষাৎ

করিতে আসিয়াছি। দ্বারপাল এই সংবাদ রাজার নিকট প্রদান করিলে তিনি বৎসহারা গাভীর ন্যায় স্বয়ং সেই বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক সভামধ্যে লইয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ নানাপ্রকার বাক্যালাপের পর সভাস্থ মন্ত্রি প্রথমে সেই জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর! গণনা করিয়া দেখুন দেখি রাজকন্যা জীবিত আছেন কি? যদ্যপি তাহাই হয় তাহাহইলে কোন্ স্থানে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন প্রকাশ করিয়া আমাদিগের জীবন দান করুন। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের বিশ্বাস হেতু কতিপয় অশ্রুপাত করিয়া মহারাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন রাজন! আমি দেখিলাম আপনার কন্যা জীবিত আছেন সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতেছি, এতৎশ্রবণে রাজা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে উহা অবগতির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন মহারাজ! আমি গণনায় দেখিতেছি গতকল্য অপরাহ্ণ কালে ষষ্ঠীপূজা দিবার সময় পথিমধ্যে আপনার কন্যাকে পক্ষীরাজ গড়ুর সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে লইয়া গিয়া গৌরাষ্ট্র রাজপুত্রের সহিত তাহার শুভপরিণয় সম্পন্ন করাইয়াছে।

এইরূপ বলিবামাত্র সভাসদ্ সকলেই তাঁহাকে বাতুল স্থির করিলেন এবং তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য রাজাদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই সময় ঐ বৃদ্ধ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, রাজন্! আমার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য জ্যোতিষশাস্ত্র যদ্যপি মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমার বচনও মিথ্যা হইতে পারে, এক্ষণে অনুমতি পাইলে মুহূর্ত্তেই ইহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে পারি। সেই সতেজপূর্ণ বাক্যশ্রবণে সভাস্থ সকলেই পুত্তলিকাবৎ স্থির নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহারাজ কন্যার নিমিত্ত এত অধীর হইয়াছিলেন যে সেই অসম্ভব বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দম্পতিদ্বয়কে দেখিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তে সেই বৃদ্ধ পুনর্ব্বার

গড়ুরকে স্মরণ করিলেন এবং সুমেরু পর্ব্বতের গহ্বরস্থিত দম্পতিযুগলকে নির্ব্বিঘ্নে সভামধ্যে আনিতে অনুমতি করিলেন।

আজ্ঞামাত্র গড়ুর তাহাদের যথাস্থানে উপনীত করিল, এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া সকলেই একদৃষ্টে সেই দম্পতিযুগলের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সেই সময় সুযোগ পাইয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং মনে মনে রাজকন্যাকে "পতিসোহাগী হইয়া ধর্ম্মে মতি রাখিও" এইরূপ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথাসময়ে মহিষীও এই সুসংবাদ পাইয়া বৃদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে গিয়া আর তাঁহার দর্শন পাইলেন না, তখন সকলেই নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন আহা! আমরা অতি মন্দভাগ্য কেননা কন্যার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবানকে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে পারিলাম না।' মহারাজ চন্দ্রশেখর এই সুসমাচার গৌরাষ্ট্র রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং শুভ দিনে শুভলগ্নে মহাসমারোহে উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া কন্যা এবং জামাতা সহ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অতএব মনুষ্যমাত্রেই আপন আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য, কারণ যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন তাহার সেইরূপ ফলাফল বিচার করিয়া ভগবান পুনরায় পরীক্ষার নিমিত্ত এই সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন অতএব সময় থাকিতে ঐশ্বর্য্য সুখে মত্ত হইয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে নিত্য স্মরণ করিবেন। মনে ভাবিবেন না যে ডুব দিয়ে জল খেলে পরে শিবের বাপ না জান্তে পারে। আমরা নিত্য যাহা করিতেছি তাঁহার নিকট প্রত্যহই উহা লিপিবদ্ধ হইতেছে।

কালীঘাট দর্শন-যাত্রা

কলিকাতার সন্নিকটস্থ ভবানীপুরের দক্ষিণ বেলতলার পশ্চিম পীঠস্থানকে কালীঘাট বলে। দক্ষযজ্ঞে সতী, পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে ভবানীপতি শঙ্কর সতীর শোকে বিহ্বল হইলেন এবং ঐ মৃত সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু শঙ্করের অবস্থা দেখিয়া কাতর হইলেন এবং তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত নিজ সুদর্শন চক্রদ্বারা সতীর মৃত দেহ একান্ন খণ্ডে ছিন্ন বিছিন্ন করেন। যে যে স্থানে সতীর মৃত বিচ্ছিনাংশ পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে পুণ্যক্ষেত্র পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। একান্ন পীঠস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

১। হিঙ্গুলায়—সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়, এখানে দেবী কোটণী, ভৈরব ভীমলোচন নামে খ্যাত।

২। শর্করায়—দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়, ভগবতী মহিষমর্দ্দিনী ভৈরব ক্রোধীশ।

৩। জ্বালামুখীতে—জিহ্বা পতিত হয়, ভগবতী অম্বিকা ভৈরব উন্মত্ত।

৪। ভৈরব পর্ব্বতে—উর্দ্ধ ওষ্ঠ থাকায়, দেবী অবন্তী, ভৈরব নম্রকার্ণা নামে বিখ্যাত।

৫। প্রভাসে উদর—দেবী চন্দ্রভাগা ভৈরব বক্রতণ্ড নামে বিরাজমান।

৬। গণ্ডকীতে—দক্ষিণ গণ্ড থাকায় দেবী গণ্ডকী চণ্ডী, ভৈরব চক্রপাণি হইয়া বিরাজিত।

৭। গোদাবরী তীরে—বাম গণ্ড পতিত হয়, এখানে দেবী বিশ্বমাত্রিকা ভৈরব বিশ্বেশ হইয়া আছেন।

৮। অনলে--ঊর্দ্ধ দন্তপুংক্তি থাকায় দেবী নারায়ণী নামে বিখ্যাত।

৯। জলস্থানে—চিবুক থাকায়, দেবী ভ্রামরী বিকৃতাক্ষ ভৈরব নামে অবস্থিতি।

১০। সুগন্ধে—নাসা পতিত হয়, দেবী সুনন্দা, ভৈরব ত্র্যম্বক নামে খ্যাত।

১১। পঞ্চসাগরে—অধোদন্ত পুংক্তি পতিত হইয়াছিল এখানে দেবী বরাহী, ভৈরব মহারুদ্র নামে বিরাজমান।

১২। করতোয়াতটে—বাম কর্ণ পতিত হয়, এখানে দেবী অর্পণা ভৈরব বামন নামে বিখ্যাত।

১৩। মলয়পর্ব্বতে—দক্ষিণ কর্ণ থাকায়, দেবী সুন্দরী ভৈরব সুন্দরানন্দ নামে খ্যাত।

১৪। বৃন্দাবনে -কেশজাল স্থান থাকায়, দেবী কেশজাল উমা, ভূতেশ ভৈরব নামে বিরাজমান। মথুরা হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিতি।

১৫। কিরীটে—দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে বিরাজ করিতেছেন।

১৬। শ্রীহট্টে—গ্রীবা পতিত হওয়ায় দেবী মহালক্ষ্মী ঈশ্বরানন্দ ভৈরব নামে বিখ্যাত।

১৭। কাশ্মীরে—কণ্ঠ পতিত হয় এখানে দেবী মহামায়া ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর নামে বিরাজ করিতেছেন।

১৮। রত্নাবলীতে—দক্ষিণ স্কন্ধ থাকায় দেবী কুমারী ভৈরব অভিরাম কুমার নামে বিখ্যাত।

১৯। মিথিলাতে—বামস্কন্ধ পতিত হয়, দেবী মহাদেব ভৈরব মহোদর নামে বিরাজ করিতেছেন।

২০। চট্টগ্রামে—দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ থাকায়, দেবী ভবানী ভৈরব চন্দ্রশেখর নামে বিখ্যাত।

২১। মানস সরোবরে—দক্ষিণ হস্তার্দ্ধ পতিত হয়, এখানে দেবী দাক্ষায়ণী অমর ভৈরব হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

২২। উজানিতে—কনুই পতিত হয়, দেবী মঙ্গলচণ্ডী ভৈরব কপিলেশ্বর নামে বিরাজমান।

২৩। মণিবন্ধে--মনিবন্ধ, দেবী গাইত্রী ভৈরব সর্ব্বানন্দ হইয়া আছেন।

২৪। প্রয়াগে—দুই হস্তের দশ অঙ্গুলী দেবী ললিতা ভবভৈরব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

২৫। বহুলাতে—বাম হস্ত পতিত হয়, দেবী বহুলা চণ্ডীকাভৈরব ভীরুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

২৬। জনান্ধরে—প্রথম স্তন পতিত হয়, দেবী ত্রিপুরমালিনী ভৈরব ভীষণ হইয়া আছেন।

২৭। রামগিরিতে—দ্বিতীয় স্তন পতিত হয়, দেবী শিবানী চণ্ডভৈরব হইয়া বিরাজমান।

২৮। বৈদ্যনাথে—হৃদয় থাকায়, দেবী জয়দুর্গা নামে ভৈরব বৈদ্যনাথ হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

২৯। কাঞ্চিদেশে—কাঁকালি থাকায়, দেবী দেভ্রা ভৈরব রুরু হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৩০। উৎকলে—নাভি পতিত হয়, দেবী বিমলা নামে ভৈরব জগন্নাথ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

৩১। কালমাধবে—অর্দ্ধ নিতম্ব থাকায়, দেবী কালিকা অসিতাঙ্গ ভৈরব রূপে অবস্থিত।

৩২। নর্ম্মদাতীরে—দেবী শোনাক্ষী ভদ্রসেন ভৈরবরূপে বিরাজ করিতেছেন।

৩৩। নেপালে—জানুদ্বয় পতিত হওয়ায়, দেবী মহামায়া ভৈরব কপালী হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৩৪। কামরূপে—মহামুদ্রা দেবী কামাখ্যা নামে উমানন্দ ভৈরব হইয়া আছেন।

৩৫। মগধে—দক্ষিণ জঙ্ঘা পতিত হয়, এখানে দেবী সর্ব্বানন্দকারী ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিরাজিত।

৩৬। জয়ন্তীতে—বাম জঙ্ঘা থাকায়, দেবী জয়ন্তী ভৈরব ক্রমদীশ্বর রূপে অবস্থান করিতেছেন।

৩৭। ত্রিপুরাতে—দক্ষিণ চরণ পতিত হয়, এখানে দেবী ত্রিপুরা-সুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ হইয়া আছেন।

৩৮। ক্ষীরগ্রামে—দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ থাকায় দেবী যুগাদ্যা ভৈরব ক্ষীর মণ্ডক রূপে বিরাজ করিতেছেন।

৩৯। কালীঘাটে—দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্গুলী থাকায় দেবী কালিকা নামে ভৈরব নকুলেশ হইয়া আছেন।

৪০। কুরুক্ষেত্রে—দক্ষিণ পায়ের গুলফ্, এখানে দেবী বিমলা ভৈরব সম্বর্ত্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

৪১। বক্রেশ্বরে—ভ্রূ মধ্য পতিত হয়, এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনী ভৈরব বক্রনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন।

৪২। যশোহরে—পাণিপদ্ম থাকায়, দেবী যশোরেশ্বরী নামে ভৈরবচণ্ড হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

৪৩। নন্দীপুরে—হার পতিত হয়, এখানে দেবী নন্দিনী ভৈরব নন্দি-কেশ্বর নামে বিখ্যাত।

৪৪। বারানসীক্ষেত্রে—কুণ্ডল পতিত হয়, দেবী বিশালক্ষী ভৈরব কালরূপে অবস্থান করিতেছেন।

৪৫। কন্যাশ্রমে—পৃষ্ঠ পতিত হওয়ায়, দেবী সর্ব্বাণী নিমিষ ভৈরব হইয়া আছেন।

৪৬। লঙ্কায়—নূপুর পতিত হয়, এখানে দেবী ইন্দ্রাক্ষী নামে বিখ্যাত।

৪৭। বিভাসে বাম গুলফ্ পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমরূপা সর্ব্বানন্দ ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৪৮। বিরাটে—পদাঙ্গুলী থাকায়, দেবী অম্বিকা ভৈরব অমৃতরূপে বিরাজমান।

৪৯। ত্রিস্রোতাতে—বাম গুলফ্ থাকায়, দেবী ভ্রামরী ঈশ্বর ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৫০। অট্টহাসে—অধঃওষ্ঠ থাকায়, দেবী ফুল্লরা, বিশ্বেস ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

৫১। শ্রীপর্ব্বতে—তল্প পতিত হওয়ায়, দেবী সুনন্দা ভৈরবানন্দ হইয়া আছেন।

এই কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্গুলী পতিত হইয়াছে, ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, এইস্থান অরণ্যগর্ত্তে নিহত ছিল। এক কপালিক এই অরণ্য মধ্যে বাস করিতেন, একদা সৌভাগ্যক্রমে তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, "তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে তোমার ইষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন, তুমি শীঘ্র তথায় গমন করিলে দর্শন পাইবে এবং তোমার বহুদিনের আশা সিদ্ধ হইবে।" পরদিন প্রত্যূষে কপালিক স্বপ্নাদেশ মত হিংস্রক জন্তু পরিপূর্ণ সেই বিজন অরণ্যের নানাস্থানে পাতি-পাতি অন্বেষণ করিয়া সমস্ত দিন মধ্যে ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি তিনি স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া অমাবস্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে ঐ নিবিড় বনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারই উদ্দেশে স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অরণ্যে

দিবাভাগে মনুষ্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ করিত, সেইস্থানে আজ এই কপালিক নিরস্ত্র হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহার ইষ্টদেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্দ্ধ রজনীতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে পুনর্ব্বার তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে "হে ভক্ত! তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আমি অদূরে একখণ্ড শিলারূপে অবস্থান করিতেছি আমার আদেশমত তুমি আসিলেই আমার দর্শন পাইবে"। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বনের নানা-স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন একস্থানে একখণ্ড শিলার চতুপার্শ্বে জ্যোতি বহির্গত হইয়া আলোকিত হইয়া রহিয়াছে তদ্দর্শনে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেইস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক ইষ্টদেব উদ্দেশে পূজা, তপ, জপ করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপনান্তে দেখিলেন এই জঙ্গলাকৃত অরণ্যের মধ্য দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কুল্‌কুল্‌ শব্দে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছেন। পূর্ব্বে বণিক্‌গণ বানিজ্য উপলক্ষে এই ভাগীরথীর মধ্য দিয়া বানিজ্য করিতে যাইতেন।

একদা এক বণিক্‌ বানিজ্য গমনের সময় এইস্থান মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ধূপধুনার সৎগন্ধ এবং শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিলেন, সহসা এই জঙ্গলের মধ্যে এরূপ শব্দ শুনিয়া তিনি চমকৃত হইয়া ইহার কারণ নির্ণয় হেতু বানিজ্যপোত তথায় স্থগিত করিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে আমি কতবার এইস্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি কখনও এরূপ সৎগন্ধ ও শঙ্খ বা ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করি নাই এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া ইহার তত্ত্ব অবগতির জন্য সেই রজনী তথায় অবস্থান করিলেন। প্রাতঃকালে তিনি লোকজন সমভিব্যহারে অরণ্যের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন একস্থানে এক সাধু ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। বহুক্ষণ পরে সেই মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট সবিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধু বণিকের অচলাভক্তি

দেখিয়া অকপটচিত্তে পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তিনি এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই দেবস্থানে এই মানত করিলেন যে, যদ্যপি বাণিজ্যে আমার অধিক লভ্য হয় এবং নিরাপদে বাটী প্রত্যাগমন করিতে পারি, তাহা হইলে এই স্থানে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। এইরূপ মানত করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে জনসমাজে এই ভাগীরথীতীরে বিষ্ণুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্গুলী পতিত এবং কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয় প্রকাশিত হইল। সেই অবধি বণিকগণ এই স্থানে পৌঁছিয়া কালীমূর্ত্তি দর্শন এবং অভিলাষিত মানত করিয়া যাইতেন। কালক্রমে পূর্ব্বপরিচিত বণিক্ মায়ের কৃপায় ব্যবসায়ে লাভবান এবং নির্ব্বিঘ্নে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুদিন পরে উক্ত বণিক এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া' দিলেন এবং সেই সাধু, মহাপুরুষের অনুরোধে তিনি নিজ ব্যয়ে ঐ জ্যোতির্ম্ময় প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত করিয়া উপর্য্যুপরি প্রস্তর গাঁথিয়া অন্য একখানি প্রস্তরে নাসিকা আর স্বর্ণের দ্বারা চক্ষুদ্বয় অঙ্কিত করাইলেন এবং জিহ্বা, অসি মুকুট হস্তচতুষ্টয় ইহাতে সংযোজিত করিয়া মায়ের মনমোহিনী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া এই মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। কপালির অনুরোধে এই কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার জমিদার বড়িয়ার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের উপর মায়ের পূজার ভারার্পণ করিলেন। তখন মায়ের কোন কিছু আয় না থাকায়, চৌধুরী মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাহার পূজারী হালদারদিগকে মায়ের সমস্ত সত্বদান করিলেন। এক্ষণে মায়ের যথেষ্ট আয় হইয়াছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এই পবিত্র তীর্থ হইতে প্রতি-পালন হইতেছে। হালদারদিগের মায়ের কৃপায় এক্ষণে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে দেবী সাধারণের ভাগে পড়িয়াছেন। এখানে যে সকল ধনী ভক্তগণ আসিয়া মায়ের পূজা প্রদান করেন, যাহার পালা হয় তিনিই উহা প্রাপ্ত হন। কোন ভক্ত মানত করিয়া স্বর্ণের হাত, কেহ মুণ্ডমালা কেহ বা স্বর্ণের মুকুট দান করেন।

এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রমে জনসমাগম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাগীরথীরতীর হইতে দেবীস্থানে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে ভক্তগণের অসুবিধা বোধে দয়াল বণিক্ ভাগীরথীরতীরে একটী ঘাট বাঁধাইয়া এবং পীঠস্থানের মন্দিরে গমনাগমনের নিমিত্ত একটী প্রশস্ত পথ, জঙ্গল কাটাইয়া নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের উপকার করিলেন; ঐ ঘাট কালীরঘাট নামে অভিহিত হইল। এক্ষণে উক্ত ঘাটের নামানুসারে ঐ পীঠস্থানের নাম কালীঘাট হইয়াছে।

কালীর মন্দির এবং চতুপার্শ্ববর্ত্তীস্থান যাহা পুরীর অন্তর্গত ইহার পরিমাণ প্রায় দেড় বিঘা হইবে। মন্দিরটী জমী হইতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ। ইহার সম্মুখেই বাঁধান লাটমন্দির সংস্থাপিত। এই লাটমন্দিরে বসিয়া ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ভক্তগণ তপ, জপ করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত মায়ের মানত করেন, তাঁহারা এই লাটমন্দিরের উপর মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। মানসিক নির্ব্বাহ করিবার জন্য গদিতে সতন্ত্র খাজনা জমা দিতে হয়।

লাটমন্দিরের দক্ষিণ নিম্নদেশে ছাগ ও মহিষাদি বলি হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের সময় এইস্থানে যে কত শত বলি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যহই এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। শনিবার, মঙ্গলবার, আমাবস্যার দিন এবং দুর্গোৎসব ও পৌষ মাসে যাত্রীগণের অধিক সমাগম হইয়া থাকে।

নকুলেশ্বর। পীঠস্থানের অনতিদূরে মন্দিরের ঈশানকোনে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বেই কত অন্ধ, খঞ্জ, গরীব দুঃখী লোককে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, ঐ সকল ভিক্ষুকদিগকে কেহ কখন দান দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন না এই নিমিত্ত লোকে "কালীঘাটের কাঙ্গালীর উদাহরণ দিয়া থাকেন।

যাত্রীগণ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে অন্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও

এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রমে জনসমাগম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভাগিরথীরতীর হইতে দেবীস্থানে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে ভক্তগণের অসুবিধা বোধে দয়াল বণিক্ ভাগীরথীরতীরে একটী ঘাট বাঁধাইয়া এবং পীঠস্থানের মন্দিরে গমনাগমনের নিমিত্ত একটী প্রশস্ত পথ জঙ্গল কাটাইয়া নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের উপকার করিলেন; ঐ ঘাট কালীরঘাট নামে অভিহিত হইল। এক্ষণে উক্ত ঘাটের নামানুসারে ঐ পীঠস্থানের নাম কালীঘাট হইয়াছে।

কালীর মন্দির এবং চতুপার্শ্বে দরদালান যাহা পুরীর অন্তর্গত ইহার পরিমাণ প্রায় দেড় বিঘা হইবে। মন্দিরটী জমী হইতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ। ইহার সম্মুখেই বাঁধান নাটমন্দির সংস্থাপিত। এই নাটমন্দিরে বসিয়া ব্রাহ্মণ, আচার্য্য ও ভক্তগণ তপ, জপ করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত মায়ের মানত করেন, তাঁহারা এই নাটমন্দিরের উপরে মানসিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। মানসিক নির্ব্বাহ করিবার জন্য গদিতে স্বতন্ত্র খাজনা জমা দিতে হয়।

নাটমন্দিরের দক্ষিণ নিম্নদেশে ছাগ ও মহিষাদি বলি হইয়া থাকে। দুর্গোৎসবের সময় এইস্থানে যে কত শত বলি হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যহই এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। শনিবার, মঙ্গলবার, আমাবস্যার দিন এবং দুর্গোৎসব ও পৌষ মাসে যাত্রীগণের অধিক সমাগম হইয়া থাকে।

নকুলেশ্বর। পীঠস্থানের অনতিদূরে মন্দিরের ঈশানকোনে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে যাইতে হয়। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বেই কত অন্ধ, খঞ্জ, গরীব দুঃখী লোককে ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, ঐ সকল ভিক্ষুকদিগকে কেহ কখন দান দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন না এই নিমিত্ত লোকে "কালীঘাটের কাঙ্গালীর উদাহরণ দিয়া থাকেন।

যাত্রীগণ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে অন্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও

কালীঘাট। [১৫০ পৃষ্ঠা]

পাণ্ডারা ব্যস্ত করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বাসার অধিকারীর একটী করিয়া মায়ের পূজার ডালা দিবার নিমিত্ত চিনি ও সন্দেশের দোকান আছে। যাত্রীগণ ইচ্ছানুযায়ী পাণ্ডা ঠিক করিয়া লন এবং মায়ের পূজা ও ডালা দিয়া থাকেন। বাসা ভাড়া বা পূজা দিবার কোন বাঁধা নিয়ম নাই। যাত্রীর সমাগম অনুযায়ী বাসা ভাড়া কম বেশী হইয়া থাকে। যে বাসায় থাকিবেন তাহারই অধিকারীর নিকট হইতে পূজার ডালা খরিদ করিতে হয় এইরূপই নিয়ম দেখা যায়। এস্থানে অনেক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দু একটী এমন আছেন যাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শনে ভক্তি সঞ্চার হয়।

শ্রীশ্রীতারকেশ্বর দেব দর্শন-যাত্রা।

হাবড়া হইতে তারকেশ্বর ৩৬ মাইল। ই, আই, রেলে সেওড়াপুলী; সেওড়াপুলী হইতে তারকেশ্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন, ভাড়া ৷৷১০ আনা মাত্র। ষ্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তা পদব্রজে গমন করিলে শ্রীমন্দিরের নিকট পৌছান যায়। তারকেশ্বর হিন্দুদিগের প্রাচীন বিখ্যাত তীর্থস্থান।

৺তারকেশ্বরের এষ্টেটের বিষয় সম্পত্তি মহান্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়া রক্ষিত হয় এবং তিনিই ভোগ দখল করিয়া থাকেন। নানা উপায়ে ৺তারকেশ্বরের উপায় থাকায় এই এষ্টেটের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে এবং ইহার দ্বারাই মহান্ত মহাশয় "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কাহারও উৎকট পীড়া হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও বা পুত্র হইয়া নষ্ট হইয়া যায়, এই সকল লোক বাবা তারকনাথদেবের নিকট হত্যা দিয়া সাধ্যমত মানত করেন। ভক্তাধীন তারকেশ্বর ভক্তদিগের অভিলাষিত বাঞ্ছা কৃপাপূর্ব্বক পূরণ করিলে পর, তখন সেই ভক্তগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার মানতের পূজা দিয়া থাকেন এইরূপে এইপ্রকারে বাবা তারকনাথের অতুল সম্পত্তি হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের আশে পাশে যে সকল পূজার ডালার দোকান আছে তাহার প্রত্যেক অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের বাসাবাটী আছে উঁহারাই যাত্রীদিগকে বাসা দিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত অধিকারীকে উচ্চহারে মহান্ত মহারাজকে খাজনা দিতে হয়।

মহান্ত মহারাজ স্বয়ং কোন কিছু দেখেন না কেবল তিনি ৺তারকনাথের পূজায় ব্যস্ত এবং নানা ভোগের ভোগী হইয়া থাকেন। মহান্ত মহারাজের যে দাওয়ান আছেন তিনিই সমস্ত বিষয় কর্ম্ম দেখিয়া পরিচালনা করিয়া থাকেন। তথায় দুইটী হস্তি আছে কথিত আছে বাবা তারকেশ্বর ঐ হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগর ভ্রমণ করেন। তথায় বেলপুকুর নামে যে বৃহৎ বাঁধান একটী পুষ্করিণী আছে, চৈত্রমাসে ঐ স্থানে ঝাঁপ হয়। ভক্তগণ তথায় স্নান করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুখেই নাট-মন্দির, ভক্তগণ ঐ নাটমন্দিরে মানসিক করিয়া হত্যা দিয়া থাকেন। এখানে সর্ব্বদা উৎকট উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কোন্ পাপে ঐ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় জানিবার জন্য হত্যা দিয়া থাকেন।

বাবার স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ "জয় তারকেশ্বর কি জয়!" "জয় হরপার্ব্বতী কি জয়।" এইরূপ প্রকার শব্দে নগর কম্পান্বিত করিতে থাকেন এবং চতুর্দ্দিকে ভিক্ষুকগণ তারকেশ্বরের গুণগান করিয়া ভক্তগণের নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। ভিক্ষুকেরা খঞ্জনীর বা এক-তারার সাহায্যে এই গানটী গায়;—

বন্দিলে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিক্ জলা জঙ্গল খাকড়ার বসতি ॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর।
তার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেশ্বর ॥
কপিলা দুগ্ধ দিত এক চিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে ॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর ॥
তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি।
মোরে সেবা কর বাবা হইয়া সন্ন্যাসী ॥

এইরূপ কত প্রকার তারকেশ্বরের গুণগান করিয়া মনের উল্লাসে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

যে স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজমান ঐ স্থান পূর্ব্বে সিংহল দ্বীপ নামে কথিত ছিল। ভোলা মহেশ্বর ঐ স্থানের এক জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তরের মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেন। গয়লানীরা ঐ প্রস্তরকে সামান্য প্রস্তর মনে ভাবিয়া তাহার উপর ধান ভাঙ্গিয়া চাউল প্রস্তুত করিত; এই কারণে "বাবার মস্তকে" অদ্যাপি একটী গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তির গাভী প্রত্যহ ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া তারকেশ্বরকে হৃষ্টচিত্তে দুগ্ধ খাওয়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দ ঘোষ প্রত্যহ ঐ গাভীর দুগ্ধ না হওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল এবং এরূপ হৃষ্টপুষ্ট গাভীর দুগ্ধ না হইবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা প্রত্যূষে ঘোষজা ঐ গাভীর পশ্চাৎ অনুসরণপূর্ব্বক এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেইস্থানে অবস্থান করিলেন। তখন প্রভু তারকেশ্বর সদয় হইয়া তাহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া সাক্ষাৎ দান করিলেন এবং মুকুন্দ ঘোষকে উপদেশ দিলেন তুমি সন্ন্যাসী হইয়া আমার

সেবায় রত হও। সেই অবধি মুকুন্দ ঘোষ প্রভুর আজ্ঞায় সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। মায়াময়ের লীলা নরে কিরূপে অবগত হইবে। একদা প্রভু বর্দ্ধমানের মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দানে কহিলেন, আমি সিংহল দ্বীপে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাতে আমায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়; অতএব আমার একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দাও। বর্দ্ধমানাধিপতি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পুণ্যাত্মা ছিলেন, তিনি স্বপ্নাদেশ অনুসারে প্রভুর মন্দির ও তাঁহার সেবার নিমিত্ত এরূপ বিষয়াদি দান করিলেন যাহার আয়ে অনায়াসে প্রভুর সেবা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে এইরূপ প্রকারে বাবা তারকনাথ নরলোকে প্রকাশিত হইলেন।

লোকের উৎকট পীড়াদি হইলে তারকেশ্বরের নিকট মানত করিলেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক ভক্তগণকে উদ্ধার করেন, মুকুন্দ ঘোষ এইপ্রকার তাঁহার আঁজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন। তখন দলে দলে যে সকল পীড়িত ভক্ত তথায় উপস্থিত হইলেন বাবা তারকেশ্বরের কৃপায় তাহারা সকলেই মুক্তি পাইলেন। এই সুসমাচার ভারতের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইলে রোগীর সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে যে সকল ভক্ত তথায় গমন করেন তাহারা সাধ্যমত মানত করিয়া হত্যা দেন, এবং আরোগ্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহার মানসিক পূজা দিতে থাকায় ক্রমে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে, পরম বৈষ্ণব মুকুন্দ ঘোষ দেহ রাখিলে সেই স্থানে মহান্ত পদ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভক্তগণের নানাপ্রকার দানে অতুল ঐশ্বর্য্য হওয়ায় মহান্ত ইংরাজ রাজের নিকট "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীমন্দিরের পার্শ্বে যে একটী সমাজ বিরাজমান আছে, কথিত আছে ঐ সমাজই মুকুন্দ সন্ন্যাসীর। বাবার হুকুম অনুসারে যাত্রীগণ তথায় উপস্থিত হইলে তাহার উদ্দেশে সমাজের উপর দুগ্ধ ও গঙ্গাজল প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়। ঐ সমাজে পূজা না করিলে বাবা তারকনাথ কোন ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন না।

মহান্ত পদ গ্রহণ করিতে হইলে পিতা মাতা বিষয় সম্পত্তি সমস্ত এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহান্ত হইতে হয়। কোন মহান্তের মৃত্যু ঘটিলে যিনি তাঁহার প্রধান চেলা থাকেন তিনিই গদীতে বসেন অর্থাৎ তিনিই মহান্ত পদ প্রাপ্ত হন। গদী প্রাপ্তির দিন উক্ত দশ উপাধিধারী মহান্তেরা একত্রিত হইয়া যিনি প্রধান চেলা হইবার যোগ্য বিচারপূর্ব্বক তাঁহাকেই মহান্ত পদে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন এইরূপ অভিষেক হইলে তাহার পরে আর কোন-রূপ গোলযোগ হইতে পারে না নচেৎ সকলেই প্রধান চেলা হইতে চায়। তথায় একটী কালীবাড়ী বিরাজিত আছে। বৈদ্যবাটীর কালীমাতার মহান্তের উপাধি ভারতী এবং তারকেশ্বরের মহান্তের উপাধি গিরি।

শিবগঙ্গার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যে সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, উঁহাই মহান্তের "বাসভবন" তিনি তথায় বাস করিয়া থাকেন। গৃহে কতপ্রকার সোণা রূপার হুকা এবং ফরসী আরও প্রাচীরে কতপ্রকার আয়না টাঙ্গাইয়া ও টানাপাখায় শোভিত, দেখিলে মোহিত হইতে হয়, কিন্তু ইহা মহান্তের বাসভবন বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না।

তারকেশ্বর একটী অনাদী শিবলিঙ্গ। তাঁহাকে সকলে আশুতোষ বলিয়া থাকেন কেননা তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হন এবং ভোলানাথ বলেন, কেননা তিনি সুখের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করেন সমস্তই তখনই ভুলিয়া যান। তাঁহারই যিনি মহান্ত তিনিও সেইরূপ আদান প্রদান অনুকরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীমন্দিরের মধ্যে একটী গহ্বর আছে। ঐ গহ্বর মধ্যে প্রভু তার-কেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। গহ্বরের উপরিভাগটী রৌপ্য নির্ম্মিত একটী ডেকে ঢাকা থাকে। যদ্যপি কোন যাত্রী পূজারী ব্রাহ্মণঠাকুরকে বেশী অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি ভক্তকে গহ্বর মধ্যে হস্ত দিয়া স্পর্শানুভব করিতে দেন।

মাহন্ত মহারাজ প্রত্যহ বাবার পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহার পূজার

সময় কোন যাত্রী মন্দির মধ্যে থাকিতে পান না। কথিত আছে ঐ সময় মহন্তের সহিত প্রভু তারকেশ্বররের নানাপ্রকার কথা হয় এবং বিষয়াদি সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞাসাও হয়।

প্রত্যহ বেলা দেড় ঘটিকার সময় প্রভুর পায়স ভোগ হয়। বেলা আড়াই ঘটিকার সময় লুচি মণ্ডার ভোগ হয় তৎপরে শৃঙ্গার বেশ হইয়া থাকে। শৃঙ্গার বেশ অর্থাৎ প্রভুকে চন্দন ও পুষ্পাদির দ্বারা সুশোভিত করিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হয়। সন্ধ্যারতির পর পূজা সমাপনান্তে রজনীতে দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহির হইতে গুড়গুড়ির টানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ঐ গুড়গুড়িতে স্বয়ং তারকেশ্বর গাঁজা মিশ্রিত সুগন্ধ তামাক খাইয়া শব্দ উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, এই শব্দ মন্দিরের বাহির হইতে সকল যাত্রীই শুনিতে পাইবেন।

চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষে এবং শিব চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে এখানে বিস্তর ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রত্যহই ভক্তগণ আসিয়া বাবার পূজা দিয়া চরিতার্থ বোধ করেন। সপ্তাহ মধ্যে প্রতি সোমবারে ভক্তগণের অধিক সমাগম হয়।

চৈত্রমাসে শিবরাত্রির সময় ও ভক্তগণ হত্যা দিয়া থাকেন। ভক্তদিগের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জনতাপূর্ণ নিশিথে অনেক কুচরিত্র পুরুষ উপস্থিত থাকে, তাহারা সুবিধা বুঝিয়া সুন্দরী যুবতী দেখিলে নানাবেশে নানাছলে গন্তব্য পথে লইয়া যায়। এইরূপ শুনা যায় যে ঐ সকল পাষণ্ডেরা গেরুয়া বসন পরিধানপূর্ব্বক সেই নিঃসহায় অবলার নিকট মধুরবচনে বলিয়া থাকে তোমার অচলাভক্তিতে তারকনাথ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তোমার ভাগ্যও প্রসন্ন হইয়াছে সুতরাং চেলাগণসহ তোমার নিকট আসিয়াছি আমার সহিত আইস আবশ্যক মত ঔষধ পাইবে।" এইরূপ কতপ্রকার ছলনা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া লয়। মাধবগিরির রাজত্বকালে এলোকেশীর বিষয় স্মরণ হইলে

হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এই সকল অপরিচিত পাষণ্ডদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া একা এলোকেশীর স্থায় কত এলোকেশী, বাঁধাকেশী, অভ্রকেশী, ফুলকেশী, কচিকেশীর ভাগ্য প্রসন্ন হয় উহা কত জানাইব। ভোলা মহেশ্বর! তোমারই স্থানে তোমার চেলারূপ ধরিয়া তোমারই ভক্তগণের উপর না জানি কত উপদ্রব করে তুমি গাঁজার দমে বিভোর হইয়া থাক। এই সকল অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত একবার কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু!

ইতিহাসে দেখা যায় প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে আবুরায় ও বাবুরায় নামে পঞ্জাব প্রদেশস্থ দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় মহাজন বর্দ্ধমানে ব্যবসা করিতে আসেন। এই দুই সহোদরে বঙ্গদেশের নানা স্থানে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং কালক্রমে বর্দ্ধমানে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্দ্ধমানের রাজারা এই দুই সহোদরের বংশধর। সম্পদ ও সম্ভ্রমে বর্দ্ধমানের রাজারা বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বপ্রধান। পাণ্ডিত্ব, বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য, দেশহিতৈষীতা, পরোপকারীতা প্রভৃতি বরণীয় গুণপুঞ্জে যে সকল মহানুভব পুরুষ ও রমণীরত্ন এই বংশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাপচাঁদ রায় ও মহারাণী নারায়ণকুমারী এই দুইজন সর্ব্বপ্রধান। এই পুণ্যাত্মা সর্ব্বপ্রথমেই দেশীয় সভ্য ভারত গবর্ণর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েন। মহাতাপ বাহাদুরের কীর্ত্তিপুঞ্জে মধ্যে গোলাপবাগ, মহাতাপ মনজিল নামে বিদ্যালয়, দেলখোষ, ইংরাজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, মতিঝিল, মাদ্রাশা প্রভৃতি এই কয়টাই প্রধান। ইহাঁর অনুমত্যানুসারে এবং প্রভুতি ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ এবং বহুবিধ হিন্দুশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হয় এবং সাধারণে বিনামূল্যে বিতারিত হয়। সেই পুণ্যাত্মার অসংখ্যকীর্ত্তি ও বদান্যতার বিষয় কত লিখিব।

তাঁহার মৃত্যুর পর আফতাপচাঁদ বাহাদুরের রাজত্বকালে পবলিক লাইব্রেরী, রাজকলেজ, অন্নছত্র, ছাত্রাশ্রম এবং বহুসংখ্যক দেবালয়

প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার পর বিজয়চাঁদ পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হন। বর্ত্তমান মহারাজ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবরণর বাহাদুরের সুযোগ্য সদস্য লালা বনবিহারী কপুর রায় বাহাদুর মহাশয়ের পুত্র ইনি দয়া দক্ষিণ্যাদিগুণে সুশোভিত। গোঁসাইগ্রামে তাহার জন্ম হয়, তীক্ষ্ণদর্শী এবং রাজকার্য্যে সুপটু, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অনুরাগী এবং দরিদ্রের দুঃখ মোচনে সদতই মুক্তহস্ত তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল মোট কথা এই বংশ ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের মান রক্ষা করিতেছেন।

মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ।

১। রক্ত শুদ্ধ থাকিতে থাকিতে চিকিৎসা করা উচিত, রক্ত মন্দ হইলে শরীরকে নষ্ট করে, সেইরূপ সাধুদিগের পবিত্র উপদেশ সকল পালন না করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, যেরূপ রোগের উপর কুপথ্য করিলে রোগ বৃদ্ধি পায় সেইরূপ জ্ঞানত পাপ করিলে আত্মার বিনাশ হইয়া থাকে।

২। ঈশ্বর—যাঁহার কার্য্য, স্বভাব এবং স্বরূপ, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্ব্বগুণযুক্ত, জ্ঞানী, সর্ব্বানন্দময়, ন্যায়কারী, দয়াল, যিনি জগতের সৃষ্টি, পালনকর্ত্তা ও লয়কর্ত্তা এবং জীবগণকে আপন আপন পাপ ও পুণ্যের বিচার অনুযায়ী যথাযোগ্য ফলপ্রদান করেন, সেই সর্ব্বশক্তিমানকে ঈশ্বর বলে।

৩। মুক্তি—যে সকল কুৎসিত কর্ম্মদ্বারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় এবং সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে তাহাকে মুক্তি বলে।

৪। অন্ন ও জল রীতিমত ব্যবহার করিলে দেহে রক্ত হইয়া শরীরকে যেরূপ পুষ্ট করে, মহাত্মাদিগের উপদেশ সকল পালন করিতে পারিলে সেইরূপ আত্মা পুষ্ট হয়।

৫। সাধু পুরুষদিগের উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক পালন করা উচিত। মহাত্মাদিগের কৃপা ব্যতিত কেহ সিদ্ধ বা ধর্ম্মপথ দর্শন করিতে পারে না।

৬। ভগবান কৃপা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত নানা-প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তিনি যে সকল পবিত্র উপদেশ সকল প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন করিলে পাপীগণ নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইবে।

৭। টাকা ব্যয় দ্বারা দেহরোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় সত্য, কিন্তু পাপ-রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হয় না। পাপরূপ রোগর একমাত্র মহোষধ ভগবানের সাধনা।

৮। ফল, ফুল, মূল, দান, চন্দন, পুষ্প দিয়া পূজা করাকে সাধনা বলা যায় না, ভক্তিপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতে না পারিলে, সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের শ্রীচরণে স্থান পাওয়া যায় না।

৯। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড় রিপু ও মনকে বশীভূত করিতে না পারিলে ধর্ম্মের পথ দেখা যায় না।

১০। ক্রোধ জীবদিগের প্রধান শত্রু, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য না করিতে পারে এরূপ দুষ্কর্ম্ম দেখা যায় না, কিন্তু সেই ক্রোধ উপশম হইলে মনকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে থাকে, অতএব ক্রোধে উত্তেজিত হইবার পূর্ব্বে এই গর্ত্ত´ উপদেশটী স্মরণ করিবেন।

১১। জন্ম হইলেই মরিতে হইবে। সাধু, পাপী, মহাত্মা, ধনী, দুঃখী সকলকেই সময় হইলে দেহত্যাগ করিতে হইবে, মানবগণ ইহা অবগত হইয়াও কোন উপায় করিতে ইচ্ছা করে না।

১২। ধন-অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া চিরদিন এইরূপে কাটিবে বিবেচনা করা ভ্রান্তিমাত্র, অতএব সময় থাকিতে পথ পরিষ্কার করা উচিত।

৪৩। কাহারও গলগ্রহ হইয়া বাস করিবে না। কু-লোকের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া আপন কার্য্য ভুলিবে না। ধন সম্পদ বা পরাক্রমশালী ব্যক্তির সাহায্যে গর্ব্ব করা উচিত নয়। প্রাণের কথা কখন কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিবে না, কারণ আজ যিনি সুহৃদ, কালক্রমে সে ব্যক্তি পরম শত্রু হইতে পারে।

১৪। স্ত্রীলোকের নিকট কখন গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে না, কারণ তাহারা মহারাজ যুধিষ্ঠির অভিশাপে গুপ্ত রাখিতে পারে না। যদ্যপি তাহারা একান্ত জিদ করে, তাহা হইলে অপর কোন বাক্যে ভুলাইয়া রাখিবেন। এ বিষয় প্রমাণস্বরূপ পরে একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। বিপদ সময়ে অধীর হওয়া উচিত নয় কারণ বিপদ কখন একা আসে না। সেই বিপদ সময় অধীর হইলে জ্ঞান, বল, বুদ্ধি সমস্তই নাশ করে। বিপদে শান্ত, নির্য্যাতনে নীরব থাকিয়া ভগবানের উপর দৃঢ় ভক্তি-স্থাপন করাই শ্রেয়, কিন্তু নানা ব্যক্তির নানাপ্রকার পরামর্শতে বিচলিত হইবেন না।

১৬। বিপদ বা দুঃখ যতই হউক না কেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে সমভাবে সকল সহ্য করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান।

১৭। ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও আশ্বাস দিবে না এবং কাহারও আশা, ভরসা ও বাসস্থানে বিঘ্ন ঘটাইবে না।

১৮। ধনী ব্যক্তির বাটীতে দাসীগণ বেতনভুক্ত হইয়া দাসীত্ব স্বীকার করিয়া থাকে এবং প্রভুর শিশু-সন্তানদিগকে মাতার ন্যায় লালনপালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা উত্তমরূপে অবগত আছে যে ঐ সকল সন্তান-দিগের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই। মনুষ্যমাত্রেই সেইরূপ নিজেদের সন্তানদিগকে যত্নের সহিত স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া লালনপালন

করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদিগকে নিশ্চয় ভাবিতে হইবে যে, ঐ সকল সন্তান হইতে অন্তিম সময়ে তাহাদের কোন উপকার দর্শিবে না।

১৯। তুমি তোমার পিতা মাতাকে যেরূপ ভক্তি করিবে, তোমার পুত্রেরাও তোমায় সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে, এইরূপ নিশ্চয় জানিবেন। যে সকল পুত্র, পিতা মাতাকে ভক্তি করে না, উহা তাহাদের কর্ম্মফল বলিয়া জানিতে হইবে।

২০। মনুষ্য পরলোক গমন করিলে কে তাহাদের সহায় হয় এবং অনুগামী হয়? একমাত্র কর্ম্মফলই তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি জীবের ফলস্বরূপ, অতএব ধর্ম্মানুসারে ঐ সমুদয়ের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

২১। মৃতদেহ চক্ষের অগোচর হইয়া ভস্মিভূত হইলে ধর্ম্ম কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান করে, এ বিষয় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, পৃথিবী, বায়ু, সলিল, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই সকল, প্রাণীর ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ কিন্তু ধর্ম্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাবে জীবের অনুগমনে প্রবৃত্ত হয়। জীব পরলোকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিলে, তখন পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পুনর্ব্বার উহার শুভাশুভ কর্ম্ম সকল বিচার করিয়া থাকেন।

২২। জল ও দুগ্ধ এক পাত্রে রাখিলে উভয়ে মিশ্রিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ সংসারে নানাপ্রকার লোকের সহবাসে মানবের মনকে ধর্ম্মভাব বিনাশ করে, তখন সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্ব-বিশ্বাস, উৎসাহ কিছুই জানিতে পারে না। জল ও দুগ্ধ একত্রে মিশ্রিত হয় সত্য কিন্তু দুগ্ধকে মাখন করিতে পারিলে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ভাবনা যায়; সেইরূপ শ্রীহরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে শতবদ্ধ জীবের মধ্যে বাস করিলেও তাহার মনকে নষ্ট করিতে পারে না।

২৩। জল নারায়ণস্বরূপ, স্থির জানিও ভাই! সকল স্থানের জল

পান করাও উচিত নয়। ঈশ্বর সকল স্থানেই বিরাজিত কিন্তু সর্ব্বত্রেই তাঁহার দর্শনে সমান ফল পাওয়া যায় না, যেরূপ সকল জীবের মধ্যেই তিনি বিরাজ করিতেছেন, ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি অবস্থিতি করেন, কিন্তু ব্যাঘ্রের সম্মুখে যাওয়া উচিত নয়। সেইরূপ কু-লোকের মধ্যেও নারায়ণ আছেন কিন্তু উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

২৪। স্প্রীংএর শয্যায় শয়ন করিলে শয্যা কুঞ্চিত হয় এবং উহা ত্যাগ করিলেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারী ব্যক্তির মনও যতক্ষণ ধর্ম্ম বিষয় আলোচনা করেন, ততক্ষণ ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পায়, আবার মায়া-সংসারে লিপ্ত হইলেই অন্য ভাব আসিয়া থাকে, অতএব মনকে ধর্ম্মপথে রাখিবার চেষ্টা করিবেন।

২৫। অসতী স্ত্রীলোক স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের মধ্যে বাস করিয়া নানাবিধ গৃহকার্য্যে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন যেমন সদা সর্ব্বদা উপপতির উপর আকৃষ্ট রাখে, মনুষ্যগণও যদ্যপি সেইরূপ সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও ভগবানের প্রতি মন আকৃষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে নিশ্চই সে সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পারে।

২৬। সংসার কাহাক বলে ইহা সকলে জানিয়াও জানিতে চাহেন না, ভগবান মায়ারূপ সংসারে মানবদিগকে পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়া থাকেন অর্থাৎ সংসার সৃষ্টিকর্ত্তার লীলাস্থান। এই ক্ষেত্রে তিনি নানা ভাবে নানাদিকে নানাস্থানে নানাপ্রকার লীলা করিতেছেন। মা যেরূপ শিশু-সন্তানের করে সুন্দর খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখেন ভগবানও সেইরূপ সংসারী মানবগণকে নানাপ্রকার সুখ সামগ্রী প্রদান করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই শিশু যখন খেলনা পরিত্যাগ করিয়া মা, মা বলিয়া চিৎকার করে, মাতা সেই চিৎকারে কিছুতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া স্নেহ-সহকারে সন্তানের নিকট আসিয়া থাকেন। মানবগণ যদি সুখ-বস্তু ত্যাগ করিয়া শিশুদিগের ন্যায় সরল প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকেন,

তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইতে পারেন। ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক সেই পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনা করিলে, যথাসময়ে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন।

কয়েকটী প্রশ্ন উত্তর প্রকাশিত হইল।

প্র। তীর্থ কাহাকে বলে?

উ। জিতেন্দ্রিয় হইতে যে সকল উত্তম কর্ম্মদ্বারা জীবগণ দুঃখসাগর হইতে ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া উদ্ধার হন, সেই সকল কর্ম্মকে তীর্থ বলে।

প্র। শ্রীমান কে?

উ। সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় যে।

প্র। মূর্খ কে?

উ। হিতাহিত বিবেচনা করে না যে।

প্র। অসুখী কে?

উ। পরাধীন বা ঋণগ্রস্থ যে।

প্র। সুখী কে?

উ। অঋণী, অপ্রবাসী যে।

প্র। উপকারী কে?

উ। যথার্থবাদী ও অসময়ে দয়া করে যে।

প্র। অপকারী কে?

উ। চাটুকার যে।

প্র। দুঃখী কে?

উ। বিষয়ানুরক্ত যে।

প্র। সংসারে ধন্য কে?

উ। পরোপকারী ও ধার্ম্মিক যে।

প্র। শত্রু কে?

উ। আপনার ইন্দ্রিয় সকল এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব সকল।

প্র। মৃত্যু কাহাকে বলে?

উ। আপনার অকীর্ত্তিকে মৃত্যু বলে।

প্র। কর্ণহীন কে?

উ। উপদেশ বাক্য না শুনে যে।

প্র। বন্ধু কে?

উ। বিপদে সহায় যে।

প্র। অন্ধ অপেক্ষা অন্ধ কে?

উ। মদনাতুর যে।

প্র। বীর হইতে বীর কে?

উ। কাম বানে বঞ্চিত যে।

প্র। শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার কি?

উ। সৎস্বভাব।

প্র। কোন কোন ব্যক্তির সহিত বাস করিবে না?

উ। মূর্খ, পাপী, নীচ স্বভাব ও খলস্বভাবদিগের সহিত কথন বাস করিবে না।

প্র। মিত্র হইয়াও শত্রু কে?

উ। পুত্র পরিবারাদি।

প্র। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি?

উ। ধন, জীবন ও যৌবন।

প্র। কি ত্যাগ করিলে সুখী হইতে পারা যায়?

উ। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিলে সুখী হইতে পারা যায়।

উদাহরণস্বরূপ পরে একটী উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্র। অহর্নিস কি চিন্তা করিবে ?

উ। আত্মোন্নতি চেষ্টা করিবে।

প্র। চোরাবান কাহাকে বলে ?

উ খল ব্যক্তির মনের ভাবকে বলে।

প্র। সর্ব্বদা অন্ধকার কোথায় ?

উ। মূর্খের হৃদয় মধ্যে।

প্র। বিশ্বাস কাহাকে বলে ?

উ। যাহার মূল ও ফল সত্যাশ্রয়যুক্ত, তাহাকেই বিশ্বাস বলে।

প্র। উপাসনা কাহাকে বলে ?

উ। যাহার দ্বারা ঈশ্বরে আত্মাকে মনোনিবেশ করা যায় তাহাকেই উপাসনা বলে।

প্র। পরলোক কাহাকে বলে ?

উ। যাহার দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জন্মে মুক্তি পাইয়া পরম সুখ পাওয়া যায়।

প্র। অপর লোক কাহাকে বলে ?

উ। যাহাতে দুঃখভোগ হয় এবং পরলোকের অনুরূপ ফল প্রদান করে তাহাকেই অপর লোক বলে।

প্র। মরিলে মানুষ ক্রন্দন করে কেন ?

উ। ক্রন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তির পাপ নাশ হয় বলিয়া।

প্র। জন্ম কাহাকে বলে ?

উ! যাহার দ্বারা প্রাণী দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কর্ম্ম করিতে পারে তাহাকেই জন্ম বলে।

প্র। গর্ভ্ভের উৎপত্তি কিরূপে হয় ?

উ। বায়ু, আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও মন শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সকল

ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয়। স্ত্রীপুরুষের সহযোগে ঐ রেত প্রভাবেই গর্ত্তের সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্র। জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থান পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে?

উ। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে প্রথমে রেত আশ্রয় করিয়া স্ত্রীলোকের গর্ত্তকোষে প্রবেশপূর্ব্বক যথাকালে ইহলোক সমাগত ও পরলোক গত হয়, এইরূপে মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবে বারম্বার সংসার চক্র পরিভ্রমণ করিয়া যমদূতদিগের প্রহার ও বিবধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে তৎপরে সকল প্রাণী-কই জন্মাবধি স্বীয় ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়।

প্র। পরস্ত্রী সহবাসে রত থাকিয়া সুখভোগ অনুভব করিলে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয়?

উ। পরস্ত্রী সহবাসে রত থাকিলে পিতৃপুরুষগণ শ্রাদ্ধকালে তাহাদের প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহার ফলে তাহাদিগকে অনন্ত যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়। পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যা নারীতে অনুরাগ ও পরস্ত্রীকে মন মধ্যে স্থান দান এবং ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা এই চতুর্ব্বিধ কার্য্যই তুল্য দোষাবহ বলিয়া জানিবেন।

প্র। ব্যাভিচার কাহাকে বলে?

উ। স্বীয় পত্নী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, ঋতুকালে বীর্য্যদান এবং অত্যন্ত বীর্য্যনাশ, যুবাবস্থা ব্যতীত বিবাহ এই সকল কার্য্যকেই ব্যাভিচার বলে।

প্র। গুরু কাহাকে বলে?

উ। জন্মদান দিয়া ভোজনাদি প্রদান ও পালন করেন বলিয়া পিতাকে গুরু বলে আর যে ব্যক্তি সৎ ও সত্য উপদেশ দান করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করেন তাঁহাকেই গুরু বলে।

প্র। অতিথি কাহাকে বলে?

উ। যে ব্যক্তির গমনাগমনের কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই, যে মহাত্মা সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রশ্ন উত্তর করেন এবং সকলকে উৎসাহ ও সৎ উপদেশ দান করিয়া থাকেন তাহাকেই অতিথি বলে।

প্র। জাতি কাহাকে বলে ?

উ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত যাহা বর্ত্তমান থাকে এবং অনেক ব্যক্তিতে একত্র বাস করিয়া এক ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জাতি শব্দার্থে গৃহী হয় উহাকেই জাতি বলে।

প্র। কর্ত্তা কাহাকে বলে ?

উ। যিনি স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করেন এবং যাবতীয় কর্ম্ম যাহার অধীন, সেই ব্যক্তিকেই কর্ত্তা বলে।

প্র। মনুষ্য কাহাকে বলে ?

উ। হিতাহিত বিবেচনা করিয়া যিনি সকল কার্য্য করেন তাহাকেই মনুষ্য বলে।

প্র। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উ। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন, পক্ষপাত শূন্য, লেহ ও সর্ব্ব আত্মার মঙ্গল সাধন করা, যাহা প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে।

প্র অধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উ। ঈশ্বর আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া পক্ষপাত সহিত অন্যায় ও দোষ আশ্রয় লয় ও যাহা সাধু ব্যক্তির পরিত্যক্ত তাহাকেই অধর্ম্ম বলে।

প্র। পূজা কাহাকে বলে ?

উ। যিনি জ্ঞান, ধর্ম্মাদিযুক্ত, তাঁহার যথাযোগ্য অর্চ্চনাকে পূজা বলে।

প্র। সৎ ও কুসঙ্গ কিরূপ ?

উ। যাহার দ্বারা প্রাণী সকল মন্দ কর্ম্মে রত হয় তাহাকে কুসঙ্গ, আর যাহার দ্বারা মিথ্যাবাদে সত্যের লাভ হয়, তাহাকে সৎসঙ্গ বলে।

প্র। পুণ্য কাহাকে বলে ?

উ। বিদ্যা, বুদ্ধি ও শুভগুণের দান এবং সত্য ব্যহারের অনুষ্ঠান-স্বরূপকে পুণ্য কহে।

প্র। পাপ কাহাকে বলে?

উ। মিথ্যাভাষণাদি কর্ম্মকে পাপ বলে।

প্র। মরণ কাহাকে বলে?

উ। যে দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণীসকল কর্ম্ম করেন, সময়ে সেই দেহের সহিত জীবের বিয়োগকে মরণ বলে।

প্র। স্বর্গ কাহাকে বলে?

উ। প্রাণীর অত্যন্ত সুখদ্রব্য প্রাপ্তির নাম স্বর্গ।

প্র। নরক কাহাকে বলে?

উ। প্রাণীর অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্তির নাম নরক।

প্র। সৎপুরুষ কাহাকে বলে?

উ। সর্ব্বমঙ্গলকারী, সত্যে রত ও ধর্ম্মাত্মাকে সৎপুরুষ বলে।

১। স্ত্রীজাতি গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী। গৃহে স্ত্রী না থাকিলে পুরুষ সংসারী হইতে পারেন না বা গৃহ শোভা পায় না। এমন কি মানবগণ পিণ্ডপ্রাপ্তির আশায় যে পুত্র কামনা করিয়া থাকেন, স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে কিরূপে সেই পুত্র উৎপাদন হইবে? যে জাতির এতগুলি গুণ বর্ত্তমান আছে, সংসারী মানবদিগের তাহাদিগকে সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন সময় "কামিনী ও কাঞ্চন" এই দুইই পরিত্যাগ না করিলে পুরুষ কখনই সুখী হইতে পারিবেন না।

২। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাবীর কর্ণ মহারথী অর্জ্জুনের বাণে নিহত হইলে পর, পাণ্ডুমহিষী কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরকে স্নেহ-

প্রযুক্ত কর্ণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে অনুরোধ করেন এবং এই মহাবীর কর্ণই যে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর উহা প্রকাশ করেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির জননীর নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে সেই মর্ম্মভেদী বাক্যে অধৈর্য্য হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিলেন এবং ক্রুদ্ধমনে অভিমানপূর্ব্বক স্ত্রীজাতিকে এই বলিয়া অভিসম্পাদ প্রদান করিলেন যে, "যদি আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, যদি দেবদ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও জননীর শ্রীচরণে অকপট ভক্তি থাকে তাহা হইলে আজ হইতে আমার মর্ম্মভেদী মনস্তাপের জন্য কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিতে পারিবেন না"। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অভিশাপে সেই অবধি কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিতে সমর্থ হন না। যদ্যপি কোন স্ত্রী কোন গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য কোন পুরুষের নিকট জেদ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্য প্রকার উপমা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেন, এ বিষয়ে একটী প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল।

সোনপুরের অন্তঃর্গত কেশলা গ্রামে উমাচরণ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি রাজ সরকারে সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর হইয়াছিলেন কিন্তু মানবগণ সকল বিষয়ে সকল সময়ে সুখী হইতে পান না, তাঁহাকে এক মূর্খ পুত্রের নিমিত্ত সদত অনুতাপ করিতে হইত।

একদা ঐ মূর্খ পুত্র নিমন্ত্রিত হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক নির্জ্জন স্থানে বিধাতাপুরুষকে বালি মাপ করিতে দেখিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিয়া তথায় গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু হে! এই জনশূন্য নির্জ্জন স্থানে তুমি কি নিমিত্ত একাকী বালি মাপ করিতেছ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর আহার মাপ করিতেছি অর্থাৎ যাহার আমি এই বালি মাপ না করিব সে দিবস তাহাকে উপবাস থাকিতে হইবে। নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ

বিধাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, বহু দিবস পর নিমন্ত্রিত হইয়া আমি শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছি, (এই বালি মাপের বিষয় আমায় পরীক্ষা করিতে হইবে) এইরূপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বোধ হয় আপনি আমারও আহার মাপ করিবেন ? অদ্য আমার ইচ্ছানুসারে আমার জন্য বালি মাপ করিবেন না। বিধাতা তাহাই হইবে বলিয়া ঈষৎহাস্য করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ যথাসময়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদের যত্নে সন্তুষ্ট হইলেন, কিছুক্ষণ পরে অন্ন প্রস্তুত হইলে তাহাকে আহ্বান করা হইল, কর্ম্মসূত্র ও বিধাতার আজ্ঞায় তথায় উপস্থিত হইয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, বহুদিবস পর এই ব্রাহ্মণ কুটুম্বদিগের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন ও পথিমধ্যে বালি মাপের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ঠিক্ সেই সময় তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে অন্নপাত্র হস্তে উপস্থিত দেখিয়া বালির মাপ সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবেচনা করিয়া হাস্য করিলেন, তদ্দর্শনে তাহার শ্যালক তাহার মাতাঠাকুরাণীকে উপহাস করিল মনে ভাবিয়া ভগ্নীপতির গণ্ডদেশে এক বজ্রমুষ্টাঘাত করিলেন, তখন সকলেই দুঃখিত হইয়া ব্রাহ্মণকে বারম্বার আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিলেন না, কর্ম্মসূত্র এইরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বালির মাপের বিষয় প্রকাশ করিয়া নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিলেন এবং আপন দোষে এই-রূপ সঙ্ঘটনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর পণ্ডিত উমাচরণ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার একমাত্র এই পুত্রই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেন। তিনি স্বীয় হীন বুদ্ধির দোষে কুসংসর্গ ও চাটুকারদিগের সহিত মিলিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট করিলেন। হায়, সময়ের কি বিচিত্র গতি ! যিনি চাটুকার বন্ধুদিগের আহ্বানে মুহূর্ত্তমাত্র বাটীতে অবস্থান করিবার সময় পাইতেন না,

এক্ষণে দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়া সেই সকল প্রাণের বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিল, এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি আন্তরিক দুঃখিত হইলেন, কেননা যে সকল বন্ধুর দুঃখে কাতর হইয়া তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে অকাতরে কত শত মুদ্রা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই এক্ষণে তাহাদের নিকট সামান্য অর্থেরও প্রত্যাশা করিতে পারিলেন না।

সময় কখন কাহারও সমভাবে যায় না, সুখের পর দুঃখ, আর দুঃখের পর সুখ, এইরূপই হইয়া থাকে। বহু পুণ্যবলে মানব-জন্ম সম্পন্ন হয়, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, সেই সময় মধ্যে একবার মাত্র সুসময় উপস্থিত হইবে, যে ব্যক্তি তখন বিবেচনা করিয়া সেই "সময়ের" সদ্ব্যবহার করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান ও সুখে থাকিতে পারেন। যেরূপ দোষ গুণ ব্যতিত কোন মনুষ্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বহু মন্দ স্বভাব দোষে দোষী হইলেও তাহার মধ্যে একটী না একটী মহৎ গুণ থাকে। আর যিনি সর্ব্বগুণে শোভিত তাহারও একটী দোষ পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক এই ব্রাহ্মণ স্বীয় বুদ্ধির দোষে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া এক্ষণে উদারান্নের নিমিত্ত অতি দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি অনাহারে অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন এবং আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিনীতভাবে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভু! আমার পিতা আপনাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমায় কোনরূপ দুঃখ পাইতে হইবে না স্থির করিয়া আপনার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইয়া আজ আমাদিগকে এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত কাতর হইতে হইল। পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই পাপ করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত ইহজন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে"। এইরূপ নানাপ্রকার কাতর উক্তিতে ব্রাহ্মণকেও কাতর করাইল; তখন তিনি তাহার

পূর্ব্ব-সুখাবস্থা একবার স্মরণ করিলেন ও আন্তরিক দুঃখে হৃদয় পাষাণবৎ করিয়া অতি কষ্টে আপন দুঃখ গোপন রাখিয়া মৌখিক নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্যে ব্রাহ্মণীকে শ্রীবৎস ও পুণ্যশ্লোক নল রাজার দুঃখাবস্থা প্রকাশ করিয়া দুঃখ লাঘব করিবার প্রয়াস পাইলেন. কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষ নানা চিন্তার পর তাহার পিতৃ-উপদেশ স্মরণ হইল। একদা তিনি পিতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, "যখন অতিশয় দুঃখ অনুভব করিবে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে, সুখ আগত প্রায়। আর যখন অতিশয় সুখভোগ করিবে, তখন স্থির বুঝিবে যে দুঃখ আসন্ন প্রায়। ব্রাহ্মণ পিতৃদেবের সেই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া পূর্ব্বাবস্থা চিন্তা করিলেন ও অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কেননা পূর্ব্বে সুখভোগ করিয়াছেন সুতরাং এক্ষণে দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ পত্নীর সেই কাতর উক্তিতে নিরুপায় বিবেচনা করিয়া অবশেষ বনবাস করিতে মনস্থ করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে মঘাযুক্ত ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে তিনি পত্নীর নিকট মনে মনে জন্মের মত বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! আমার নিকট আসিয়া অবধি "সুখ" কিরূপ তাহা তুমি অনুভব করিতে পাইলে না, তজ্জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, এক্ষণে তোমায় সুখী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। অদ্যই আমি কোলঞ্চ রাজদ্বারে উপস্থিত হইব, অবগত হইলাম রাজা যজ্ঞ-আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনায়, অকাতরে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে ধন বিতরণ করিতেছেন। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণী সেই অশুভ দিনের তিথি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ স্বহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "আমি নিজে অন্ধা, সুতরাং আমার পক্ষে মঘাই প্রশস্ত"। কিন্তু পাথেয় খরচের নিমিত্ত কিছু অর্থের প্রয়োজন, অতএব সাধ্যমত তোমায় সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। অবলা সরলহৃদয়া নারী স্বামীর চাতুরী অবগত না হইয়া লোভের বশবর্ত্তিনী হইলেন এবং

অতি কষ্টে পাঁচটী পয়সা সংগ্রহপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তিনিও উহা হস্তগত করিয়া পত্নীর পরিণাম চিন্তা না করিয়া "দুর্গা" নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ দুঃখে সংসারের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি কষ্টে কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক দীর্ঘাকায় জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ লাভে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বিনয় বচনে তিনি কোথায় গমন করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল নানাপ্রকার বাক্যালাপের পর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে গুরুপদে মান্য করিয়া বলিলেন, প্রভু! আমি সংসার ত্যাগ করিয়া অবধি অত্যন্ত মনকষ্টে আছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এরূপ একটী উপদেশ দান করুন যদ্বারা আমার দুঃখ লাঘব হয়। ব্রাহ্মণের কাতর মিনতিতে সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার নিকট উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক উপদেশের নিমিত্ত একটী পয়সা দান করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ গৃহিণীর পরিণাম চিন্তা করিয়া এত কাতর হইয়াছিলেন যে, বিনা আপত্তিতে তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া একটী পয়সা প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী তখন প্রথম উপদেশ এইরূপ প্রদান করিলেন যে, "যব যেসা তব তেসা রও"। ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় পয়সা যাচিঞা করিলেন। দ্বিতীয় পয়সায় তিনি এইরূপ উপদেশ শিক্ষা করিলেন। "যব কুছ চিজ ফেকোগে আচ্ছি করকে দেখকে তব ফেকিও।" তৃতীয় বারে অবগত হইলেন যে, "জেনানাকো পাস কভি গোপন বাত মাৎ বলিয়ে"। এইরূপে বারম্বার পয়সা দিয়া মনোমত একটীও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন না, তথাপি পুনর্ব্বার পয়সা প্রদানে গুরুজীকে আর একটী ভাল উপদেশের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "রাজাকো পাস কভি ঝুটা বাত মাৎ বলিয়ে"। এবার সন্ন্যাসীকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন, কেননা উপর্য্যুপরি চারিটী পয়সা

লোপ হইল, অথচ ইচ্ছানুরূপ একটীও উপদেশ না পাইয়া দুঃখে তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

অপরাহ্নকালে তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া অবশিষ্ট পয়সাটীতে সামান্যরূপ জলযোগ করিয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিলেন এবং নিকটস্থ একটী সরোবরে এক সুবর্ণ পক্ষযুক্ত বিহঙ্গকে অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যদ্যপি আমি এই স্বর্ণ পক্ষযুক্ত বিহঙ্গমটি আয়ত্ব করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাকে বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব সন্দেহ নাই, এইরূপ স্থির করিয়া অতিকষ্টে সেই পক্ষীটি আয়ত্ব করিলে পর, বিহঙ্গম জিজ্ঞাসা করিল, হে ব্রাহ্মণ! তুমি কি নিমিত্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অধর্ম্মাশ্রয়পূর্ব্বক আমার প্রাণনাশে অগ্রসর হইতেছ? স্থির জানিও যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করেন তাহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হয়। তুমি যাহাদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য অধর্ম্ম করিবে, তাহারা কি তোমার পাপের ফলভোগ করিবে? একদা আমি তোমারই নিকট তোমার প্রিয়তমা পত্নীকে পুণ্যশ্লোক নল রাজার উপাখ্যান বলিতে শুনিয়াছিলাম, সেই পুণ্যাত্মার চরিত্রে প্রতিপদে ধর্ম্মাশ্রয় অবগত হন নাই কি? পক্ষীর মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, পক্ষীবর! বলদেখি আমি কিরূপে অধর্ম্ম করিতেছি? ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থলোভে তোমায় আয়ত্ব করিয়াছি, ইহাতে যদ্যপি অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে রাজ্যেশ্বরেরা মৃগয়াছলে বিনাদোষে যে সকল মৃগ বধ করেন, তাহাতে কি তাঁহাদের অধর্ম্ম হয় না? তদুত্তরে পক্ষী বলিল, "রাজারা আমোদপ্রিয় হইয়া মৃগয়া করেন, আর তুমি লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমার জীবন নাশে উদ্যত হইয়াছ অতএব রাজাদের মৃগয়ার সহিত তোমার তুলনা হয় না। হে ব্রাহ্মণ! ধর্ম্মে মতি রাখিও"। সম্প্রতি তুমি গুরুর নিকট যে চারিটী উপদেশ লাভ করিয়াছ, উহা হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক পালন করিতে চেষ্টা করিবে তাহা হইলে নিশ্চই অচিরে সুখী হইতে

পারিবে। বিহঙ্গমরূপী ধর্ম্ম এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত হইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ পক্ষীর কথামত গুরুর উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে গ্রাম্য বালকগণ তাহাকে পাগল জ্ঞানে নানাপ্রকার কৌতুক করিতে আরম্ভ করিল, তখন তিনি সন্ন্যাসী প্রদত্ত প্রথম উপদেশটি স্মরণ করিলেন, "যব যেসা তব তেসা রও"। এবং এই শ্লোকের প্রতি অক্ষরের মর্ম্ম অনুভব করিয়া বালকদিগকে কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া বরং তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং আবশ্যক মত কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। এই ঘটনা হইতে সকলকে বুঝিতে হইবে যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সময় মনুষ্যের বুদ্ধিরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলে পর একদা একটী অপরিচিত লোক গ্রামমধ্য পথ দিয়া গমন করিতে করিতে দৈবাৎ পদস্খলিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন গ্রামবাসীরা রাজদণ্ড ভয়ে সকলে মিলিত হইয়া এই পরামর্শ করিলেন যে, এই মৃত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় পতিত থাকিলে নিশ্চয় আমাদের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ব্যক্তি কোন জাতি ইহা আমাদের অজ্ঞাত, আমরা কিরূপে ইহাকে স্পর্শ করিব? এইরূপ নানা তর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, ঐ পাগলা ব্রাহ্মণকে অর্থলোভে বশীভূত করিয়া তাহারই দ্বারা মৃতদেহ নদীগর্ভে নিপাতিত করিতে হইবে। লীলাময়ের ইচ্ছায় কর্ম্মসূত্র ব্রাহ্মণের সহায় হইলেন এবং তাহার দুঃখ মোচন করিবার জন্য যথাসময়ে সেই মৃতদেহের নিকট ধাববান করাইলেন। গ্রামবাসীরা পাগলাকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদিত মনে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং অর্থলোভে বশীভূত করিয়া তাহাদের অভীষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া লইলেন।

সময় গুণে ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় উপদেশ স্মরণ হইল, "যব কুছ চিজ্ ফেকোগে আচ্ছি কর্‌কে দেখ্‌কে তব ফেকিও"। তখন তিনি গুরুর

উপদেশ মত মৃত ব্যক্তির আপাদ-মস্তক পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন যে, ঐ মৃত ব্যক্তির কটিদেশে একটী থলির (গেঁজের) মধ্যে অনেকগুলি সোনার মোহর বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া মোহরগুলি হস্তগত করিলেন, কিন্তু বহুদিবস পর এতগুলি মোহর এই নিঃসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া কোথায় রাখিবেন, এই চিন্তায় তাহাকে কাতর হইতে হইল অবশেষ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিছুদিন পর শ্রীমতী কমলাদেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণ একখানি মুদির দোকান করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দুই একখানি মোহর ক্রমান্বয়ে বিক্রয় করিয়া ইচ্ছামত আপন দোকান খানির উন্নতি সাধন করিলেন। অল্প-দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিয়া গ্রামবাসীরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে পাগলা এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, উহা জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কমলাদেবীর কৃপায় ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকট সকলকেই পরাস্ত হইতে হইল ; অবশেষ গ্রাম-বাসীরা তাহার পত্নীর নিকট সন্ধান পাইবেন, এই আশায় ব্রাহ্মণীকে তথায় আনায়নপূর্ব্বক সুখে বসবাস করিতে উপদেশ দিলেন।

ব্রাহ্মণ গ্রামবাসীদের আন্তরিক ভাব অবগত না হইয়া তাহাদের উপদেশ মত ব্রাহ্মণীকে আনয়নপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীরা পাগলের উন্নতি অবস্থা জানিবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন যে প্রত্যহ তাহা-দের আপন আপন পত্নীদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণীর নিকট সন্ধান লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাহাদিগের নিকট সময় চাহিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সেই রাত্রিতেই ব্রাহ্মণের নিকট উন্নতি অবস্থার বিষয় জানিবার জন্য জেদ্ করিতে লাগিলেন। কমলার কৃপায় এক্ষণে সেই মূর্খ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি পত্নীর মনোভাব সমস্তই অবগত হইলেন এবং গুরুজীর তৃতীয় উপদেশটি চিন্তা করিলেন। ব্রাহ্মণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ব্রাহ্মণী বারবার অনুরোধ

করিতে লাগিলেন তখন তিনি প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত বলিলেন, দেখ প্রিয়ে! আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তোমায় বলিতে বিস্মরণ হইয়াছিলাম তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, এইরূপ প্রবোধ দিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—তোমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পথি-মধ্যে পয়সাগুলির সাহায্যে জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম পরদিবস কোথাও কিছু সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনাহারে দুঃখিত মনে নদীগর্ভে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলাম দৈবক্রমে সেই দিন ভীম একাদশী তিথি থাকায় অভাবে আমি নির্জ্জলা উপবাস করিলাম এবং মনদুঃখে তোমার মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই পথের প্রান্তভাগে নদীতীরে আকন্দ বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবার মানসে আকন্দের দুগ্ধ (আটা) চক্ষে নিক্ষেপ করিয়া অন্তিম সময় সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী শ্রীমধুসূদনের শ্রীচরণে আমার দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সেই রাঙ্গাচরণ ধ্যান করিতে করিতে নদীগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিলাম, কিন্তু কৃপাময়ের কৃপায় ঐ তিথি নক্ষত্রের মাহাত্ম্যে আমি অন্ধের পরিবর্ত্তে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইলাম এবং নদীগর্ভে যাবতীয় মণি মুক্তা সকল দেখিতে পাইয়া সাধ্যমত সংগ্রহ করিলাম, ঐ সকল মণিমুক্তা বিক্রয় করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জন হইয়া-ছিল তদ্বারা এই দোকান করিয়াছি। আমার অনুরোধ, তুমি এই গোপনীয় বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, তাহা হইলে আমাদের বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পরদিবস তাহার সঙ্গিনীরা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে অবোধ ব্রাহ্মণী সরলচিত্তে তাহাদের নিকট এই গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণীর উপদেশমত ভীমএকাদশী তিথিতে নির্জ্জলা উপ-বাস করিয়া রত্ন লোভে আকন্দ আটা চক্ষে লেপনপূর্ব্বক নদীগর্ভে আশ্রয় লইবামাত্র আকন্দের দুগ্ধ জল সংযোগে সকলেই অন্ধ হইলেন এবং অতি কষ্টে

তীরে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের চাতুরী অবগত হইলেন, তখন তাহারা সকলে ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ রাজ আহ্বানে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং হুজুরে হাজির হইয়া সন্ন্যাসীর চতুর্থ উপদেশ মত রাজসমীপে করজোড়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন। রাজা সরলহৃদয় ব্রাহ্মণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। তখন এই ব্রাহ্মণ গুরুদেবের উপদেশ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং আপন দোকান বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণীসহ স্বদেশ যাত্রা করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

মাস, বার, তিথি, নক্ষত্র ও লগ্ন ফল।

সংসারী ব্যক্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শুভাশুভ ফল জানিবার নিমিত্ত লগ্ন, বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুষ্ঠির ফল, সকল ব্যক্তি আচার্য্যের সাহায্য ব্যতীত জানিতে পারেন না, এই নিমিত্ত সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত যে তিথিতে, যে বারে, যে মাসে ও যে লগ্নে জন্মাইলে সন্তান যেরূপ ফলভোগী হয় উহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

মাস ফল।

বৈশাখ মাসে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে—সুশীল, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মজ্ঞ বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত ও সর্ব্বজন প্রিয় হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসে—সুচতুর, প্রবাসী, শাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষমাশীল ও দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিমান হয়।

আষাঢ় মাসে—নীচসংসর্গ প্রিয়, কামী, বাচাল, অমিতব্যয়ী ও রোগযুক্ত হয়।

শ্রাবণ মাসে—ধনশালী, বুদ্ধিমান, দাতা, সুশ্রী, দীর্ঘজীবী ও সর্ব্বজন প্রিয় হয়।

ভাদ্রমাসে—গুণগ্রাহী, বুদ্ধিমান, ধীর, কুটিল ও সুখভোগী হয়।

আশ্বিন মাসে—সুখী, দয়াবান্, সঙ্গীতপ্রিয়, রাজানুগ্রাহী, ভক্তিবান ও বুদ্ধিমান হয়।

কার্ত্তিকমাসে—জ্ঞানবান, ধনাঢ্য, দেবভক্ত, বুদ্ধিমান, বাচাল ও ক্রয় বিক্রয় বিশারদ হয়।

অগ্রহায়ণমাসে—কামী, সর্ব্বভুতের হিতকারী, তীর্থগামী প্রবাসী, সাধু-চরিত্র ও সৎকর্ম্মী হয়।

পৌষমাসে—কবি, শান্ত, কৃশাঙ্গ, স্থির বুদ্ধি, ব্যয়শীল, দাতা, কষ্টশীল, বহুপোষক, দয়াবান ও ধীর হয়।

মাঘমাসে—বহু পুত্রের জনক, সদাচার, বিষয়ে অনুরক্ত, সুশ্রী, আনন্দ হৃদয় বিদ্যাবান ও বংশ গৌরবান্বিত করে।

ফাল্গুনমাসে—প্রিয়ভাষী, দাতা, ক্ষুধাশীল, বহু ক্লেশযুক্ত এবং কামুক হয়।

চৈত্রমাসে—দাতা, মিষ্টভাষী, সৎকর্ম্মী, শুচিশীল, দেব দ্বিজভক্ত, দয়াশীল, সুখী ও ভোগী হয়।

লগ্ন ফল।

কোষ্ঠি প্রদীপের মতানুসারে জন্ম সময়ের রাশির অবস্থিতি কালকে লগ্ন বলে। মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন্ সময়ে জন্মিলে কি প্রকার ফল প্রদান করে উহাই প্রকাশিত হইল।

মেষে জন্মিলে পুত্র—অত্যন্ত ক্রোধী, কৃপণ, লোভী, লোকপূজ্য বিদেশ গমনে অভিলাষী, দাতা, অনৃশংস, স্খলিতপ্রতিজ্ঞ ও ধনী হয়।

বৃষে—শূর, ক্লেশসহিষ্ণু, শত্রুঘাতী, কৃতকর্ম্মা, গৃহী, সঞ্চিত ধনে ধনী, দীর্ঘজীবী, স্থিরবুদ্ধি ও সুশ্রী হয়।

মিথুনে—বিনীত, মৃদুস্বভাব, মনোহর, মধুরহাস্যযুক্ত, সঙ্গীতপ্রিয়, বদান্য, বিমাতা কর্ত্তৃক পালিত, সর্ব্বত্র আদরনীয় ও সুখী হয়।

কর্কটে—মেধাবী দ্রুতগতি সম্পন্ন, সৎকর্ম্মান্বিত, গুপ্তবিদ্যা, অভিজ্ঞ, ধনভোগী, শ্বাপদান্বিত, বিপক্ষবিনাশী তুরঙ্গমবৎ, দৃঢ়কায় ও স্ত্রৈণ হয়।

সিংহে—ভার্য্যা, পুত্র ও ধনত্যাগী, নীচবুদ্ধি, নিজেকে প্রভু জ্ঞানবিশিষ্ট, স্বধর্ম্মচ্যুত মাংসপ্রিয় সঞ্চবিত্ত, কদর্য্য ও হীনদৃষ্টিসম্পন্ন হয়।

কন্যাতে—গন্ধর্ব্ব বিদ্যাপটু, অত্যন্ত কার্য্যকুশল সত্যবাদী, কাব্যশাস্ত্র বেত্তা, দাতা, ভোক্তা, সুশীল, ধীরপ্রকৃতি এবং পুত্র কলত্রান্বিত হয়।

তুলায়—কুমন্ত্রীলোলুপবিহীন, ক্রূর, ধনপুত্রবিহীন এবং মেধাবী হয়।

বৃশ্চিকে—জীর্ণ, পৃথু ও নম্রদেহ এবং দীন, পরান্নভোজী সুখহীন, শূর, অসহিষ্ণু পূর্ব্ববিত্তসম্পন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধেয়ী হয়।

ধনুতে—বহু বিদ্যায় সুনিপুণ, দাতা, রাজপূজ্য, সফলার্থ সংযুক্ত, পরোপকারী, সুশীল ও সুন্দর-দেহী হয়।

মকরে—বহু কর্ম্ম নিপুণ, ধৈর্য্যবান, উপকারী, স্বকীয় ইচ্ছানুসারে বিহারী, মুখর, দাতা, অহঙ্কারী, শুদ্ধচিত্ত এবং ঐ সন্তানের দন্ত, ওষ্ঠ ও মুখ অত্যন্ত পুষ্ট হইয়া থাকে।

কুম্ভে—মূর্খ, কুকর্ম্মী, ক্রূর, অলসদেহী, নাসিকাস্যচাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, মলিন, নীচ সহবাস, নীচগতি ও কদর্য্য কার্য্যান্বিত হইয়া থাকে।

মীনে—বিজ্ঞানবিৎ, বুদ্ধিমান, মনোহর বৃত্তিযুক্ত, প্রশস্ত নাসিকা ও প্রশস্ত চক্ষুবিশিষ্ট, কন্দর্প, বিদ্যাপটু অতিশয় ধীর ও ভোগযুক্ত হয়।

বার ফল।

রবিবারে জন্মিলে—সদ্বক্তা, পরদ্রব্য অনমুরক্ত, সাধুজনের প্রিয়, তীর্থগামী, দয়াবান্, অল্পধনে ধনী ও মতিমান্ হয়।

সোমবারে—প্রফুল্লবদন, বহুভোগী, কামার্ত্ত, মৃদুভাষী ও প্রিয়দর্শন হয়।

মঙ্গলবারে—সাহসী, ক্রোধী, ক্রূর, কৃপণ, শ্যামবর্ণ, দম্ভান্বিত ও পরদারিক হয়।

বুধবারে—শাস্ত্রজ্ঞ, সঙ্গীতপ্রিয়, বন্ধুজন মান্য, চতুর ও বুদ্ধিমান হয়।

বৃহস্পতিবারে—উচিতবক্তা, শান্ত, সুচতুর, বহুপালক, দয়াবান, দৃঢ় বুদ্ধি ও বহুমানী হয়।

শুক্রবারে—শাস্ত্রবিৎ, বন্ধুপ্রিয়, দীর্ঘজীবী, স্বজনপোষক, কুটিল ও বহু পুত্রের জনক হয়।

শনিবারে—খলস্বভাব, রোগী, দরিদ্র, বন্ধুহীন, দুর্ব্বল, কৃতঘ্ন ও কুকর্ম্মে নিরত হয়।

তিথি ফল।

প্রতিপদে জন্মিলে—বলশালী, পুত্রবান, কুলশ্রেষ্ঠ, সুখদর্শন মনিকাঞ্চনাদিযুক্ত ও সদাচারী হয়।

দ্বিতীয়াতে—বলবান, গুণবান, কীর্ত্তিমান, দাতা ও বংশগৌরব হয়।

তৃতীয়াতে—সুন্দর, বলশালী, সত্যভাষী, ধনশালী ও তীর্থসেবী হয়।

চতুর্থীতে—ক্রূরহৃদয়, মিথ্যাবাদী, বন্ধুদ্বেষী, কৃপণ, ও ধনবান্ হয়।

পঞ্চমীতে—স্ত্রীমান্থ, পণ্ডিত ও শ্রীমান্ হয়।

ষষ্ঠীতে—ক্রূরকর্ম্মী, বহুরোগাক্রান্ত, বিত্তশালী ও সত্যপ্রিয় হয়।

সপ্তমীতে—সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত, শুচি সমন্বিত, দৈবকার্য্যে রত, পৈতৃক ধন বিনাশকারী, বহু কন্যার জনক, বিক্রমশালী ও গুণগ্রাহী হয়।

অষ্টমীতে—বলশালী, দয়ালু, বহুবাক্যপ্রয়াগী, ধীর, ধনী ও ক্ষীণ দেহ হয়।

নবমীতে—বিদ্বান, পরোপকারী, কৃপণ, সুখী ও আচার হীন হয়।

দশমীতে—বহু পুত্রের জনক, ধনশালী, পবিত্র, ধীমান ও উদার হৃদয় হয়।

একাদশীতে—চতুর, ধর্ম্মজ্ঞ, ক্লেশ সহিষ্ণু, সাধুজন প্রিয়, বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিরত হয়।

দ্বাদশীতে—ধূর্ত্ত, মোকর্দ্দমাবিচক্ষণ, চঞ্চল, সন্তানযুক্ত ও অতিথিপ্রিয় হয়।

ত্রয়োদশীতে—তীর্থদর্শী, ধর্ম্মশীল, দয়ালু, অলস ও বিনয়ী হয়।

চতুর্দ্দশীতে (শুক্লপক্ষে) অধার্ম্মিক, বঞ্চক, দরিদ্র, ক্রোধপরায়ণ ও তস্কর হয়।

চতুর্দ্দশী (কৃষ্ণপক্ষে প্রথম ভাগে) শুভ, দ্বিতীয় ভাগে পিতৃরিষ্ট, তৃতীয় ভাগে মাতৃরিষ্ট, চতুর্থ ভাগে মাতুলরিষ্ট, পঞ্চম ভাগে স্বীয়রিষ্ট এবং ষষ্ঠভাগে ধন ও বংশের হানিজনক হয়।

পূর্ণিমাতে—রূপবান, গুণবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান বিনয়ী, শিষ্টাচারী এবং শুদ্ধান্তকরণ হয়।

অমাবস্যাতে—অধার্ম্মিক, লম্পট, সাহসী, মন্দ স্বভাব, তস্কর কৃতঘ্ন ও ত্যাগী হয়।

চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যাতে জন্মিলে লক্ষ্মীহীন ও অধঃপতিত হয়।

নক্ষত্র ফল।

নক্ষত্র বিশেষ জন্মগ্রহণ করিলে সন্তানের ফলাফলের বিশেষত্ব হইয়া থাকে। কোন্ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল প্রদান করে উহাই প্রকাশিত হইল।

অশ্বিনিতে জন্মগ্রহণ করিলে—সুশ্রী, গুণবান্, উচ্চ হৃদয়, পুত্রবান্ ও রাজানুগৃহীত হয়।

ভরণীতে—অরিবিজয়ী, পবিত্র, দীর্ঘজীবী, প্রবাসী, ক্রূর ও দীর্ঘ শরীর বিশিষ্ট হয়।

কৃত্তিকায়—ক্রোধ পরায়ণ, বেশ্যাসক্ত ও উদরসর্ব্বস্ব হইয়া থাকে।

রোহিণীতে—স্থিরচিত্ত, দয়ালু, বন্ধুপ্রিয়, রোগবিশিষ্ট, অল্পভোগী ও শ্লেষ্মা প্রধান ধাত হয়।

মৃগশিরায়—বিজয়ী, প্রখরমূর্ত্তি, কামাতুর, সাহসী, ক্রোধসম্পন্ন, ধনবান্ ও পুত্রবান্ হয়।

আর্দ্রায়—ধার্ম্মিক, কৃপণ, চঞ্চল, বলবান্, ভোগযুক্ত ও প্রশন্নমনা হয়।

পুনর্ব্বসুতে—ধার্ম্মিক, বহু পুত্রবান্, পিতামাতার সেবাকারী, প্রবাসী ও দক্ষ হয়।

পুষ্যায়—কীর্ত্তিবান্, বিদ্যাবান্, সুখী ও দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন হয়।

অশ্লেষায়—কৃতঘ্ন, মূর্খ, ধূর্ত্ত, পিতৃ-মাতৃ-হন্তা নাস্তিক, প্রচণ্ড, কৃপণ, ধনী ও পুত্রবান হয়।

মঘায়—রাজানুগৃহীত কলহী, অল্প ধনী ও অল্প পুত্রক হয়।

স্বাতিতে—সুখী, ধনী ও বাহুরত্নের অধিপতি হয়।

পূর্ব্বফাল্গুনীতে—প্রশন্নমনা, ধনবান্, প্রবাসী ও সকলের প্রিয় হয়।

উত্তর ফাল্গুনীতে—দাতা, লোকপ্রিয়, কুটীল, ধনী ও স্বীয় ভার্য্যা দ্বারা অসুখী হয়।

হস্তায়—সত্যপরায়ণ প্রতাপশালী, গীতবাদ্যনিপুণ, গুণবান ও প্রভুত্বকারী হয়।

চিত্রায়—ধনী, কর্ম্মঠ, ভাগ্যবান, সম্মানী ও কীর্ত্তিমান হয়।

অনুরাধায়—কামাতুর, শত্রুজয়ী, প্রফুল্ল ও পরবিত্ত ভোগী হয়।

বিশাখায়—ধার্ম্মিক, পণ্ডিতদ্বেষী ও প্রবাসী হয়।

জ্যেষ্ঠায়—রূপশালী, পুত্রবান্, ক্রোধী, বিত্তবান্, বিবাদপ্রিয় ও কুটবুদ্ধি সম্পন্ন হয়।

মূলায়—অস্থিরচিত্ত, পিতৃ মাতৃহন্তা, পরোপকারী ও দরিদ্র হয়।

পূর্ব্বাষাঢ়ায়—দেবতাপ্রিয়, কর্ম্মঠ, সম্মানী ও শত্রুজয়ী হয়।

উত্তরাষাঢ়ায়—ধূর্ত্ত, কামী, মায়াবী, বিদ্বান্, বন্ধুযুক্ত, শীর্ণদেহী ও স্ত্রীর অনুগত হয়।

শ্রবণায়—ধার্ম্মিক, দেবদ্বিজভক্ত, তীর্থদর্শী, বহু পুত্রক ও ভাগ্যবান হয়।

ধনিষ্ঠায়—পরদার রত, কীর্ত্তিমান, কলহপ্রিয়, শাস্ত্রজ্ঞ ও দীর্ঘদেহী হয়।

শতভিষায়—বাচাল, ঐশ্বর্য্যশালী, ধূর্ত্ত, অলস ও কলহপ্রিয় হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদে—পক্ষপাতী, নম্র, দাতা, প্রিয়ম্বদ ও গুণশালী হয়।

উত্তরভাদ্রপদে—পুণ্যাত্মা, বলবান, সুবুদ্ধি ও ক্রোধী হয়।

রেবতীতে—বুদ্ধিমান, সুন্দর, বিদ্বান ও শত্রুঘাতী হয়।

সন্তান ভূমিষ্ট হইলে গৃহীব্যক্তি সময় নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক দৈনিক পঞ্জিকাতে যে বার, তিথি, রাশি ও নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন উহা এই গণনার মধ্যে মিলন করিয়া দেখিলে সন্তানের শুভাশুভ ফল সকল সহজে অবগত হইতে পারিবেন।

মনুষ্য মাত্রেই নবগ্রহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকেন, সুতরাং প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে ঐ সকল গ্রহের স্তব করিতে পারিলে তাহার দিন শুভয় শুভয় অতিবাহিত হয় কিন্তু গ্রহগণের ফলভোগ করিতে হইবে তাঁহারা

সন্তুষ্ট থাকিলে শান্তভাবে ফলদান করেন অতএব সুধী ব্যক্তির প্রত্যহ নব-গ্রহের স্তব করা উচিত।

গ্রহগণের ফলভোগ স্বয়ং গুরুকেও ভোগ করিতে হয়। এ বিষয়ে একটী উপাখ্যান প্রকাশিত হইল।

নবদ্বীপান্ত নামে এক গ্রামের প্রান্তভাগে দেবনারায়ণ নামে এক আচার্য্য বাস করিতেন। তথায় একটী চতুষ্পাটী টোল ছিল, দেবনারায়ণ ঐ টোলে শিক্ষাদান করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়া গুণানুসারে উপাধি প্রদান করিতেন, যে কোন ছাত্র ক্ষমতানুযায়ী তাঁহার নিকট মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে তাঁহার আজ্ঞানুসারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে হইত। আচার্য্য দেবনারায়ণ মহাশয়ের অসাধারণ ক্ষমতা ও আশীর্ব্বাদে কখন কোন ছাত্রকে কোথাও পরাজয় স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই, এইরূপে দেবনারায়ণ ত্রিভুবন বিখ্যাত হইয়াছিলেন এমন কি স্বর্গেও এই মহাত্মার কীর্ত্তি ঘোষিত হইত।

একদা পরীক্ষার নিমিত্ত নবগ্রহ সকল নয়টী সুশ্রী কুমারের বেশে দেবনারায়ণ আচার্য্য মহাশয়ের বাস-ভবনে বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। এতাবৎকাল দেবনারায়ণের কোন সন্তান সন্ততি না থাকায় এই সকল বালকরূপী গ্রহগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং ব্রাহ্মণী বাৎসল্যভাবে ঐ নয়টী বালককে স্বীয় পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। গ্রহগণ এইরূপে তাঁহাদের যত্নে পালিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে টোলের যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু টোলের অপর ছাত্রেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাদের প্রতি কু-ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এই সকল দর্শন করিয়া গ্রহগণ নয়জনে পরামর্শ করিয়া নিজপুরে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

পরদিবস প্রত্যুষে সকলে গুরুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, হে গুরো! আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলে সুখে দিনাতিপাত করিয়া যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি উহাতেই আমরা সন্তুষ্ট ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি, এক্ষণে গুরু-দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন। আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের মায়ায় অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার নিকট তাঁহারা বিদায় প্রার্থনা করিবেন এরূপ আশা তিনি পূর্ব্বে কখন করেন নাই, সুতরাং এই মর্ম্মভেদী বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে আন্তরিক দুঃখিত হইতে হইল এবং বহুক্ষণ ধরিয়া সেই চাঁদমুখ সকল নিরীক্ষণ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, তখন তিনি সেই বালকরূপী গ্রহগণকে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন, বৎসগণ! তোমরা কোথা হইতে আমার নিকট আসিয়াছ? তোমাদের ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে সঠিক পরিচয় প্রদান করিয়া সাধ্যমত দক্ষিণা প্রদান কর। তখন তাঁহারা গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপন আপন প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। আচার্য্য মহাশয় এই অসম্ভব ঘটনা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় পত্নীকে সকল বিষয় জানাইলেন এবং বহু বাদানুবাদের পর তাঁহাদের গুরুজী, আটজনের প্রতি ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা কিন্তু শনিঠাকুরের প্রতি আদেশ করিলেন, বৎস! তুমি সদয় হইয়া কেবল তোমার কোপদৃষ্টির ভোগ হইতে আমায় পরিত্রাণ করিলে আমায় যথেষ্ট দক্ষিণা দেওয়া হইবে। ছদ্ম-বেশী শনিঠাকুর, গুরুর কাতর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, প্রভু! আপনি সকল শাস্ত্রই অবগত আছেন আপনাকে অধিক বলিবার কিছুই নাই। দেখুন পার্ব্বতী পুত্র "গণেশ" আমার ভাগিনেয় হইয়াও আমারই কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া শ্বেত হস্তির শুণ্ডযুক্ত মুখ সংযোগে বিচরণ করিতেছে। অতএব জানিবেন জীব মাত্রকেই আমার ফলভোগ করিতে হয়। আমার ভোগের সময় চৌদ্দ বৎসর, চৌদ্দমাস, চৌদ্দদিন চৌদ্দদণ্ড নির্দ্ধারিত আছে.

কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হইয়া ন্যূনসংখ্যা চৌদ্দ দণ্ড সময় নির্দ্ধারিত করিলাম আশা করি আপনি আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। অগত্যা আচার্য্য মহাশয় উহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন।

কিছুদিন পরে সময় পাইয়া শনিঠাকুর গুরুজীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। তাঁহার কৃপায় আচার্য্য মহাশয়ের মৎসের ঝোল আস্বাদ করিতে বাসনা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীকে ঝোল রন্ধন করিবার অনুরোধ করিয়া মৎস্য আনিবার নিমিত্ত বাজারে গমন করিয়া একটী বৃহৎ রুই মৎসের মুণ্ড দেখিতে পাইলেন এবং উহাই ক্রয় করিলেন। এদিকে শনির কৃপায় সেই দেশের সুসজ্জিত রাজপুত্রের দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরুদ্দেশ হইল। মহারাজা সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া হত্যাকারীকে ধৃত করিতে আদেশ দান করিলেন। অনুচরগণ রাজ আজ্ঞায় সন্ধান করিতে করিতে পথিমধ্যে আচার্য্য মহাশয়ের হস্তে রাজকুমারের ছিন্নমস্তক দর্শন করিয়া তাহাকেই হত্যাকারী স্থির করিয়া রাজসমীপে হাজির করিলে শোকাতুর রাজা আচার্য্যের নৃশংস আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক কারাগারে আবদ্ধ রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং কি নিমিত্ত তাঁহার স্নেহের পুত্তলি একমাত্র কুমারকে হত্যা করিয়াছেন ইহার তত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত সুযোগ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। শনির কৃপায় আচার্য্যের পলকে প্রলয় উপস্থিত হইল, গুরুজী কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অকস্মাৎ বিপদে শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে আচার্য্যের এই গর্হিত হত্যাকাণ্ডের বিষয় প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইল। ব্রাহ্মণী মৎস্যের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় এই দুঃসংবাদে তাহাকে কাতর করিল কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী, বিপদ সময় ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শনিঠাকুরের বিষয় স্মৃতিপথে উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কোনরূপে রাজমহিষীর অন্দরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট

বারম্বার কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যাহাতে রাজা চৌদ্দদণ্ড বাদ তাঁহার স্বামীর বিচার করেন। ব্রাহ্মণীর কাতর অনুরোধে শোকাতুরা মহিষী পুত্রশোক সম্বরণপূর্ব্বক রাজসমীপে তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করাইয়া উহা মঞ্জুর করাইলেন। শনির ভোগ চৌদ্দ দণ্ড অতীত হইলে, মহারাজা দেখিলেন, তাঁহার স্নেহের কুমার তাঁহারই সম্মুখে খেলা করিতেছে এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে তিনি স্বপ্নবৎ সেই পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন, রাজকুমার নিকটে আসিলে তিনি বারম্বার স্নেহসহকারে মুখচুম্বন করিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার উত্তর করিলেন আমি ঘুমাইতে ছিলাম। তখন রাজা আচার্য্য মহাশয়কে বৃথা ক্লেশভোগ দিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার অনুতাপ করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলে রাজা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে মুক্তি-প্রদান করিলেন, এইরূপে ব্রাহ্মণী স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আচার্য্য মহাশয় তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন ঠাকুর, না জানি তুমি যাহার প্রতি পূর্ণ-মাত্রায় ভোগ প্রদান কর তাহাকে কতপ্রকার দুঃখভোগ করিতে হয় এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি নবগ্রহের স্তবে মনোনিবেশ করিলেন।

নবগ্রহের স্তব।

রবি। জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধান্তারিং সর্ব্ব-পাপঘ্নং প্রণতো হস্মি দিবাকরং

চন্দ্র। দিব্যাশঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরদার্ণব সম্ভবং।
নমামি শশিনং-ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট ভূষণং॥

মঙ্গল। ধরণীগর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহং॥

বুধ। প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেনা প্রতিমংবুধং।
সৌম্যং সর্ব্ব-গুণোপেতং নমামি শশিনঃসুতং॥

বৃহস্পতি। দেবতানা মৃষীনাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভং।
বন্দভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিং॥

শুক্র। হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমংগুরুং।
সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং॥

শনি। নীলাঞ্জন চয়প্রখ্যং রবিস্নুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দেভক্ত্যা শনৈশ্চরং॥

রাহু। অর্দ্ধকায়াং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দকং।
সিংহকায়ঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহং॥

কেতু। পলাল ধূম শঙ্কাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্দকং।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং॥

দক্ষিণে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন-যাত্রা।

দক্ষিণে, তীর্থ দর্শক যাত্রীরা পথিমধ্যে নিম্নলিখিত তীর্থ সকল দেখিতে পাইবেন যথা:—বালেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ। জাজপুরে বৈতরণী তীর্থ। ভুবনেশ্বরে একাম্রকানন বা অনাদিলিঙ্গ ভুবনেশ্বর। সত্যবাদী নামক গ্রামে সাক্ষীগোপাল এবং পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব।

তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি।

যিনি কুপ্রতিগ্রহ করেন না, কুস্থানে যান না, তিনিই তীর্থ যাত্রার ফল অধিকারী হন। যাহার দেহ ক্লেশ সহিষ্ণু, মন পবিত্র অহঙ্কারহীন, পরিমিত ভোগী জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ব সঙ্গ বিরহিত, তিনিই তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন। শ্রদ্ধাহীন নাস্তিক পাপী, সন্দিগ্ধমনা এবং কারণ সানুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ কখন তীর্থ ফল পান না। তীর্থে অধিকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাভ এবং অনধিকারীর পাপ ক্ষয় হয়। সুতরাং তীর্থ যাত্রার পূর্ব্বে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপ ক্ষয়ের জন্য গঙ্গাস্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্ব্ব উল্লেখিত নিয়মানুসারে শুভদিনে শুভ যাত্রা করিবেন।

তীর্থ-যাত্রায় কর্ত্তব্য।

রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট লইবার সময় সতর্ক হওয়া উচিত। এবং বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। যে স্থানে যাইতে হইবে কোন্ সময়ে সেখানে ট্রেন পৌছিবে উহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন। রাত্রিকালে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন, কেননা, স্থান অতিক্রম করিয়া যাইলে কষ্টে পতিত হইতে হয়। দ্রব্যাদি খরিদ করিবার সময় সাবধান হইবেন কারণ অনেক স্থানের অনেক দোকানদারগণ দালাল সঙ্গে থাকিলে সাধারণতঃ দ্বিগুণ মূল্য লইয়া থাকে। পরিষ্কার গৃহে বাসা এবং নির্ম্মল জল পান করা উচিত। পুরীধামে অনেক স্থানেই নানাপ্রকার ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ এই পবিত্রক্ষেত্র একে গরম দেশ, তাহাতে ইচ্ছামত আহার পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান হেতু এই যে, পুরীধামে কোন যাত্রীকে রন্ধন করিয়া আহার করিতে নাই। রাত্রিকালে আহারীয় দ্রব্যসকল খরিদ করিবার সময় উত্তমরূপে দেখিয়া লইবেন। দুগ্ধে বাসীদুগ্ধ

মিশ্রিত থাকে এবং মিষ্ট দ্রব্য সমূহের সহিত বাসী দ্রব্য থাকে। পীড়া হইলে অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে যেখানে যত তীর্থ আছে, পুরীর ন্যায় সমকক্ষ তীর্থ আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরী তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যত্নের সহিত সংগ্রহ করিবেন যথা :—সিদ্ধি, চন্দনকাষ্ঠ, শুদ্ধ পরিধেয় বস্ত্র, নূতন কাপড় ন্যূনকল্পে ৬ জোড়া। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রভৃতির জন্য ন্যূন সংখ্যা ৩ জোড়া, ছোট সাড়ি পাঁচ জোড়া দেবালয়ে দান করিবার নিমিত্ত:সাধ্যমত মসলা লইবেন। যজ্ঞোপবীত ৪০টা, গামছা ২ খানা, মজবুত তালা ছোট সাইজের ১টা, বিছানা একদফা হরিক্যান ল্যাম্প প্রস্তুত অবস্থায় ১টী, পঞ্চরত্ন পাঁচদফা, আসন অঙ্গুরী ৩ দফা, নারিকেল তিনটা, সুপারী ৪০টী, সিন্দুর চুবরী মায় সাজ ২দকা যোয়ানের আরক ১ বোতল বা ক্লোরোডাইন ১ শিশি এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যই তথায় পাওয়া যায়।

দক্ষিণ

বালেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ জীউর দর্শন-যাত্রা।

কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে বালেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। বালেশ্বর, উড়িষ্যা বিভাগের একটী জেলা মাত্র। বালেশ্বরের মধ্যে সুবর্ণরেখা ও বুড়াবলঙ্গ এই দুইটী নদীই প্রধান। ইহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। নদীগুলি প্রায় ছয়

মাস কাল শুষ্কাবস্থায় থাকে কিন্তু বর্ষা সমাগমে উঁহারা আপন আপন ক্ষমতানুসারে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, সেই সময় ঐ সকল নদীগুলিকে দেখিলে প্রাণে আতঙ্ক হয়।

বালেশ্বরের প্রধান রাস্তা কটকরোড। বালেশ্বরের অন্তঃর্গত রেবনা গ্রামে উৎকৃষ্ট কাঁশা ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হয়। এখানে মাটির অতি সুন্দর সুন্দর পুত্তল ও খেলনা যাহা বিক্রয় হয় সেই সকল খেলনা গুলি দেখিলেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বলিয়া ভ্রম হয়। বালেশ্বর প্রদেশ দেখিতে সুশ্রী স্বাস্থ্যকর, অনেক বহুমূত্র রোগী এইস্থানে আসিয়া নীরোগ হইয়া থাকেন। বালেশ্বরের বাজার বসিবার সময়, অপরাহ্ন কাল হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় অতীত হইলে দোকানীর নিকট যে কোন দ্রব্য চাহিবেন, "সব চলিগলা" শব্দ শুনিতে পাইবেন অর্থাৎ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এইরূপ শুনিতে পাইবেন। এইখানে বাজারে যে সমস্ত জিনিস বিক্রয় হয় ঐ সকল দ্রব্য কলিকাতা অপেক্ষা অনেক সুলভ মূল্য অনুমান হয় আমরা যে ফলকে কাঁঠাল বলিয়া থাকি তথায় তাহারা উঁহাকে পানসো বলে। আনারসকে সপুরী, পেয়ারাকে আমরুত, শশাকে ক্ষীরা, গুপারী ফলকে গুয়া, সিন্দূরকে ঝুড়া এইরূপ নূতন নূতন কত নাম শুনিতে পাইবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সন্ধ্যার পর বাজারের সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তার উপর, চা, দেশী রুটি ও পরটার দোকান ও সরবতের দোকান সকল সুসজ্জিত করিয়া রাস্তার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং দলে দলে খরিদ্দারগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দোকানীদিগকে আরও উৎসাহিত করে এদেশীয় যাত্রীগণ তথায় সেই সময় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে নানাপ্রকার বিদেশ ভাষা শ্রবণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই। বালেশ্বরের মিষ্টান্নের মধ্যে খাজা, অতি সুস্বাদু ও বিখ্যাত। এখানে যে সকল বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন তাহাদের অধিকাংশ বাক্যগুলি উড়িয়া ভাষার ন্যায় শুনিতে পাইবেন।

ন্থায় শুনিতে পাইবেন। তথাকার জমীদার চুঁচুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পদ্ম-লোচন মণ্ডল। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ বিষয় কর্ম্ম স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সুখ্যাতির সহিত পরিচালনা করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের মান রক্ষা করিতেছেন। বালেশ্বরে বহু লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ষ্টেশন হইতে বালেশ্বর নগরের মধ্যে বাসা লইয়াছিলাম, এখানে বীর হনুমানের উপদ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য প্রচুর পরিমাণে সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

এই বালেশ্বর নগরে মহা সমারোহে রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয়, সেই সময় ভক্তগণের একত্র সম্মিলনে এই নগর এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে নগরের মধ্যে আমরা যে বাসা লইয়াছিলাম, তথায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া নগরের শোভা দর্শন করিলাম, পরদিবস প্রত্যুষে ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে শ্রীশ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ-জীউকে দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। বালেশ্বরের দক্ষিণে যে বাঁধা পাকা রাস্তা ষ্টেশন পার হইয়া গিয়াছে, ঐ রাস্তার উপর দিয়া যাত্রা করিলে প্রায় ছয় মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ী যায়, তাহার পর হাটা মেটো পথে প্রায় এক মাইল গমন করিলে, একটী সুন্দর মন্দির নয়নগোচর হইবে; সেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন, লিঙ্গটি মৃত্তিকার নীচে গহ্বর মধ্যে অবস্থিত। পাণ্ডাদিগের নিকট অবগত হইলাম এই লিঙ্গরাজ পাষাণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন। দেবালয়ের সম্মুখে মালাকার-গণ প্রভুর পূজার জন্ম বিল্বপত্র ও পুষ্প সাজাইয়া রাখিয়াছে, আমরা সকলে সাধ্যমত বিল্বপত্র, পুষ্প, সিদ্ধি, গাঁজা, দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আশুতোষের অর্চ্চনায় রত হইলাম, তখন এক আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিলাম যে, যখন প্রভুর মস্তকে দুগ্ধ-জল ও সিদ্ধি প্রদান করিলাম, তখন গুটিকয়েক ভুড়ভুড়ি কাটিয়া দুগ্ধটুকু অন্তর্হিত হইল এবং সিদ্ধি ও জলটুকু পৃথক অবস্থায় বাহির হইল, এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিলে কাহার না প্রাণে আনন্দ হয়। এই

শিবমন্দিরের কিয়দ্দূর উত্তর দিকে গমন করিলেই ক্ষীরচোরা গোপীনাথ-জীউর সুন্দর দেবালয়ে পৌঁছিবেন। মন্দিরের ফটক হইতে ভিতরের দেবালয় ও নাটমন্দির সমস্তই সুন্দর। মন্দির মধ্যে প্রভু বংশী করে ধরিয়া ভুবনমোহন মূর্ত্তিতে ভক্তবৃন্দকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। একদা প্রভু গোপীদিগের ক্ষীর হরণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত গোপিণীগণ ক্ষীরচোরা নাম রাখিয়াছেন, এই শ্রীমূর্ত্তি যিনি একবার দর্শন করিবেন তিনিই মোহিত হইবেন সন্দেহ নাই।

এখান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে অসংখ্য তরুরাজি প্রায় পর্ব্বতমালা সগর্ব্বভরে স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার শিখরদেশ যেন নীলবর্ণ আকাশ স্পর্শ করিতেছে এইরূপ মনে হয়। ঐ পর্ব্বতমালা নীলগিরি নামে অভিহিত। এই মন-প্রাণ-বিমোহনকারী দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে আমরা ষ্টেশনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম। যে সকল যাত্রী মহানদীতে স্নান ও কটক সহরের শোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা কটক নামক সুবৃহৎ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া সহরের নানাপ্রকার শোভা ও প্রধান প্রধান স্থান সকল নয়নগোচর করিয়া আনন্দিত হইবেন।

বৈতরণী তীর্থ-দর্শন যাত্রা।

বালেশ্বর নামক ষ্টেশন হইতে জাজপুর রোড নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে "বৈতরণী তীর্থস্থান" প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ গো-শকটে যাইতে হয়। ষ্টেশন হইতে পার হইলে ইহার চতুর্দ্দিকেই বিস্তীর্ণ

মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, সেই জনশূন্য স্থান দেখিলে মনে ভয় হয়, ষ্টেশনের অনতিদূরে কয়েকখানি পুরাতন ভগ্ন মুদির দোকান ব্যতীত আর কোন আবাসস্থল দেখিতে পাওয়া যায় না। জাজপুর কটক জেলার একটী প্রধান নগর, বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে ইহা অবস্থিত। যে বৈতরণী নদীতে ভক্তগণ বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষগণের মুক্তি কামনায় আসিয়া থাকেন, সেই বৈতরণী নদী গোনাসা নামক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া সিংহভূম, মাণিপুর অতিক্রম করিয়া জাজপুর নগরকে দক্ষিণধারে রাখিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

বৈতরণী, বিষ্ণুপাদসম্ভূত গঙ্গার সদৃশী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মহারাজ যযাতিকেশরী এই জাজপুর নগর স্থাপিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। চতুরানন ব্রহ্মা স্বয়ং এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বেদ যখন অপহৃত হয়, সই সময়ে বরাহদেব যজ্ঞ কুণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হইয়া ঐ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তিনি এইস্থানে যজ্ঞবরাহ নামে বিখ্যাত আছেন। এক্ষণে সাধারণে যে স্থানটীকে মুকুন্দপুর বলে উহাই যজ্ঞস্থল, এইরূপ অবগত হইলাম।

এই তীর্থস্থানের সমস্ত পথিমধ্যে উড়ে পাণ্ডাদিগের প্রশ্ন উত্তরে অস্থির হইতে হয়। বাড়ী কোন জিলা, পাণ্ডা কে? কি নাম? কোন্ জাতি? এই একই প্রশ্নের প্রত্যেক পাণ্ডাকে উত্তর দিতে দিতে জ্বালাতন হইতে হয়। যে পাণ্ডার খতিয়ান বহিতে পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম দেখিতে পাইবেন তাহাকেই পাণ্ডা পদে বরণ করিয়া "বৈতরণী" তীর্থপদ্ধতিক্রমে সমস্তই সম্পন্ন করিতে হইবে। যে সকল নূতন যাত্রী তথায় উপস্থিত হইবেন, তাহারা ইচ্ছানুযায়ী নূতন পাণ্ডা মনোনীত করিয়া লইবেন।

বৈতরণীর যাবতীয় কার্য্য, গোদান প্রভৃতি এই বরাহদেবের মন্দিরে সম্পন্ন করিতে হয়। তথাকার পদ্ধতি অনুসারে এই তীর্থ কার্য্য

সম্পন্ন করিতে, গোমূল্য, ব্রাহ্মণ বরণের কাপড়, গোপূজার বস্ত্র, উপকরণের মূল্য ও ক্রিয়ার দক্ষিণা সর্ব্বশুদ্ধ সাত টাকা বার আনা মূল্য ন্যূনকল্পে ধার্য্য আছে। ঐ মূল্য পাণ্ডাঠাকুর পাইলেই সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে স্থানে বরাহদেবের মন্দির আছে ঐ স্থানকে বরাহক্ষেত্র বলে। মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীবরাহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মণ্ডপের পুরোভাগে প্রস্তরময় একটী চত্বর বিরাজমান আছে. এই চত্বরকে সাধারণে জগমোহন বলিয়া থাকে। এইস্থানেই ভক্তগণ বরাহদেবের সম্মুখে দুগ্ধবতী গাভী দান করেন এবং গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী পার হইয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়া লন। এই বৈতরণী নদীর তীরে যে বাঁধান ঘাট আছে ঐ ঘাটই দশাশ্বমেধঘাট নামে অভিহিত কথিত আছে স্বয়ং ব্রহ্মা এইস্থানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই ঘাটের নাম দশাশ্বমেধ ঘাট হইয়াছে। এই ঘাটের বিপরীত দিকে মহাকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরের দক্ষিণদিকে ধর্ম্মপুত্র যমরাজের স্ত্রী, ইন্দ্রাণী, যমের মাতা, মাসী, পিসী ও সর্ব্ব দক্ষিণদিকে স্বয়ং ধর্ম্মরাজ যমকে দর্শন পাইবেন। এইস্থানে সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পতিত হইবার সময় তাহার নাভীদেশ পতিত হয়, এই নিমিত্ত মা জগজ্জননী এইস্থানে "বিরজা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বিরজাদেবীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় সোপানে শোভিত পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন; ঐ কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্রহ্মকুণ্ডের ঠিক্ উত্তরে কক্ষমধ্যে যে একটী বাঁধান কূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেই কূপই নাভিগয়া নামে প্রসিদ্ধ। ভক্তগণ বৈতরণীতে আসিয়া এই নাভিগয়াতে পিণ্ড ও পুণ্যবতী নদীতীরে গাভীদান করিয়া পিতৃপুরুষদিগের স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাবীর গয়াসুরের নাভিদেশ ব্রহ্মার যজ্ঞ সময়ে এইস্থানে পতিত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম নাভিগয়া। এই পবিত্র স্থানে পিতৃ-

পুরুষদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে গয়াতীর্থের স্বরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরজীউর দর্শন-যাত্রা।

জাজপুর রোড নামক ষ্টেশন হইতে লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরজীউকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিলে, ভুবনেশ্বর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে শ্রীমন্দির যাইতে যে পাকা বাঁধা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তা দিয়া অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ গমন করিলে তীর্থস্থানে পৌছিতে পারা যায়। যে সকল যাত্রী এতদুর চলিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গোশকটে গমন করিতে হইবে। গমনকালীন পথে অসংখ্য মন্দির নয়নগোচর হইবে। তখন এইরূপ অগণিত দেবালয় আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হইবে না। ঐ সকল মন্দিরাভ্যন্তরে একটী করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কয়েকটী প্রধান লিঙ্গ ব্যতীত সকল লিঙ্গগুলিকে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা অর্চ্চনা হয়, এরূপ বোধ হয় না। ভুবনেশ্বর নগরের অপর একটী নাম একাম্র কানন। এই পবিত্র স্থান অষ্ট তীর্থসমন্বিত, সর্ব্বপাপহর, পরম দুর্ল্লভ, কোটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত যথার্থ কাশীতীর্থ তুল্য। উড়িষ্যা দেশে দক্ষিণসাগরের তীরে বিন্ধ্যপর্ব্বতোদ্ভূতা পূর্ব্বগামিনী একটী নদী আছে, সেই পবিত্র নদীর নাম গন্ধবতী, ইহা সাক্ষাৎ কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার ন্যায়। এইস্থানে বহুতর প্রাচীন দেবালয় বিদ্যমান আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই প্রভুর প্রকৃত নাম ত্রিভুবনেশ্বর।

বিন্দু সরোবরের তীর হইতে ত্রিভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি মনোহর। এইস্থানে একটীমাত্র অম্র বৃক্ষ থাকায় ইহার নাম একাম্র কানন

হইয়াছে। মন্দিরারণ্যের মধ্যে মধ্যে ছোট বড় বহুবিধ সরোবর ও কুণ্ড বিরাজিত; তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড, গৌড়িকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, রামকুণ্ড এই কয়টীই প্রধান কুণ্ড, কিন্তু বিন্দু সরোবর, কপিল হ্রদ, কোটিতীর্থ, পাপনাশিনী তীর্থ, মরীচি কুণ্ড এই কয়টীর মাহাত্ম্য আরও অধিক শ্রুতিগোচর হয়। জনশ্রুতি আছে এই মরীচি কুণ্ডের পবিত্র বারি পান করিলে বন্ধ্যানারী গর্ভবতী হন। শ্রীমন্দিরের পথে এই সকল দেবালয়, হ্রদ, কুণ্ড ও ক্ষেত্র সকলের শোভাদর্শন করিতে করিতে মনের আনন্দে বিন্দু সরোবরের তটে আসিয়া পৌছিবেন, এবং ইচ্ছানুরূপ পাণ্ডা মনোনীত করিয়া বাসা ভাড়া লইবেন। এইস্থানে অত্যন্ত বনজঙ্গল ও পর্ব্বতবেষ্টিত থাকায় সর্পগণ ইচ্ছামত বিহার করিয়া যাত্রীদিগের ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই দ্রুতগামী গতি অবলোকন করিলে মনে হয় যেন শঙ্করের শিঙ্গারব শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশমত তাঁহারই নিকটে গমন করিতেছে।

বিন্দু সরোবর।

বিন্দু সরোবর এক সুবৃহৎ দীঘিবিশেষ। ইহার জলরাশি সুনির্ম্মল স্ফটিক তুল্য এবং স্বাস্থ্যকর। এই সরোবরে কত লোক কতপ্রকার মৎস্য ছিপে ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই পবিত্র সরোবরের চারি দিক্ ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিক মণিকর্ণিকা, দক্ষিণ দিক ত্রিশূর, পশ্চিমদিক বিশ্রাম ও উত্তরদিক গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ। বিন্দু সরোবরের পূর্ব্বদিকে মণিকর্ণিকা নামে যে বাঁধা ঘাট আছে, যাত্রীগণ ভক্তিসহকারে উহার তটে বসিয়া তীর্থগুরু পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋষিগণ ও পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া পবিত্র জ্ঞান বোধ করিয়া থাকেন।

বিন্দু সরোবরের দৃশ্য ।

[১২৮ পৃষ্ঠা ।

বিন্দু সরোবরের উৎপত্তির কিম্বদন্তী এইরূপ ঃ—

একদা শঙ্কর পার্ব্বতীকে কাশীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! কাশীধামই কি আপনার একমাত্র পুণ্যতীর্থ? মহেশ্বর দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই একাম্রকাননের নামোল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! কাশী অপেক্ষা আমার প্রিয়তম স্থান ঐ "একাম্রকানন"। কাশী মাহাত্ম্য মর্ত্তে বিঘোষিত হইলে পর, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা সংযত হইলে আমি ঐ কাননে অবস্থান করিলাম, তথায় একটিমাত্র আম্রবৃক্ষ থাকায়, উহার একাম্র কানন নাম রাখিয়াছি। শঙ্করী ঐ একাম্রকানন-কাহিনী অবগত হইয়া সেই পুণ্য স্থান দর্শনের নিমিত্ত শঙ্করসমীপে স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করেন। মহেশ্বর পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আহ্লাদিতমনে ঐ একাম্রকাননের শোভা দর্শন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। গিরিসুতা পার্ব্বতী শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্তে এই একাম্রকাননে উপস্থিত হইয়া নানাবর্ণের নানাপ্রকার লিঙ্গ সকল দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া মনের সুখে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এই মনোহর কাননে কিছুকাল অবস্থিতির পর একদা পার্ব্বতী মহাদেবের অর্চ্চনার্থে পুষ্প ও বিল্বপত্র সংগ্রহ করিতে কীর্ত্তি ও বাস নামে অসুরদ্বয়ের নেত্রপথে পতিত হইলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা নভোমণ্ডলে স্থিরা সৌদামিনী সমতুল্য দেবীর সেই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া কামান্ধচিত্তে তাঁহার নিকট আপনাপন হেয় প্রবৃত্তি ব্যক্ত করিল। ভবানী গিরিসুতা পাপীষ্ঠদিগের ঐরূপ অকথ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত কলেবরে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। ত্রিপুরারি পার্ব্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, দেবি! ঐ দুরাত্মাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পুরাকালে ভ্রমিল নামে এক ধার্ম্মিক রাজা এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি বহু যাগ, যজ্ঞ করিয়া দেবতাদিগের নিকট পুত্র-

দিগের মঙ্গল কামনায় এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই পৃথিবীতে দেব, যক্ষ, পুরুষ কিম্বা কোনরূপ অস্ত্রে কেহ কখন আমার পুত্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে পারিবে না। সেই বীর পুত্রদ্বয়ের অল্প শক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া স্ত্রীজাতিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দেবতারা ঐ ধার্ম্মিক রাজার স্তবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিলাষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই পাপীষ্ঠদ্বয় সেই ভ্রমিল রাজারই পুত্র, উহারা আমার অবধ্য। আমার আজ্ঞানুসারে তুমি স্বয়ং উহাদের বিনাঅস্ত্রে পদদলিত করিয়া বিনাশ কর। রণপ্রিয়া শঙ্করী শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্তে সেই দুর্ম্মতি অজেয় অসুরদ্বয়কে পূর্ব্ব ক্রোধানল শান্তি করিবার মানসে পদদলিত করিয়াই বিনাশ করিলেন। যে স্থানে এই অসুরদ্বয়ের সহিত পার্ব্বতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, রণচণ্ডীকার পদভরে সেই স্থান কম্পান্বিত হইয়া বিশাল হ্রদে পরিণত হইয়াছিল। মহেশ্বরের কৃপায় ঐ হ্রদে সকল তীর্থের সারভাগ সংযুক্ত হওয়াতে ইহা পবিত্র পুণ্যময় তীর্থে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে বিন্দুবাসিনীর পদরেণু এইস্থানে পতিত হওয়াতে পূর্ব্ব হইতেই ইহা পবিত্র হইয়াছিল, ত্রিপুরারি, বিন্দুবাসিনীর নাম চিরস্মরণীয়া করাইবার নিমিত্ত সন্তুষ্টচিত্তে এই পবিত্র হ্রদের নাম বিন্দু-সরোবর রাখিয়াছেন। বিন্দু সরোবরের পথে যে সকল উচ্চ মৃত্তিকাময় প্রাচীর দেখিবেন, ঐ প্রাচীর মধ্যে বহু গর্ত্ত আছে দেখিতে পাইবেন, ঐ গর্ত্ত মধ্যে কখন কেহ লোষ্ট্রাক্ষেপ বা খোঁচা প্রদান করিয়া কৌতুক করিবেন না, কারণ ঐ গর্ত্তগুলিতে নানা জাতীয় বৃহদাকার সর্পগণ বাস করিয়া থাকে।

বিন্দু সরোবরের মধ্যস্থলে জগতী মন্দির নামে একটী পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত সুন্দর মন্দির আছে। বৈশাখ মাসের চন্দনযাত্রার সময় দ্বাবিংশতি দিবস ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ "চন্দ্রশেখর" দেব ঐ মন্দিরে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই সরোবরের দক্ষিণদিকে ভুবনমোহন ভুবনেশ্বর দেবের প্রধান মন্দির বিরাজমান আছে। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে অনন্ত বসুদেবের মন্দির,

মন্দির মধ্যে প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বলদেবের মস্তকের উপর অনন্তদেবের সহস্র ফণা, ছত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। ঐ প্রেমপূর্ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। এই সকল দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে করিতে শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরদেব জীউর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন। এই প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকই প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির মধ্যে এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, সম্মুখে "অরুণস্তম্ভ" নামে একটী সুন্দর স্তম্ভ দেখিতে পাইবেন। তৎপরে ভোগ মণ্ডপ, তাহার পর নাটমন্দির। শ্রীমন্দির বা প্রধান মন্দিরের দুইটী পৃথক প্রাঙ্গণ আছে তন্মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির বিদ্যমান আছে এবং দুইটী বৃহৎ কুপ আছে। ঐ কুপের জল কেবল ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই মধ্য প্রাঙ্গণ হইতে জগদ্বিখ্যাত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত ত্রিভুবনেশ্বরের সেই অত্যুচ্চ নানা চিত্রে শোভিত শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই; তৎপরে ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারে চারিটী পয়সা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই চারিটী পয়সা হইতে এক পয়সা মন্দির মেরামতি, এক পয়সা পূজারী ব্রাহ্মণ, এক পয়সা পাণ্ডা ঠাকুর আর অবশিষ্ট পয়সাটি বাবার সেবার জন্য জমা হইয়া থাকে। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে যে একটী বিদেশী ভাষায় শ্লোক মুদ্রিত আছে, পাণ্ডাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইলাম যে, কেশরীবংশীয় রাজা ললাটেন্দু কেশরীর রাজত্বকালে এই ভুবনেশ্বরের মন্দির বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয় এবং বিশ্বকর্ম্মা যে অদ্ভুত শিল্পকর ছিলেন, উহা এই মন্দির হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে; ভুবনেশ্বরের প্রধান মন্দিরের চারিপাশেই নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক হস্ত পদ ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছেন এবং এক স্থানে একটী মন্দির মধ্যে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীমন্দিরের মধ্যভাগ অন্ধকারে পরিপূর্ণ। পাণ্ডা ঠাকুর প্রদীপ সাহায্যে

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, উঁচু নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়া গর্ভ গৃহে উপস্থিত করান। গর্ভ গৃহে সেই দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বরজীউর সুবৃহৎ লিঙ্গ দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিয়া ভক্তিদান করিবেন, কারণ ভক্তি বিনা মুক্তি হওয়া যায় না।

এই লিঙ্গরাজের প্রস্তরময় মূর্ত্তির ব্যাস প্রায় নয় ফিট, ইহার চতুর্দ্দিক কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা বেদী বাঁধান ও সুবর্ণমণ্ডিত আছে। ঐ বেদীর একদিক প্রদীপের মুখের ন্যায় সূক্ষ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শীর্ষস্থানে একটী শ্বেত রেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেবালয়ের একপ্রান্তে প্রভুর বাহন বৃষমূর্ত্তি অবস্থিত আছে।

এই পবিত্র স্থানে মহারাজ ললাটেন্দুর বর প্রার্থনায় মহেশ্বরের কৃপায় প্রসাদে জাতিভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে অর্থাৎ এই তীর্থ স্থানে প্রসাদে জাতি-ভেদ নাই। প্রভাতে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হয় এবং পূজারী গণ আরতি করিয়া থাকেন। এইরূপে এগার ঘটিকার সময় যে শেষ মধ্যাহ্ন ভোগ হয় 'ঐ ভোগে অন্ন, ব্যঞ্জন মালপোয়া প্রভৃতি প্রদানে ভোগ হইয়া থাকে। সেই বিরাট ভোগ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ভোগের প্রসাদ ভাল পাণ্ডা ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট ভোগ আসে না। প্রভু ভুবনেশ্বরজীউর সমস্ত দিন মধ্যে চৌদ্দ বার ভোগ হয়।

যে দিন এই তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইয়া যাঁহাকে পাণ্ডা বলিয়া মনো-নীত করা যায়, সেই দিবস তিনি যাত্রীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রসাদ দিয়া থাকেন। এই ভুবনেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। এই মন্দিরের গাত্রে যে সকল কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ আছে, উহাতে দেবমূর্ত্তি ব্যতীত কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তি ও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরসংলগ্ন অলিন্দগুলিতে একটী করিয়া, কৃষ্ণ প্রস্তরের অতি সুন্দর দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দির বহুকাল বেমেরামতি অবস্থায় থাকিয়া ইহার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দুঃখের বিষয়

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দির।

Lakshmibilas Press.

সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, উঁচু নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়া গর্ভ গৃহে উপস্থিত করান। গর্ভ গৃহে সেই দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বরজীউর সুবৃহৎ লিঙ্গ দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিয়া ভক্তিদান করিবে, কারণ ভক্তি বিনা মুক্তি হওয়া যায় না।

এই লিঙ্গরাজের প্রস্তরময় মূর্ত্তির ব্যাস প্রায় নয় ফিট, ইহার চতুর্দ্দিক কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা বেদী বাঁধান ও সুবর্ণমণ্ডিত আছে। ঐ বেদীর একদিক প্রদীপের মুখের ন্যায় সূক্ষ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শীর্ষস্থানে একটী শ্বেত রেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেবালয়ের একপ্রান্তে প্রভুর বাহন বৃষমূর্ত্তি অবস্থিত আছে।

এই মন্দির ভক্ত মহারাজ ললাটেন্দুর বর প্রার্থনায় মহেশ্বরের কৃপায় প্রসাদে জাতিভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে অর্থাৎ এই তীর্থ স্থানে প্রসাদে জাতিভেদ নাই। প্রভাতে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হয় এবং পূজারীগণ আরতি করিয়া থাকেন। এইরূপে এগার ঘটিকার সময় যে শেষ মধ্যাহ্ন ভোগ হয় ঐ ভোগে অন্ন, ব্যঞ্জন মালপোয়া প্রভৃতি প্রদানে ভোগ হইয়া থাকে। সেই বিরাট ভোগ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন ভোগের প্রসাদ ভাল পাণ্ডা ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট ভোগ আসে না। প্রভু ভুবনেশ্বরজীউর সমস্ত দিন মধ্যে চোদ্দ বার ভোগ হয়।

যে দিন এই তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইয়া যাঁহাকে পাণ্ডা বলিয়া মনোনীত করা যায়, সেই দিবস তিনি যাত্রীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রসাদ দিয়া থাকেন। এই ভুবনেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট। এই মন্দিরের গাত্রে যে সকল কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ আছে, উহাতে দেবমূর্ত্তি ব্যতীত কতকগুলি অশ্লীল মূর্ত্তি ও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরসংলগ্ন অলিন্দগুলিতে একটী করিয়া কৃষ্ণ প্রস্তরের অতি সুন্দর দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দির বহুকাল বেমেরামতি অবস্থায় থাকিয়া ইহার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দুঃখের বিষয়

শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর দেবের মন্দির।

Lakshmibilas Press.

এই যে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট মন্দির মেরামতির নিমিত্ত পয়সা সংগ্রহ হয়, কিন্তু কোন্ সময় ইহা মেরামত হয় উহা কেহই দেখিতে পান না।

এইরূপে পর পর সমস্ত মন্দির ও দেবালয় সকল দর্শনান্তে বিন্দু সরোবরের পূর্ব্ব তীরে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরের ঈশানকোণে মুক্তেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরেও নানা কারুকার্য্য শোভিত, দর্শনে মোহিত হইতে হয়, তাহার পর কেদারেশ্বরের মন্দির। মন্দির মধ্যে প্রভু সদাসর্ব্বদা জলে ডুবিয়া থাকেন। তাহার পর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ কপিলেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইবেন। তথায় কপিলমুনি ও তাহার আরাধ্যদেব মহাদেবজীউকে দর্শন করিবেন। ইহার অনতিদূরে গৌড়িকুণ্ড, ঐ কুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া পবিত্র হইবেন। যে সকল যাত্রী খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা এইস্থান হইতে আপন আপন বাসায় বিশ্রামপূর্ব্বক পর্ব্বতশ্রেণীর অদ্ভুত শোভা দেখিতে যাত্রা করিবেন।

আমরা বিন্দু সরোবরের তীরের উপর দারোগা বাবুর বাটীতে বাসা লইয়াছিলাম. তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আপন পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্ব্বক খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে যাত্রা করিলাম। বাসাবাটী হইতে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি প্রায় দুই ক্রোশ পথ. গোশকটে যাইতে হয়।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি।

এই গিরিদ্বয় একটী পাহাড় হইতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদের সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া শিখরদেশে যতই উঠিবেন গিরিদ্বয়ের বক্ষে ততই নানাপ্রকার গুহ ও কূপসকল দেখিতে দেখিতে মোহিত হইবেন। কত অর্থ, কত বুদ্ধি সংযোগে এই সকল

ভয়ঙ্কর পাহাড় হইতে গুহাসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহা একবার চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে বুদ্ধ তাপসগণ এই সকল গুহায় বাস করিতেন। পাহাড় ভেদ করিয়া একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল প্রকোষ্ঠের পর প্রকাণ্ড বারান্দা প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই খণ্ড-গিরিতে যে সমস্ত গুহা আছে তন্মধ্যে রাণী হংসপুর নামক গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী। ইহার শিখরদেশে জৈনদিগের একটী মন্দির অদ্যাপি স্থাপিত আছে।

উদয়গিরি।

খণ্ডগিরির শোভা দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী যে গিরি দেখিতে পাইবেন ঐ পর্ব্বতের নামই উদয়গিরি। এই গিরির উপর উঠিলেও অসংখ্য গুহা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গুহাগুলি এক্ষণে বেমেরামতি অবস্থায় শ্রীহীন হইয়াছে। অবগত হইলাম পূর্ব্বে এই সকল গুহাগুলিতে বুদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেন, এবং দেশ বিদেশে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিতেন, উহাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সেই সময় এই সকল গুহাগুলির দৃশ্য কতই সুন্দর ছিল। এক্ষণে ঐ সকল সুন্দর অদ্ভুত নির্ম্মিত গুহাগুলি ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া কেবল বন্যজন্তুদিগের আবাস স্থল হইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদয়গিরির মধ্যে যতগুলি গুহা দেখিবেন উহার প্রত্যেকটির দেওয়ালে নর, নারী, সৈনিক, প্রহরীর নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এইরূপে গিরিদ্বয়ের শোভা দর্শনের পর সত্যবাদী গ্রামে সাক্ষীগোপাল দর্শন মানসে ষ্টেশনাভিমুখে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালজীউ
দর্শন-যাত্রা।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে সাক্ষীগোপাল নামক ষ্টেশনে নামিতে হয়। সাক্ষীগোপালজীউর মন্দির একটী উদ্যানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই দেবালয়ের প্রবেশ দ্বারদেশে একটী প্রস্তরময় স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির প্রাঙ্গণে এক স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণী আছে, উহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত; ঐ মন্দিরেই সাক্ষীগোপালের চন্দনযাত্রা হয়। প্রধান মন্দির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই সাক্ষী-গোপাল নামে খ্যাত।

সাক্ষী-গোপাল সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ:—পূর্ব্বকালে কোন এক সময়ে দুই ব্রাহ্মণ তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করেন। উভয়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, অপরটী যুবা। তাহারা উভয়ে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীধাম বৃন্দাবন (নিত্যধাম যাহা ব্রহ্মাণ্ডের উপর অবস্থিত) তথায় উপস্থিত হইয়া পীড়াগ্রস্থ হন। যুবা সাধ্যানুসারে বৃদ্ধের শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিলেন, তিনি নিঃসহায় অবস্থায় এই যুবার সেবায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে যুবা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, সুতরাং কিরূপে সেই উপকার প্রতিদান করিবেন এই চিন্তাতেই তিনি কাতর হইলেন অবশেষে নানাপ্রকার চিন্তার পর তাহার প্রাণস্বরূপা একমাত্র দুহিতাকে যুবার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, এই যুবা ব্রাহ্মণ হইলেও কুলমর্য্যাদাতে আমাপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট, আমি উহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে উহার

মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলেই যুবার বিশেষ উপকার হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি যুবার সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীহরির সম্মুখে তাহাকে তাহার একমাত্র কন্যা সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যুবা তখন বৃদ্ধকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি আমাপেক্ষা বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান, আপনাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপি আমার প্রার্থনা, এই পুণ্য তীর্থস্থানে শ্রীগোপালজীউর সম্মুখে অঙ্গিকার করিবার পূর্ব্বে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া শপথ করুন। তখন বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, তোমার বলিবার পূর্ব্বে আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি এবং শ্রীগোপালের সম্মুখে তোমায় আমার একমাত্র দুহিতাকে সম্প্রদান করিব অঙ্গিকার করিলাম। অতঃপর তাহারা মনের সুখে অপর আরও বহুবিধ তীর্থ সকল পর্য্যটন করিয়া আপন আপন বাটীতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যুবক বৃদ্ধের বাটীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গিকার স্মরণ করাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল। তখন বৃদ্ধ তাহার আত্মীয় স্বজনকে পূর্ব্ব ঘটনা ও শ্রীগোপালের সম্মুখে অঙ্গিকারের বিষয় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার আত্মীয়েরা নীচ বংশে কন্যাদান করিতে অসম্মত হইলেন, বৃদ্ধ ও আত্মীয়দিগের অমতে কিরূপে কন্যা সম্প্রদান করিবেন একমনে উহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ যুবা দুঃখিত মনে গ্রামস্থ অপরাপর ভদ্র লোকদিগের আশ্রয় লইলেন এবং বৃদ্ধের পুণ্যময় তীর্থ স্থানে শ্রীগোপালের সম্মুখে সত্যবন্ধনের কথা প্রকাশ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কার গর্ব্বিত কুলীনগণ একযোগে যুবাকে অগ্রাহ্য করিলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া কোন্ উপায় অবলম্বনে যুবাকে বিদায় দিবেন ইহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহারা যুবাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি বলিতেছ তুমি, বৃদ্ধ আর তোমার তীর্থ স্থানের শ্রীগোপাল, এই তিন জন থাকিয়া বৃদ্ধ সত্যবন্ধনে

আবদ্ধ আছেন, যদ্যপি ইহা প্রমাণ করিতে পার অর্থাৎ যদ্যপি তুমি তোমার শ্রীগোপালকে বৃন্দাবন হইতে এই গ্রামে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিতে পার তাহা হইলে আমরা সকলে জাতিভয় না করিয়া তোমায় কন্যাদান করিব। তাহাদের এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বৃন্দাবন হইতে শ্রীগোপাল এখানে সাক্ষীদান করিতে আসিবেন না আর আমরাও মৌলিক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিব না। যুবা এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ হইবার পরিবর্ত্তে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদিগকে বলিলেন, যদ্যপি আপনাদের বিচারে এইরূপই স্থির হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়া শ্রীগোপালজীউকে সাক্ষীরূপে আপনাদের নিকট হাজির করিব, তিনি (যুবা) সগর্ব্বে এইরূপ বলিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তখন গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে পাগল বিবেচনা করিলেন।

একমনে এই বিপ্র গোপালরূপ শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার আরাধ্যদেব শ্রীগোপালজীউর নিকট করযোড়ে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া স্বীয় দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। আরও তিনি গ্রামস্থ শ্রেষ্ঠ কুলীনদিগের বিচারে মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া শ্রীগোপালের নিকট বলিলেন, হে প্রভো! এ জগতে ধনীর সহায় সকলেই হয়, গরীবদিগের বিচার কেহ করিতে ইচ্ছা করেন না, আপনি অধীনের প্রতি সদয় হইয়া সত্যবাদী গ্রামে গমনপূর্ব্বক সাক্ষ্য না দিলে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, কিন্তু প্রভু, যদ্যপি আপনি এ বিষয় অবগত হইয়াও সাক্ষ্য না দেন, তাহা হইলে এই পাপের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইবে।

অন্তর্য্যামী ভগবান সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের অবিচলিত ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক মধুরবচনে বলিলেন, হে বিপ্র! তুমি যাহা বলিতেছ সে বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি এবং এ বিষয় প্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু মনে রেখো পথিমধ্যে

গমনকালীন তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে না, যদ্যপি সন্দেহচিত্তে দৈবাৎ দৃষ্টি কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, আমি সেই স্থানেই অবস্থান করিব, আর একপদও অগ্রসর হইব না, অধিকিন্তু আমি যাইতেছি কিনা তাহার প্রমাণস্বরূপ আমার চরণের নূপুরধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে থাকিবে এবং আমি তোমার পশ্চাদ্গামী হইব। ব্রাহ্মণ শ্রীগোপালের সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

ব্রাহ্মণ এইরূপে শ্রীগোপালের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিবসই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া শ্রীগোপালের সহিত বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণের আলয়াভিমুখে সত্যবাদীগ্রামে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। বহুদিবস পর যুবা গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়া নূপুরধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না, কারণ বালুকারাশি নূপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নূপুর শব্দ রহিত করিয়াছিল, এই নিমিত্ত বিপ্র তাঁহার নূপুরের রুণু রুণু শব্দ শুনিতে না পাইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে যেমন পশ্চাতদিকে মুখ ফিরাইলেন, অমনি শ্রীগোপাল যুবাকে পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, আমি এইস্থান হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব না। তুমি আমার আদেশমত বৃদ্ধ ও তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট এই স্থানে আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। যুবা শ্রীগোপালের আজ্ঞাপ্রাপ্তে তদনুরূপ করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনায় সকলকেই চমৎকৃত হইতে হইল। অবশেষ সেই ব্রাহ্মণ ও তাহার স্বজন শ্রীগোপালের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাপন ত্রুটি স্বীকারপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে শ্রীগোপালের সম্মুখে ঐ যুবাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। শ্রীগোপাল বৃন্দাবন হইতে সাক্ষীরূপে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তের আশাপূর্ণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত প্রভু এইস্থানে সাক্ষীগোপাল নামে বিরাজ করিতেছেন। ভক্তিপূর্ব্বক এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কালাপাহাড়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী বীরজাতন গ্রামে তিনি বাস করিতেন। তাহার পিতা নয়ানচাঁদ রায় গৌড় বাদসাহের রাজসরকারে ফৌজদারী বিভাগে কার্য্য করিয়া সঙ্গতিপন্ন হন। পরোপকার তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল এই নিমিত্ত যশোলক্ষ্মী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়ানচাঁদের মহৎগুণে মুগ্ধ হইয়া গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সকলকেই দুঃখিত করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র কালাচাঁদ অত্যন্ত শিশু ছিলেন। কালাচাঁদের মাতামহ ঐ শিশুটীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, সেই নিঃসহায় অবস্থায় অগত্যা তিনি মাতামহের আলয়ে পালিত হইয়া বাঙ্গলা ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কালাচাঁদ অতিশয় বুদ্ধিমান, বলবান ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, তাহার আচার ব্যবহার সমস্তই পিতার ন্যায় হইয়াছিল এবং মিষ্টভাষী ছিলেন, এই নিমিত্ত সকলেই কালাচাঁদকে ভক্তি করিতেন। কালক্রমে কালাচাঁদ যথাসময়ে শ্রীরামপুর নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ী মহাশয়ের সুন্দরী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ করেন।

বিবাহের পর তাহার ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার পৈতৃক মনিব গৌড়ের বাদশা সলিমান শাহের নিকটে কর্ম্ম প্রার্থী হন। সম্রাট তাহাকে পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং সুশ্রী বলিষ্ঠ পুরুষ দেখিয়া ও তাহার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া গৌড় নগরেই ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন কালাচাঁদ সম্রাট শাহার বাটীর নিকটেই বাসা লইলেন। তিনি অভ্যাস মত প্রত্যহ প্রত্যুষে রাজবাটীর সংলগ্ন একটী হ্রদে স্নান, আহ্নিক সম্পন্ন করিতেন এবং যথাসময়ে চাকরীস্থানে উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম বাজায় করিতেন। হিন্দুরা

ধুতির উপর চাপকান এবং মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া কার্য্য করিতেন আর মুসলমানেরা ইজের পরিধান করিয়া কাছারীতে হাজির হইতেন কারণ রাজাদেশ এইরূপই ছিল।

সলিমান শাহের একটী যুবতী কন্যা ছিল, সু-পাত্র অভাবে তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। একদা সেই কন্যা দাসীগণ সহ অট্টালিকার ছাদে সুবিমল বায়ু সেবনকালে কালাচাঁদকে স্নান করিয়া আহ্নিক অবস্থায় মন্ত্র উচ্চারণ সময়ে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিলেন; সম্রাটদুহিতা কালাচাঁদের গলে যজ্ঞোপবীত দেখিয়া উচ্চবংশোদ্ভব, হস্তে সুবর্ণ কোশা থাকায় ধনী এবং মন্ত্র উচ্চারণ শব্দ পাঠশ্রবণ করিয়া বিদ্বান স্থির করিয়াছিলেন। কলাচাঁদ এ বিষয় কিছুই অবগত ছিল না সুতরাং যথাসময়ে আহ্নিক ক্রীড়া সমাপনান্তে আপন মনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। দাসীগণ সম্রাট-দুহিতার মনোভাব অবগত হইয়া গুপ্তভাবে বেগমের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল, তখন বেগম তাহাদিগকে কোন কিছু না বলিয়া পরদিবস প্রত্যূষে গুপ্তভাবে স্বয়ং সেই সুন্দর যুবা কালাচাঁদকে আহ্নিক অবস্থাতে দেখিলেন এবং গুপ্তচর পাঠাইয়া কালাচাঁদের জাতি, কুল, ব্যবসাদি সমস্ত অবগত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, কেননা এতদিন পর তাঁহার কন্যার উপযুক্ত পাত্র নয়নগোচর হইল। তখন তিনি কন্যার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন।

সম্রাট সলিমান শাহ বেগমের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া আল্লাকে ধন্য-বাদ দিলেন। পরদিবস তিনি মনের সুখে আহ্লাদে সন্তুষ্টচিত্তে কালাচাঁদকে কাছারী হইতে নানা অছিলায় আটক করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কালাচাঁদ জাতিভয়ে উহা অস্বীকার করিলেন। তখন সম্রাট তাহাকে নানা প্রকার লোভ, শেষে জীবনের ভয় প্রদর্শন করিয়াও কিছুতেই তাহাকে সম্মত করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার শূলের আদেশপ্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই বিবাহবার্ত্তা সমস্ত দেশ ও প্রত্যেক পল্লীতে

পল্লীতে প্রচারিত হইল। যথাক্রমে সম্রাটদুহিতাও এই সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইতেছে বিবেচনা করিয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় খিড়কীদ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইয়া ঐ বধ্যভূমে উপস্থিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কালাচাঁদের পদতলে পতিত হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেই উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন এইরূপ পরামর্শ দিলেন, (যে সময় কালাচাঁদ প্রতি মূহুর্ত্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন সেই সময় এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শন করিয়া কালাচাঁদকে হতবুদ্ধি হইতে হইল) সম্রাটদুহিতা কালাচাঁদের মুখভাব অবলোকন করিয়া তাহার প্রার্থনায় অসম্মত বোধ করিলেন এবং মনোদুঃখে ঘাতকদিগকে কাতরবচনে অগ্রে তাহাকে হত্যা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জল্লাদেরা এই সমস্ত ঘটনা অবলোকন করিয়া কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া দুঃখিত মনে বাদশার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিলে, সম্রাট কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার স্নেহময়ী দুহিতার নিকট গমন করিলেন।

এদিকে কালাচাঁদ অসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে ঐ সৌন্দর্য্যময়ী নব-যৌবনসম্পন্না সম্রাটদুহিতাকে অবলোকন করিয়া তাহার রূপে এবং কাতর উক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। সম্রাট বধ্যভূমে উপস্থিত হইয়া, কালাচাঁদকে বিবাহ করিতে সম্মত অবগত হইয়া তাহার শূলাজ্ঞা রহিত করিলেন এবং সেইদিনেই তাহার করে আপন স্নেহের দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া পূর্ব্ব ক্রোধের শান্তি করিলেন। এইরূপে সম্রাটদুহিতা কালা-চাঁদকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।

এই বিবাহ হেতু কালাচাঁদকে সমাজচ্যুত হইতে হইল। তাহার মাতা পুত্রের উপস্থিত বিপদে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইলেন, কালাচাঁদ মাতৃ আজ্ঞায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না দেখিলেন সুতরাং

কালাচাঁদকে বাধ্য হইয়া একঘরিয়া হইয়া থাকিতে হইল। এইরূপে কিছুদিন তিনি মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময় কলির একমাত্র ত্রাণ-কর্ত্তা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্মরণ হইল, তখন তিনি জাতি হইতে উদ্ধার মানসে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ পবিত্র পুণ্যস্থানে ধন্না দিলেন। তিনি একমনে একপ্রাণে অনাহারে ছয়দিন ধন্না দিয়াও ভগবানের কোনরূপ প্রত্যাদেশ হইল না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, অধিকন্তু পাণ্ডারা তাহার পরিচয় পাইয়া প্রধান পাণ্ডার আজ্ঞানুযায়ী শ্রীমন্দির হইতে অপমান পূর্ব্বক তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। কালাচাঁদ ঐ অপমানের প্রতি-শোধ লইবার জন্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করি-লেন আর হিন্দুদিগের দেবতার ক্ষমতা অন্তর্ধ্যান হইয়াছে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি হিন্দু দেবতাদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিতে লাগিলেন। কালাচাঁদ হিন্দু হইয়া হিন্দু দেবতাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করাতে হিন্দুরা তাহার কুব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া দুঃখে তাহাকে কালাপাহাড় বলিতে লাগিলেন।

এইরূপে কালাচাঁদ শ্রীমন্দির হইতে অপমানিত হইয়াই স্বেচ্ছায় মুসল-মান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং সম্রাট (শ্বশুর) কে বারম্বার উৎকল বিজয়ের জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাদসাহ এই জামাতার উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাহার সমস্ত সেনার অধিনায়ক করিলেন। কালাচাঁদ নিজগুণে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত সেনার শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। তখন সলিমানশাহ কালাচাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে নিজের সমস্ত সেনার অধিনায়ক করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উড়িষ্যা বিজয়ে সম্মতি দান করিলেন। সেই সময় গঙ্গাবংশীয় মহাপরাক্রান্ত মুকুন্দ-দেব নামক এক রাজা তথায় রাজ্য শাসন করিতেন। মুসলমানেরা বারম্বার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া মুকুন্দদেবের অদ্ভুত রণ-কৌশলের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। এবার কালাচাঁদের অমিতবিক্রম এবং সম্রাটের অসংখ্য অস্ত্রের

সৈন্ত সন্নিবেশিত হওয়ার তাহারা বীরদর্পে উড়িষ্যা আক্রমণ করিল। মহাবীর মকুন্দদেব পূর্ব্বের ন্যায় যবনদিগকে তাচ্ছল্য করিয়া সামান্যমাত্র সৈন্ত সমভিব্যাহারে রণভূমে প্রবেশ করাতে সেই অসংখ্য যবন চমু্য ভেদ করিবার সময় পরিবেষ্টিত হইলেন, তখন তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ঐ অজেয় যবনদিগকে নিপাত করিতে করিতে বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন তৎসঙ্গে উড়িষ্যার ভাগ্যলক্ষ্মী ও অন্তর্ধ্যান হইলেন। এইরূপে উড়িষ্যা মুসলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের অংশীভূত হইল।

কালাচাঁদ বিজয়ী হইয়া পূর্ব্ব অপমান স্মরণপূর্ব্বক ইচ্ছামত শ্রীক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন পাণ্ডারা ভয়ে জগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দির হইতে গুপ্তভাবে লইয়া গিয়া হ্রদমধ্যে প্রোথিত করিলেন, তথাপি কালার হস্তে নিস্তার পাইলেন না; বহু অনুসন্ধানে এবং অতি কষ্টে পাতি পাতি সন্ধান করিয়া কালাচাঁদ বিগ্রহ মূর্ত্তি বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে ঐ শ্রীমূর্ত্তিকে ভস্মে পরিণত করেন। তাহার পর কালাচাঁদ ইচ্ছানুসারে আপন সৈন্ত সমভিব্যাহারে জৌনপুর রাজ্যে, কাশীধামে আরও বহুবিধ হিন্দুদিগের বিখ্যাত তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আট বৎসর কাল হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ মূর্ত্তির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। কাশীধামে অত্যাচার সময় কালার এক যুবতী মাতুলানীর প্রতি তাহারই আদেশমত এক যবন বলাৎকার করে, তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া মনোদুঃখে নানারূপ তিরস্কার করিয়া সেইস্থানেই কালাচাঁদের কটিস্থিত তরবারি ছিনাইয়া লইয়া আত্মহত্যা করেন; তদ্দর্শনে তিনি স্তম্ভিত হইয়া অত্যাচার করিতে বিরত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন, আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ অত্যাচারের শান্তি হইল। বলা বাহুল্য কালাচাঁদের মাতুলানী যে কাশীতে বাস করিতেন তাহা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না, এই লোমহর্ষণ দৃশ্যে কালাচাঁদকে আন্তরিক দুঃখিত হইতে হইল এবং ইহারই

ফলে সর্ব্বত্রে শান্তি স্থাপন হইয়াছিল; সেই নিমিত্ত কাশীধামে একমাত্র অনাদিলিঙ্গ নন্দী কেদারেশ্বরের প্রধান লিঙ্গ রক্ষা হইয়াছিল, অদ্যাপি এই অনাদিলিঙ্গ কাশীধামে বিরাজিত। এক্ষণে কাশীতে আমরা যে সমস্ত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া থাকি এক কেদারেশ্বর ব্যতীত সকলগুলিই কালা-পাহাড়ের অত্যাচার সময়ের পর স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে কালা-চাঁদ স্বচক্ষে মাতুলানীর দুরাবস্থা দর্শন করিয়া সেই রাত্রেই মনোদুঃখে সন্ন্যাসীবেশে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সেই অবধি আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পুরী তীর্থ।

কলিযুগে ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব এই কলিকালে সকল মনুষ্যেরই ভগবান জগন্নাথজীউর দর্শন ও অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পাণ্ডুবংশীয় অভিমন্যু পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের স্বর্গারোহণ সময় হইতেই মর্ত্তে কলির শুভাগমন হইয়াছে।

কলি মাহাত্ম্য।

এই কলিকালে সত্য, ধর্ম্ম পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল এবং স্মৃতি সকলগুলিই বিনষ্ট হইবে। কলিকালে মনুষ্যের ধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ হইবে এবং ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ বিষয়ে ধনই বলবৎ হইবে। কলিতে রুচি অনু-সারে বিবাহ ক্রয় বিক্রয় হইবে এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার রতি কৌশল অধিক তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। ব্রাহ্মণদিগের চিহ্নের মধ্যে কেবল যজ্ঞসূত্র

গাছুটী গলে থাকিবে, আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় হইবে। কলির পণ্ডিতেরা বহু বাক্যব্যয় করিবেন এবং অর্থলোভে অন্যায় ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। কলিকালে কেশধারণ কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য হইবে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধি এবং চিন্তার দ্বারা সাতিশয় কষ্ট পাইবে।

মনুষ্যদিগের পরমায়ু ৫০ পঞ্চাশ বৎসর স্থির থাকিবে কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্যকে ২০।২২ বৎসর বয়সেই মানবলীলা শেষ করিতে হইবে। লোকদিগের দেহ খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে এবং জাতিভেদ বর্ণভেদ বিচার করিবে না। চৌর্য্য কার্য্যেই তৎপর হইবে, মিথ্যা ভিন্ন সত্য ভ্রমেও বলিবে না এবং বৃথা হিংসা মনুষ্যদিগের স্বভাব সিদ্ধগুণ হইবে। গো সকল ছাগবৎ খর্ব্বাকৃতি হইয়া অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে। ঘৃতাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ ও মিষ্টতা থাকিবে না এবং বৃক্ষাদিতে ও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মাইবে না। সম্বন্ধীদিগকে পৃথিবীর মধ্যে পরম বন্ধু বোধ করিবে। পিতা, মাতা গুরুজনের পরামর্শ না লইয়া ইহাদেরই পরামর্শ লইয়া কাজ করিবে। কলিকালে ঔষধ সকলের গুণ ক্ষীণ হইবে, মেঘ হইতে জল হইবে না, কেবল বিদ্যুত ও বজ্রাঘাত হইবে, মনুষ্যগণের গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ হইবে। কলির পূর্ণাবস্থায় ছল, মিথ্যা আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্যদশার প্রাধান্য হইবে, আর ও মনুষ্যগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্প ভোগী, অধিক আহারকারী, অতিশয় কর্ম্মী ও ধনহীন হইবে। কলিকালে সকল স্ত্রীই অসতী হইবে, কেবল গর্ভধারিণী আপন গর্ভজাত পুত্রের নিকট সতী থাকিবে, কলিরাজের উপদেশমত এই সকল পালনীয় হইবে।

কলিকালে প্রত্যেক নগর ও গ্রাম পাষণ্ড ও দস্যুদ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে কেহ কাহারও অধীন থাকিতে ইচ্ছা করিবে না। মনুষ্যগণ শিখা ও কাঁথার পরিবর্ত্তে লোমের বাসনকে সমাদর করিবে, রাজা তাম্রবর্ণ হইবেন।

ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পেটুক হইবেন নিমন্ত্রণ হইলে জাতি বিচার করিবেন না। স্ত্রীলোকেরা খর্ব্বাকৃতি ও অধিক ভোজী হইবে এবং বহু সন্তান প্রসব করিয়া অল্পায়ু ও লজ্জাহীনা হইয়া নিরন্তর কটুভাষী হইবে ও সর্ব্বদা চৌর্য্য-ছলান্বেষণ করিয়া বেড়াইবে। কলিরাজের ইচ্ছানুসারে স্বামীরা গুরুর ন্যায় স্ত্রীসেবা করিবে ও স্ত্রৈণ হইয়া থাকিবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের নিকট ব্যবস্থা লইবেন, তখনই কলির পূর্ণকাল হইবে অর্থাৎ আপনার জীবনে যাহা দেখিবেন আপনার পুত্র পৌত্রেরা তাহার ঠিক বিপরীত দেখিতে থাকিবে। অন্নকষ্ট, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইবে, লোকের অন্ন, বস্ত্র, পান, ভোজনের স্থান ও ভূমি থাকিবে না। সামান্য অর্থ লইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিবে। লোকে অন্নাভাবে পিতা মাতা, পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বৃদ্ধ প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে। কপটধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। কলিকালে অন্নদান ও বিদ্যাদান অপেক্ষা অধিক পুণ্য আর দ্বিতীয় থাকিবে না। পূর্ণ কলিকালে লোকে দিনান্তে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করিলেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে কলিমাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে এইরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিযুগে একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা জগন্নাথদেব, যিনি ইচ্ছানুসারে লীলা-বশে আপন অংশ হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গনামে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া কত মহা পাপীদিগকে উদ্ধার করিয়া কত লীলাখেলা প্রকাশে মনুষ্যদিগকে ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির পদে মতি রাখিতে উপদেশ দান করিয়া, যত তীর্থ সকল পর্য্যটন করিয়া অবশেষে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং আপন কায়া জগবন্ধুর শ্রীঅঙ্গে মিলিত করিয়া এই ক্ষেত্রের নাম শ্রীক্ষেত্র করিয়াছিলেন যে করুণাময়ের কণামাত্র করুণা প্রাপ্ত হইলে পতিতজন অক্লেশে মুক্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই পতিতপাবন ভবপারের একমাত্র কাণ্ডারী জগন্নাথদেবকে

কাহার না দর্শন করিতে ইচ্ছা হয়? শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নামক গ্রন্থে এবিষয় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব জীউর দর্শন যাত্রা।

সাক্ষীগোপাল ষ্টেশন হইতে পুরী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া প্রায় দেড় মাইল বাঁধা রাস্তা দিয়া জগন্নাথদেবজীউর শ্রীমন্দির দর্শন করিতে যাইতে হয়। এখানে সরকার বাহাদুরের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ আইন অত্যন্ত প্রবল অর্থাৎ কেহ রাস্তায় নিদৃষ্ট স্থান ব্যতীত প্রস্রাব করিলেই তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। পুরী ষ্টেশন হইতে শ্রীমন্দিরে যাইবার সময় গোশকট ও ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ভারতের এক শিল্প নৈপুণ্যের দিগন্ত বিস্তারী কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই মন্দির পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এবং চারি ভাগে বিভক্ত যথা:—ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন ও পীঠস্থান বা রত্নবেদী। ইহার তলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। এই শ্রীমন্দিরের উচ্চতা ১২৬ হস্ত বা ১৮৯ ফিট, পূর্ব্বে যে জগৎবিখ্যাত সুবৃহৎ সর্ব্বোচ্চ ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির দর্শনে মনে করিয়াছেন যে ইহারন্যায় উচ্চ মন্দির আর নাই সেই মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিট আর পুরীর শ্রীমন্দিরের উচ্চতা ১৮৯ এই দুই মন্দিরের উচ্চতা তুলনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা পুরীর শ্রীমন্দির ২৪ ফিট অধিক উচ্চ।

এই মন্দিরের শিখরদেশে নীলচক্র নামে যে বৃহৎ চক্র দেখিবেন পুরীবাসী পাণ্ডাদিগের নিকট অবগত হইলাম দুর্বৃত্ত কালাপাহাড় এই চক্র ভগ্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আরও অবগত হইলাম যে, এই নীলচক্রের ওজন কিছু কম পাঁচ মন কিন্তু মন্দিরের তলদেশ হইতে উহা নিরীক্ষণ করিলে ঐ চক্র যে এত অধিক ভারি তাহা কিছুতেই অনুমান হয় না।

কথিত আছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রত্নবেদীর উপর দর্শন করিলে দশ অবতারের দর্শন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত সকল তীর্থের সার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র এবং কলিকালে সকল দেবের শ্রেষ্ঠ "জগন্নাথদেব" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে, ঐ দ্বার গুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে শোভা পাইতেছে। উত্তর দ্বারে দুইটী হস্তিমূর্ত্তি স্থাপিত থাকায় উহার নাম হস্তিদ্বার হইয়াছে। দক্ষিণদ্বারে দুইটী অশ্বমূর্ত্তি থাকাতে, উহার নাম অশ্বদ্বার হইয়াছে। পশ্চিম দ্বারকে খঞ্জদ্বার বলে, আর পূর্ব্ব দ্বারে দুইটী সিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া, এই দ্বার সিংহদ্বার নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সিংহদ্বার অপরাপর দ্বার অপেক্ষা শিল্পকার্য্যে শোভিত এবং এই দ্বারই শ্রীমন্দিরের প্রবেশ পথের প্রধান দ্বার।

সিংহদ্বারের সম্মুখে যে প্রশস্ত পাকা বাঁধা রাস্তা আছে উহার নাম বড় দাঁড় রাস্তা। আষাঢ় মাসে প্রভুর রথযাত্রা ঐ বিস্তৃত রাস্তার উপর সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই রাস্তাই পুরীর প্রধান পথ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কারণ সমস্ত পুরীধামে এরূপ প্রশস্ত রাস্তা আর দ্বিতীয় নাই। এই রাস্তার দুই ধারে দোকান সকল সজ্জিত থাকায়, ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

সিংহদ্বারের সম্মুখে রেলিং ঘেরা যে একটী চতুষ্কোণ উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় উহার নাম অরুণস্তম্ভ। এই অরুণ স্তম্ভের মূলদেশ চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট এবং স্তম্ভের উপরিভাগ কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত গাত্রে পলতোলা আছে। ইহার উচ্চতা কমবেশ ত্রিশ ফিট এবং পরিধি প্রায় পাঁচ ফিট। অবগত

হইলাম এই স্তম্ভ সর্ব্ব প্রথমে কোনার্ক নামক সমুদ্র-তীরস্থ সূর্য্যদেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল, সেই মন্দির বেমেরামতিতে ভগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্যহীন হওয়ার পর সাধারণকে অরুণস্তম্ভের সৌন্দর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত এইস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

সিংহদ্বারে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ-পথের প্রথমেই দক্ষিণদিকের দেওয়ালের নিম্নদেশে এক জগন্নাথমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে দর্শন পাওয়া যায়। ঐ শ্রীমূর্ত্তি পতিতপাবন নামে বিরাজ করিতেছেন। যাহারা শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পান না, অবগত হইলাম ঐ পতিতপাবন-জীউকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলে তাহারা রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিত্রয়ের দর্শনফল প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। প্রবেশদ্বারের প্রথমে এই (জগন্নাথ) পতিতপাবন-জীউকে প্রতিষ্ঠা করিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বকালে জনৈকপুরীর রাজা চরিত্রদোষে পতিত হন। পতিতজনের শ্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ অধিকার না থাকাতে তিনি মুক্ত হইবার জন্য জগন্নাথদেবের আশ্রয় লন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থা অনুসারে এই শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন. কারণ তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন, যদ্যপি আমার ন্যায় কোন দুর্ভাগ্য থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠিত এই পতিতপাবন জীউকে দর্শন করিলে প্রভুর কৃপায় সহজেই উদ্ধার হইতে পারিবেন।

ভক্তগণ প্রথমে সিংহদ্বারে এই পতিতপাবনজীউকে দর্শন করিবেন, তৎপরে বাবিংশটী প্রস্তরের বৃহৎ সোপান অতিক্রম করিলে প্রথম তোরণ পার হইয়া দ্বিতীয় তোরণে পৌঁছিবেন। এই দ্বিতীয় তোরণে শুষ্ক মহা-প্রসাদ ও আনন্দনাড়ু সারি সারি দোকান সুশোভিত দেখিতে পাইবেন এবং দোকানীদিগের কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গি দেখিলে মনে মনে কত আনন্দ অনুভব করিবেন। লোক পরম্পরায় অবগত হইলাম যে সাধারণে এই মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিবার অধিকার পান না, যাহারা বংশানুক্রমে বিক্রয় করিতেছেন তাহারাই এই শুষ্ক মহাপ্রসাদ বিক্রয় করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত

বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া পুরীরাজের নিকট ছাড়পত্র লইতে হয়। এই দ্বিতীয় তোরণের পূর্ব্বধারে আনন্দবাজার ও স্নানমঞ্চ। আনন্দবাজার নামেও যেমন শ্রবণমধুর, দর্শনেও সেইরূপ প্রীতিপদ। আনন্দবাজারে ছোট বড় সকল প্রকার আটকিয়া পাওয়া যায়। অন্ন, ডাল, খিচারন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি সমস্তই মহাপ্রসাদ নামে খ্যাত অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা মাতার ভোগ হয়, সে সমস্তই মহাপ্রসাদ নামে প্রসিদ্ধ। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল দ্রব্য সহজেই পাক করা যায়, সেই-রূপ দ্রব্যেই প্রভুর ভোগের নিমিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। আনন্দ-বাজারের ডাইল সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু।

গঙ্গাজল চণ্ডালস্পর্শে যেরূপ অপবিত্র হয় না সেইরূপ এই মহাপ্রসাদ কিছুতেই অপবিত্র হয় না। এই প্রসাদ ক্রয় বিক্রয় করিলেও দোষ নাই। শুষ্ক অবস্থায় বা দূর হইতে আসিলেও ইহা শুদ্ধ। মহাপ্রসাদ যে অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিৎ। এই মহা-প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাত্রী যত অধিক হউক না কেন, কাহাকেও কখন প্রসাদের নিমিত্ত ভাবিতে হয় না। এইরূপ পবিত্র তীর্থ ভূমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। ধন্য জগন্নাথদেব! ধন্য তোমার মাহাত্ম্য! এই আনন্দবাজারের পূর্ব্বধারে যে স্নানমঞ্চ দর্শন পাইবেন, স্নানযাত্রার সময় এই বেদীর উপর প্রভুর স্নানোৎসব সম্পন্ন হয়।

পুরীর মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, চামড়ার মনিব্যাগ, হাড়ের বাঁটের ছুরি এইরূপ অস্পৃশ্য দ্রব্যসকল ভুলক্রমে লইয়া প্রবেশ করি-বেন না, কারণ ঐরূপ কোন অস্পৃশ্য দ্রব্য মন্দির মধ্যে কোন যাত্রীর নিকট কোন পাণ্ডা দেখিতে পাইলে, তাহাকে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয়, এমন কি এই অস্পৃশ্য দ্রব্যের নিমিত্ত জগবন্ধুর ভোগ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়, অতএব অধীনের এই সামান্য বাক্যটী স্মরণ রাখিবেন।

দ্বিতীয় তোরণ পার হইলেই ভোগমন্দিরে আসিতে হইবে, এই স্থানেই প্রভুর ভোগ হয়। যে সকল ভোগ ভক্তগণ প্রদত্ত হয়, সেই আটকিয়া ভোগ এই মন্দিরেই হইয়া থাকে, আর পুরীরাজ প্রদত্ত যে ভোগ হয়, উহ মন্দির মধ্যেই হইয়া থাকে। ঐ ভোগমন্দিরের দুই পার্শ্বের দ্বার, সর্ব্বদা বন্ধ থাকে কারণ সহসা কোন যাত্রী ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভোগ নষ্ট করিতে পারেন।

আনন্দবাজারে ইচ্ছানুসারে মনের সুখে প্রসাদ খরিদ করিবার সময় দেখিতে পাইবেন কত ব্রাহ্মণ নানা জাতীয় হিন্দুদিগের মুখে প্রসাদ দিতে থাকিবে এবং তাহাদের প্রদত্ত প্রসাদ আহ্লাদের সহিত আহার করিবে, কেহ আপত্তি করিলে তাহাদের নিকট জানিতে পাইবেন যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি প্রভু সদয় হইয়া বর লইতে আদেশ করিলে তিনি তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পুরীধামে আগত যাত্রীরা যেন পরস্পর পরস্পরে বিদ্বেষভাব হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া একমনে একপ্রাণে জাতিভেদ ভুলিয়া উচ্ছিষ্ট প্রসাদ একে অপরের মুখে নির্ব্বিকারচিত্তে সহাস্যে তুলিয়া দেয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ভক্তের ঐ আশা পূরণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি এই প্রথা আজও বিলুপ্ত হয় নাই, কলিকালে কখনও যে হইবে এরূপ ধারণা হয় না। ভক্তচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আদেশমতে এই তীর্থক্ষেত্রে কোন যাত্রীও রসুই করিতে ইচ্ছা করেন না।

এই সকল নানাবিধ শোভা দর্শন করিতে করিতে গরুড়স্তম্ভ নামক ফটক দিয়া রত্নবেদী দর্শন করিতে যাইতে হয়। এই সুবৃহৎ ফটকে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে যে গোলাকৃতি স্তম্ভ দেখিতে পাইবেন, উহাই গরুড়স্তম্ভ। নারায়ণ-বাহন গরুড় ঐ স্তম্ভের উপর করযোড়ে তাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন। এই স্তম্ভের নিম্নদেশে সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া আপনাকে ধন্য বোধ করেন। তৎপরেই নাটমন্দির। এই স্থানের দেয়ালে নানাপ্রকার চিত্র অঙ্কিত আছে। তাহার পর অংশর শিঙ্গ অর্থাৎ

মূর্ত্তিত্রয়ের বার্ষিক অঙ্গরাগ এইস্থানেই হইয়া থাকে। এই নাটমন্দিরের শেষ সীমার যে স্থানে কাঠের রেলিং আছে ভক্তগণ আপন আপন পাণ্ডা কর্ত্তৃক এই স্থান হইতে ধূলা পায়ে জগৎপিতা জগন্নাথদেবের ঝাঁকিদর্শন পাইয়া থাকেন। এইস্থান হইতে রত্নবেদী অনেক দূর এবং অন্ধকারময়, কেবলমাত্র একটী বৃহৎ প্রদীপের আলোক থাকায় তখন ভালরূপ দর্শন ঘটে না, কিন্তু রাত্রিকালে যখন রত্ন বেদীর ভিতরের সমস্ত আলোক প্রজ্জলিত হয় তখন সুচারুরূপে শ্রীমূর্ত্তিদিগের দর্শন লাভ হয়। ধূলা পায়ে পাণ্ডার আজ্ঞানুসারে এই রেলিং দেওয়া স্থান হইতে আমরা প্রথম দর্শন করিলাম, আরও দেখিলাম আমার ন্যায় কত ভক্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় হাঁটু গাড়িয়া জয় জগবন্ধু! স্বরে তাঁহার স্তব গুণগান করিতেছেন। এই পুণ্যস্থানে একবার প্রবেশ করিলে, সকলেরই মনোমধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় পবিত্র ভাবের উদয় হয় উহা বর্ণনাতীত। তাহার পর যে বাসা ভাড়া লইয়াছিলাম, তথায় গমনপূর্ব্বক সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম।

পরদিবস স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পাণ্ডার সাহায্যে রত্নবেদীর উপর শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের দর্শন করিয়া যে কত আনন্দ অনুভব করিলাম উহা লেখনীর দ্বারা জ্ঞাত করা যায় না, কেননা যাঁহার দর্শন লালসায় সংসারের নানাপ্রকার মায়া ছিন্ন করিয়া এই পবিত্র স্থানে আসিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম একণে কৃপাময়ের করুণায় সেই মহাব্রত উদ্যাপন হইল। মায়াময়ের প্রধান মায়া "আমার" এই মহামায়ায় সকলেই সমাচ্ছন্ন যেরূপ আমার ধন, আমার পুত্র, আমার কন্যা যে "আমার" শব্দের তুলনা রহিত, কিন্তু আমি যে কাহার, সে বিষয় একবারও কি কেহ চিন্তা করিতেছেন? সে যাহা হউক, এই রত্নবেদী স্পর্শ করিয়া বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিতে হয় এবং জগবন্ধুর নিকট কায়মনচিত্তে অভি- লাষিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিতে হয়। বলা বাহুল্য এই সকল দারুব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া কিছুতেই দর্শনতৃষ্ণা স্থানমাহাত্ম্যগুণে পরিতৃপ্ত হইয়াও হয় না।

রত্নবেদীটী দীর্ঘে ১৬ ফিট উর্দ্ধে ৪ ফিট্ সেই বেদীর উপর মূর্ত্তিসকল পূর্ব্বমুখে সারি সারি অবস্থিত আছেন। সর্ব্বপ্রথমে সুদর্শন, তৎপরে জগন্নাথ, তাহার পর সুভদ্রা ও সর্ব্বশেষে বলভদ্রদেব বিরাজ করিতেছেন। রত্নবেদীর বহির্ভাগে শ্রীগৌরাঙ্গজীর চরণ পাদুকা শয্যা, কমণ্ডলু ও অপরাপর তাঁহার পবিত্র চিহ্ন সকল পাণ্ডাগণ ভক্তদিগকে দর্শনদানে মোহিত করান।

জগন্নাথদেব জীউর প্রত্যহ চারিবার ভোগ হইয়া থাকে। প্রথম ভোগের নাম বাল্যভোগ, দ্বিতীয় ভোগের নাম খেচরান্ন ভোগ, তৃতীয় ভোগের নাম সন্ধ্যাধূপা এবং চতুর্থ ভোগের নাম বড় শৃঙ্গার।

প্রাতঃকালে দুন্দুভিধ্বনি করিয়া প্রভুকে জাগরণ করান হয়। তাহার পর দন্তধাবন জন্য দন্তকাটি প্রদান করা হয়, তৎপরে শ্রীমূর্ত্তিদিগকে চন্দনাদি লেপনপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান করান হয়। এই সকল সমাপ্ত হইলে বাল্য ভোগ হয়, তাহার পর দ্বিতীয় ভোগ হয়, এই দ্বিতীয় ভোগের সময় অন্ন ব্যঞ্জনাদি খিচুরীভোগ দেওয়া হয় এই সকল সম্পন্ন হইলে প্রভুর আরতি হইয়া মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, এইরূপে বেলা চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ থাকে, তাহার পর প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে বৈকাল ভোগ হইয়া থাকে সেই ভোগে খাজা, গজা, দধি পকান্ন (পান্তাভাত) প্রভৃতি দেওয়া হয়, ভোগ শেষ হইলে আরতি হয়। মধ্যাহ্ন ভোগের ও শৃঙ্গার ভোগের সময় জগমোহনে নটীরা নৃত্য করিতে থাকে এবং পাণ্ডাগণ চামর ব্যজন ও স্তব গুণগান করিতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে সুবৃহৎ কাঁসর ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

রাত্রিকালে যে ভোগ হয় তাহার নাম শৃঙ্গার ভোগ আর যে আরতি হয় উহারই নাম শৃঙ্গার বেশ। ঐ সময় মূর্ত্তিত্রয়কে বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত করিয়া নানাপ্রকার দ্রব্যসকল প্রদানে ভোগ হয়। এই আরতি বহুক্ষণ ব্যাপী হইয়া থাকে। শৃঙ্গার বেশ দর্শন যোগ্য। সমস্ত কার্য্য পণ্ড করিয়া এই শৃঙ্গার বেশ ও মহাআরতি কর্ত্তব্য জ্ঞান বোধে দর্শন করিবেন।

যে সকল আটকের ভোগের রং ময়লা ও মোটা চাউলে প্রস্তুত উহাই জগন্নাথদেবের ভোগ আর যে সকল ভোগ সাদা ধপধপে অথচ সরু চাউলের প্রস্তুত উহা বলভদ্রদেবের ভোগ বলিয়া জানিবেন, আর সুভদ্রা মাতার ভোগও বলভদ্রদেবের ভোগের ন্যায় সুশ্রী হইয়া থাকে।

রত্নবেদী দর্শনের পর পশ্চিম দ্বার দিয়া অক্ষয় বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইবেন কত বন্ধ্যা নারী ফলপতনের আশায় এই বৃক্ষতলে আপন আপন অঞ্চল বিস্তার করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কথিত আছে যাহার অঞ্চলে এই বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবে তিনি পুত্রলাভ, যাহার কলিকা (কুশী) পতিত হইবে তিনি কন্যারত্ন লাভ করিবেন, কিন্তু যাহার অদৃষ্ট অত্যন্ত মন্দ এই দুয়ের মধ্যে কোনটাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।।

এই বাহির প্রাঙ্গন হইতে শ্রীমন্দিরের সুন্দর দৃশ্য উত্তমরূপে দর্শন করিবেন। এই শ্রীমন্দির বিশ্বকর্ম্মা এরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছেন যে ইহার ছায়া ঐ মন্দির মধ্যেই পতিত হয় অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নিম্নভাগে একাদশী গৃহ দর্শন করিবেন। এই ক্ষেত্রে এই দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিলেই একাদশী নামক মহাব্রতের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে একাদশীর উপবাস নাই।

শ্রীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের উপরিভাগে উত্তমরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বৃহদাকার অশ্লীল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ অনুসন্ধানে পাণ্ডাদিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এই মন্দির ভক্ত এবং অভক্ত উভয়ের পরীক্ষার স্থল। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একবারমাত্র শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অন্তিমে বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। দিনান্তে কতলোক জগন্নাথদেবজীউকে দর্শন করিতেছেন, ঐ সকল দর্শকদিগের মধ্যে কাহারা ভক্ত এবং কাহারা অভক্ত ইহা পরীক্ষার নিমিত্তই এইসকল কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্র বিচিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে পূর্ব্বে যাহারা এইসকল চিত্র দেখিয়া মন্দিরের

প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তাহারা পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দেবতা দর্শনের পূর্ব্বেই তাঁহারা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন শ্রীমন্দিরের গাত্রে নানাবিধ দেবদেবীরও চিত্র সকল দেখিতে পাইবেন, অতএব ভক্তগণ এই পুণ্যধামে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছেন সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের দারুমূর্ত্তিই দর্শন করিবেন।

এই বাহির প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকেই নানা দেবদেবীর অফুরান্ত দেবালয় দর্শন করিবেন কিন্তু যে কোন দেবতা দর্শন পাইবেন সকলগুলিই কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাইবেন অর্থাৎ কালীকাদেবীর কৃষ্ণমূর্ত্তি আর সরস্বতীদেবীরও কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। বিষ্ণুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পবিত্র অঙ্গ এই পুণ্য-স্থানে পতিত হওয়াতে মা জগজ্জননী বিমলা নামে পুরী আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, ঐ ভুবনমোহনী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিবেন। উত্তর দ্বারের ভিতর পাতালপুরী, তথায় বলিরাজের দর্শন পাইবেন। তৎপরে উত্তরদ্বারের উপরিভাগে বৈকুণ্ঠপুরী শোভা পাইতেছে। এই বৈকুণ্ঠপুরীতেই আটকিয়া বন্ধন করিতে হয়, আর এই-স্থানেই স্নানোৎসবের পর দেবমূর্ত্তি সকল বিচিত্রিত হইয়া থাকেন। ইহার অপর নাম নবযৌবন উৎসব, এই মন্দিরের পশ্চিম্‌দিকস্থ চত্বরে দেবের কলেবর প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত দর্শন করিয়া এই দ্বার দিয়া বহির্গত হইবার সময় বাদুরকুলের বাসা দেখিতে পাইবেন। তাহাদের কিচিরমিচির শব্দ এবং ক্রিয়া সকল দেখিয়া কত আমোদ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

পুরীধামে বহুবিধ মঠ আছে। তথায় নানাপ্রকার ভাল ভাল সন্ন্যাসী দিগের দর্শন পাইবেন। সেই পুণ্যাত্মাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির সঞ্চার হইবে।

শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎভাগে রোহিণীকুণ্ড ও ভুষণ্ডিকাকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। এই ভুষণ্ডিকাকই ব্রহ্মার নিকট রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পাক্ষ্য্ [illegible]

সাক্ষ্য দিয়াছিল, সেই নিমিত্ত বিদ্যাপতির অনুরোধে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক কাকের পুরস্কারস্বরূপ এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কাক লীলাচলে রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া চতুর্ভুজ হইয়াছিল দেখিয়া বিদ্যাপতিও ঐ কুণ্ডে স্নান করিবার অভিলাষ করিলে এই কাকই তাহাকে নিবৃত্ত করে। রাজা সেই সময়ের মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিলে নীলচক্রের উপর ধ্বজা বন্ধন করিতে হয়। কারণ পিতৃপুরুষগণ সদাসর্ব্বদা দেবতা স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, আমার বংশে কেহ এই তীর্থস্থানে আসিয়া নীলচক্রের উপর ধ্বজা প্রদান করিয়া কুল গৌরবান্বিত করুক। এই চক্রে ধ্বজা দিতে ন্যূনকল্পে ১।/৫ খরচ লাগে।

প্রতি একাদশী তিথিতে এই শ্রীমন্দিরের শিখরদেশে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কল্যাণ কামনায় একটী বাতি (রংমসাল) দেওয়া হয়। এই বাতি প্রদান করিবার সময় শ্রীমন্দিরের শিখরদেশ হইতে উচ্চৈস্বরে "জয় মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকি জয়" বার বার প্রতিধ্বনিত করিতে থাকেন। যে ব্যক্তি মন্দিরের পার্শ্ব বহিয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্দিরের উপর লৌহনির্ম্মিত শিকল সাহায্যে উঠেন, তাহার সাহসকে প্রশংসা করিতে হয়।

এই ক্ষেত্রে এক শ্রীমন্দির ব্যতীত যেখানে যত দেবালয় ও শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি সকল দর্শন করিবেন সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে বহু নিম্নে অন্ধকার মধ্যে স্থাপিত দর্শন পাইবেন।

একাদশীর বৃত্তান্ত।

শান্তা নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা কায়মন চিত্তে সদাসর্ব্বদা জগন্নাথদেবের দর্শন বাসনা করিতেন। একদা রথ যাত্রার পূর্ব্বে তাহার প্রভুকে

রথোপরি বামনরূপ মূর্ত্তি দর্শন বাসনা বলবতি হইল; তখন তিনি একাকী সংসার-মায়া ছিন্ন করিয়া, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া পদব্রজে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যথাক্রমে পুরীধামে উপস্থিত হইয়া রথোপরি "বামন ব্রহ্মরুদ্র" রূপ দর্শন করিয়া বহুদিবসের বাসনা পূর্ণ করিলেন। রথযাত্রার পর শয়ন একাদশী তিথিতে নির্জ্জলা উপবাসপূর্ব্বক ব্রত পালন করিতে করিতে দিবাবসানে এই ক্ষেত্রে তিনি অঞ্চল বিস্তার করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া তদোপরি শয়ন করিলেন। অন্তর্যামী ভগবান ইহা অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পুণ্যক্ষেত্রে বিপ্র-কন্যা আমারই ভক্ত হইয়া পুণ্য উপার্জ্জন কারণ কতই কষ্ট সহ্য করিতেছে। ঐ ভক্তের ক্লেশ আমার হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিতেছে। এরূপ কঠিন ব্রত এক্ষেত্রে শোভা পায় না। জগৎচিন্তামণি এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দ্বিজ রূপ ধারণ করতঃ ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মাতঃ! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে এরূপ কাতর অবস্থায় পতিত হইয়া হরি দরশনের ফল নষ্ট করিতেছ কি নিমিত্ত? ব্রাহ্মণী সবিনয় পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি হরি দরশনের ফল নষ্ট করি নাই, একাদশী নামক মহাব্রত গ্রহণ করিয়া উহা পালন করিতেছি।" ছদ্মবেশ-ধারী ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এই পুণ্যধামে উপবাস করিয়া সমস্ত পুণ্য নষ্ট করিতেছ। এবার ব্রাহ্মণী রাগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন আপনার গলে যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি, আপনার মুখে এরূপ একাদশী ব্রতের নিন্দা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, কারণ যে দেবী স্ত্রী বা পুরুষ এবং সকল জীবের দশ ইন্দ্রিয় ও মন, তিনিই একাদশ মূর্ত্তিমতী একাদশী দেবী। যে দেবীকে পণ্ডিতগণ জ্ঞানব্যাপিনী গঙ্গাস্বরূপিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, যাঁহার জ্ঞান জ্যোতিঃকে প্রসন্ন করিতে পারিলে, কি ব্যাবহারিক, কি পরমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধি হয়? যে দেবীর কৃপামাত্র পা হইলে সকল ব্রতই ফলবতী হয়, যাঁহার নিন্দা শ্রবণে কোনরূপ প্রায়-

শ্চিত্তের বিধান নাই, সেই মহাদেবীর নিন্দা করিতে কি আপনার লজ্জাবোধ হইতেছে না? এই ব্রত আমাদিগের কুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তাহাতে আমি মন্দ ভাগ্য বিধবা রমণী, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া আমার ব্রতের কথা শুনিয়াও কিরূপে অন্ন খাইতে অনুরোধ করিতেছেন, পুনর্ব্বার আপনি আমার নিকট এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ ঈষদ্‌হাস্য সহকারে তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, তুমি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা, একাদশীর ব্রত এবং রথোপরি বামনরূপ রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করিলে কি ফল হয় আমার নিকট প্রকাশ কর, তোমার পবিত্র রসনায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে।

বিধবা বিপ্র-কন্যার একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য প্রকাশ।

জীবনাবধি নির্জ্জলা একাদশী ব্রত পালন করিলে, অন্তে শ্রীহরির চরণ দর্শন লাভ হয় এবং তিনি বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে কৃপাপূর্ব্বক স্থান দান করেন। আর আটাদশী করিলে, আটায় উদর পূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু হে বিপ্র! বলদেখি, ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিতে না পারিলে কি আটাতে ফল ধরিতে পারে? যে ব্যক্তি এই মহাব্রততে আটারুটি ভক্ষণ করে, তাহাকে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে এই মহাব্রত পালন করেন, অন্তে তিনি নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত পাইয়া থাকেন, শাস্ত্রে এইরূপ অবগত হইয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র ব্রাহ্মণ বেশধারী নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিতেছ জন্মাবধি একাদশী ব্রত পালন করিলে ভগবানের দর্শনলাভ হয়, জিজ্ঞাসা করি, সে কথা কে নিশ্চয় বলিতে পারে?

এক্ষণে তুমি রথোপরি জগন্নাথরূপ বামনমূর্ত্তির দর্শন ফল প্রকাশ করিয়া বল, এই দর্শন ফল জানিবার নিমিত্ত আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তখন ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিলেন, রথোপরি বারেক বামনরূপ দর্শন করিলে, তাঁহাকে আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, একথা আমি পূজ্যপদ স্বামীর নিকট স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। তখন সেই দ্বিজ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। যদ্যপি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার রথোপরি বামনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকল পাপ বিনাশ হইয়াছে, আর কেন বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়া অন্য ব্রতের আশ্রয় লইতেছ? জগন্নাথে মতি রাখি মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সুস্থ হও। এই কথায় ব্রাহ্মণী ক্রোধে উন্মত্ততার সহিত বলিতে লাগিলেন, হে ভণ্ড বিপ্র! যদ্যপি স্বয়ং জগন্নাথদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আমার সম্মুখে এইরূপ বাক্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হয়। দয়াল প্রভু তখন ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দ্বিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জগন্নাথমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই বিপ্র-কন্যার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণি! আমার এই পুণ্য-ক্ষেত্রে তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি দ্বিজরূপে তোমার নিকট আসিয়াছি, আমার বাক্য কখন অন্যথা হয় না। পূর্ব্বে আমি আমার পরম ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সদয় হইয়া তাহার প্রার্থনায় এ ক্ষেত্রে একাদশী ব্রত নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিতে অনুমতি করিয়াছি, আর অদ্য তোমার সম্মুখে ও পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, এই ক্ষেত্রে আমার দর্শনে, আমার ভক্তগণের সকল পাপ বিনাশ হইয়া থাকে, কিন্তু এই পুণ্যময় স্থানে অন্য কোন ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার সকল পুণ্য-ফলই নষ্ট হয়। অতএব তুমি আমার প্রতি ভক্তি রাখিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সুস্থ হও। ব্রাহ্মণী সেই জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব রূপ দর্শন করিয়া গললগ্নি-কৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! হে অগতির গতি! আমি

মূঢ়মতি, ভজন সাধন কিছুই জানি না, কৃপা কর হে আশ্রিত জনে। আপনার দর্শনমাত্র আমার সকল পাপ বিনাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। শ্রীহরির পরিবর্ত্তে আমি কলির মোক্ষরূপ জগন্নাথরূপ দর্শন পাইয়াছি, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? দয়াল প্রভু তখন বিপ্র-কন্যার প্রতি দয়া করিয়া বলিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার মন্দির পার্শ্বে একাদশী দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার বরে একাদশীর পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীমূর্ত্তি এইরূপ উপদেশ বাক্য প্রদান করিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। ব্রাহ্মণীও সেই ব্রহ্মাচরণে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

মহোৎসব।

বৈশাখ মাসে, অক্ষয়তৃতীয়া হইতে বাইস দিন পর্য্যন্ত চন্দন-যাত্রা হয়। অষ্টমী তিথিতে প্রতিষ্ঠোৎসব হইয়া থাকে। শুক্র জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল একাদশীতে রুক্মিণীহরণ উৎসব হয়। পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা। আষাঢ় মাসে শুক্ল দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা মহোৎসব অতি সমারোহে হয়। শয়ন একাদশীতে প্রভু শয়ন করেন। শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব হয়, এই সময় জগন্নাথ দেব শ্রীমন্দির হইতে মার্কণ্ডহ্রদের উপর কিয়দাংশ সেতু বন্ধনপূর্ব্বক জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া "কালীয়" মহাবিষধরকে দমন করেন, এই নিমিত্ত মার্কণ্ড হ্রদের জল সেই বিষধরের বিষ সংযোগে সকল সময়ই সবুজ বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রভুর শ্রীচরণস্পর্শে এক্ষণে উহা নির্ম্মল হইয়াছে, ঐ জল সকলে পান করিলেও কোনরূপ হানি হয় না। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব হয় এই সময় দলে দলে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিয়া এই ক্ষেত্রের পথগুলিকে এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করান। তাহার পর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন, আশ্বিনে সুদর্শনোৎসব, কার্ত্তিকমাসে উত্থান একাদশী ও রাসযাত্রা উৎসব হয়।

অগ্রহায়ণে প্রচারণোৎসব। পৌষ ও মাঘমাসে অভিষেকোৎসব, মকরোৎ-সব, গুণ্ডিচা উৎসব এবং মাঘীপূর্ণিমাতে যে উৎসব হয়, সেই সময় বহু দূরদেশ হইতে কত যাত্রীর সমাগম হয় তাহা বর্ণনাতীত। এই মেলার সময় জগন্নাথদেব প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত পাশা ক্রিয়া করিতে করিতে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধে ভক্ত গজকে উদ্ধার করিতেছেন, প্রভুকে এইরূপ বেশ ধারণ করিতে হয়। তখন এই মূর্ত্তিত্রয়ের ও লক্ষ্মীদেবী হস্ত পদ, অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া থাকেন এবং রত্ন-বেদীর নিম্নভাগে গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধবেশ দেখান হয়. এই শৃঙ্গার-বেশ যিনি দর্শন করেন তিনিই মোহিত হন। এই রাত্রিতে রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের দ্বার খোলা থাকে এবং যাত্রীদিগের সুবিধার্থে নিয়মিত পুলিশ প্রহরী ও পুরীরাজের লোক সকল পাহারায় নিযুক্ত থাকেন আরও মন্দির অধ্যক্ষ রাজকিশোর দাসের সুব্যবস্থায় সেই জনতাপূর্ণ স্থানে ভক্তগণকে সুচারুরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব হয়। সেই সময় ও প্রভু শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া দোলমঞ্চে প্রবেশ করেন, তখন ও প্রভু নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন। চৈত্রমাসে শ্রীরাম-নবমী তিথিতে দমনকভঞ্জিকা হয়। এই উৎসবে প্রভু শ্রীরামরূপ হইয়া ভক্তবৃন্দকে মোহিত করেন, ঐ সময় ও বহু ভক্তগণের সমাগম হয় এবং প্রভু হস্ত পদ বিশিষ্ট হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন ও শ্রীরাম লক্ষ্মণরূপ দর্শন দানে ভক্তগণকে উদ্ধার করেন।

উপরোক্ত যে সমস্ত উৎসব প্রকাশিত হইল তন্মধ্যে রথযাত্রায় যেরূপ ধুম ও যাত্রী-সমাগম হয় এরূপ কোন উৎসবের সময় হয় না। রথযাত্রা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সিংহদ্বারের সম্মুখে যে প্রশস্ত রাস্তা যাহা বড় দাঁড় রাস্তা বা পুরীর প্রধান রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ। যে রাস্তা পুরী হইতে গুণ্ডিবাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে, যাহা প্রস্থে একশত ফিট্ হইবে, সেই প্রশস্ত পথেই সারি সারি তিনখানি রথ সজ্জিত থাকে। অবগত হইলাম এই রথগুলি প্রতি বৎসরই

নূতন নির্ম্মিত হয়। জগন্নাথদেবের রথের নাম "নন্দীঘোষ" ইহার উচ্চতা ৩০ হস্ত। পাঁচ হস্ত পরিমাণ ষোলখানি চাকা আছে, দীর্ঘে ও প্রস্থে ২৩ হস্ত। রথগুলির নিম্নতলেই বিস্তর কাষ্ঠ আছে, কিন্তু উপরতলে কাষ্ঠের ছাউনীর উপর নানা রংয়ের রঞ্জিত বনাত দ্বারা আবৃত এবং জরির দ্বারা সুজজ্জিত। বলরামদেবের রথ জগবন্ধুর রথ অপেক্ষা উর্দ্ধে ও দীর্ঘে এক হস্তমাত্র ছোট। বলরামের রথের নাম "তালধ্বজ" এই রথের ১৪ খানি চাকা আছে। সুভদ্রাদেবীর রথ সর্ব্বদিকে "তালধ্বজ" অপেক্ষা এক হস্ত ছোট, এই রথের নাম "পদ্মধ্বজ"। ইহাতে ১২খানি চাকা আছে কিন্তু রথগুলিতে যে কাষ্ঠের অশ্ব যুক্ত থাকে ঐ অশ্বগুলিকে দেখিলেই সহরের (বৃষকাষ্ঠ) বলিয়া ভ্রম হয়। সর্ব্বপ্রথমেই বলদেবের রথের টান হয়, তৎপরে সুভদ্রাদেবীর, সর্ব্বশেষে জগন্নাথদবের রথের টান হইয়া থাকে। সেই টানের সময় ঐ প্রশস্ত রাস্তায় পশ্চাদ পশ্চাদ তিনখানি রথ থাকায় ও রাস্তা জনতাপূর্ণ হওয়াতে এইস্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। পাণ্ডারা শ্রীমন্দিরের নিকটস্থ বাটীর ছাদের উপর বসিবার জন্য যাত্রীদিগের নিকট হইতে দু-পয়সা লাভ করেন। রথ টানের সময় প্রত্যেক রথের চতুর্দ্দিকে মোটা দড়ি (কাচি) দ্বারা বেষ্টিত থাকে। গণ্যমান্য ব্যক্তি, পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও মন্দিরের সেবায়েৎগণ ব্যতীত অপর কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পান না। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইলে পুরীরাজ উপস্থিত হন এবং শঙ্খঘণ্টা কাঁশরধ্বনি ও হরিধ্বনি সহকারে রথের টান আরম্ভ হয়।

এই মূর্ত্তিত্রয়কে রথারোহণ করাইবার সময় পাণ্ডারা প্রভুকে পটডোরে (নূতন সালুর-ফালি) বন্ধন করিয়া বেত্রাঘাত ও নানাপ্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন। বিগ্রহগণকে রথের উপর স্থাপিত করা হইলে পর পূজারম্ভ হয়, তাহার পর পূর্ব্ব-প্রথানুসারে পর পর রথের টান হইতে থাকে।

রথযাত্রার এই রথগুলি সিংহদ্বারের সম্মুখ হইতে গুণ্ডিচা-গৃহে গমন করে।

কেহ কেহ এই স্থানকে মাউসি বাড়ী বলিয়া থাকেন। এই মাউসি বাড়ী বড় দাঁড়ের প্রান্তভাগে অবস্থিত। মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মূলমন্দিরের প্রাচীরে দুইটী প্রধান দ্বার আছে। ঐ দ্বার দুইটী পৃথক্ পৃথক্ নামে শোভিত, একটীর নাম সিংহদ্বার, অপরটীর নাম বিজয়দ্বার। প্রথমে গুণ্ডিচা মণ্ডপে প্রভু সিংহদ্বারে প্রবেশ করেন, এইরূপে মাউসি বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর দশমী তিথিতে পুনঃযাত্রা উপলক্ষে বিজয়দ্বার দিয়া রথারোহণপূর্ব্বক যথানিয়মে পাণ্ডারা শ্রীমন্দিরে প্রভুকে প্রত্যানীত করেন।

যে সকল ভক্ত রথযাত্রা দর্শন করিতে এই ক্ষেত্রে গমন করিতে অভি-লাষী হইবেন, তাঁহারা নির্দ্ধারিত সময়ের দুই তিন দিন পূর্ব্বে তথায় গমন করিবেন, নচেৎ রেলওয়েতে ও এইক্ষেত্রে অত্যন্ত জনতা হইলে বাসাভাড়া লইবার সময় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয় এমন কি প্রত্যেক যাত্রীকে চারিটাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দিয়াও সুবিধামত বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয় এই নিমিত্ত কিছু পূর্ব্বে যাত্রা করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা হইলে রেলে ও বাসাভাড়া করিবার সময় অধিক ক্লেশভোগ করিতে হয় না।

পুরীধামে জগবন্ধুদেবজীউকে দর্শন করিলে একদিবস পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয় কেন না ব্রাহ্মণভোজন সকল তীর্থের মুখ্য। পশ্চিম তীর্থের ন্যায় এক্ষেত্রে লুচি, পুরী, সন্দেশের আবশ্যক হয় না, এখানে কেবল ভক্তিপূর্ব্বক মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া সাধ্যমত দক্ষিণা দিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে যেরূপ দক্ষিণাদান করিবেন উহার দ্বিগুণ পাণ্ডা-দিগকে দান করিতে হয় আর তীর্থগুরু পাণ্ডাজীউর মুখে প্রসাদ দিয়া সাধ্যানুসারে উচ্চহারে দক্ষিণাদান করিবেন।

রথযাত্রার সময় শ্রীমন্দির হইতে প্রভু মাউসি বাড়ী গমন করিলে শ্রীমন্দিরের আনন্দবাজারে ভোগের আটকিয়া পাওয়া যায় না তখন

মাউসি বাড়ীর আনন্দবাজারে ভোগ বিক্রয় হয়, পুরী হইতে মাউসি বাড়ী না যাইতে পারিলে প্রসাদ পাওয়া যায় না। অনেক যাত্রী প্রসাদের নিমিত্ত এতদূর গমন করিতেও ইচ্ছা করেন না সুতরাং যাহার ভাগ্যে যেরূপ ঘটে তিনি সেইরূপই আহার করেন কারণ পুরীধামে ভক্তদিগের রন্ধন প্রথা নাই। সেই সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন। আপন আপন পাণ্ডার নিকট ভোগের মূল্য জমা দিলেই তাঁহারা ঐ মাউসি বাড়ী হইতে প্রসাদ খরিদ করিয়া আনিবেন আপনাদের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না।

সমুদ্র।

শ্রীমন্দিরের নৈঋত কোণে অর্দ্ধ মাইল দূরে মহাসমুদ্র অবস্থিত। স্বর্গদ্বার দিয়া যে সোজা রাস্তা আছে ঐ রাস্তা দিয়া যাইলেই সমুদ্রে পৌছনা যাওয়া যায়। চতুরানন ব্রহ্মা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় ব্রহ্মলোক হইতে প্রথমেই এই দ্বারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত এই দ্বারের নাম স্বর্গদ্বার হইয়াছে। এই স্বর্গদ্বারে সাক্ষী কাণ পাতা হনূমান জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সাগর সমীপে কাণ পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যাহাতে সাগরের গর্জ্জন ও তরঙ্গের জলরাশি উত্তাল হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, মহাবীর হনূমান এই গুরুভার লইয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এই নিমিত্ত সাধারণে ইহাকে কাণ-পাতা হনূমান বলে। এই সমুদ্রের বিকটগর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সুভদ্রাদেবী ভীত হইয়াছিলেন সুতরাং প্রভূ অভয়দানে ভগ্নীকে মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন।

এই মহাসমুদ্র তীরে যাইবার সময় পথে কতপ্রকার ভিখারীকে কত স্থানে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাইবেন। কেহ দেহের অর্দ্ধেকটা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, কেহ বুক চাপড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে আবার

কেহবা মস্তক বালির মধ্যে চাপা দিয়া বুকে অগ্নির মালসা রাখিয়া হাত পা নাড়িয়া যাত্রীদিগের নিকট ইঙ্গিতে পয়সা প্রার্থনা করিতেছে, কেহবা কতকগুলি ঘাসের বোঝা স্থাপন করিয়া গাভীদিগকে খাওয়াইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে. এইরূপে কতপ্রকার ভিক্ষাজীবী কত ছলে ভিক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইবেন, আরও পথের দুই পার্শ্বে পঞ্চফল বিক্রয়ের ধুম লাগিয়া থাকে তখন যাত্রীদিগের আর অগ্রসর হইবার স্থান থাকে না। আমি এখানে (কলিকাতায়) মনে ভাবিতাম যে কালীঘাটের ন্যায় কাঙ্গালী আর কোথাও এত অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া ভিক্ষা করে না কিন্তু এই সকল ভিক্ষাজীবীকে দেখিয়া আমার সে ভ্রম অন্তর্হিত হইল। আহা! ইহাদের নিদারুণ যাতনা ভোগ দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। এইপ্রকার সমুদ্রপথে কতপ্রকার কত লোক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের বালুকাময় তীরে উপস্থিত হইবেন।

সমুদ্র দর্শন করিবার পূর্ব্বে বাসাবাটী হইতে নারিকেল, গুপারি, পৈতা, পয়সা, পঞ্চরত্ন এই সকল যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন এবং পৃথক কাপড় ও একখানি গামছা লইবেন কারণ সমুদ্রের ঢেউ খাইয়া স্নান করিলে এত অধিক বালি লাগে যে, সেই কাপড় আর ব্যবহার করিতে পারা যায় না।

সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় পাণ্ডার নিকট হইতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চরত্ন- পঞ্চফল, নারিকেল, গুপারি, পৈতা পয়সা প্রভৃতি প্রদানপূর্ব্বক মুক্তি কামনায় সাগর তীরে সঙ্কল্প করিবেন এবং সাধ্য মত দক্ষিণা দান করিবেন।

এই মহাসমুদ্রের সীমা নির্ণয় করা সুকঠিন, ইহার তীর হইতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনন্তবিস্তারি নভোমণ্ডলে সমুদ্রের চারিধারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক তীর হইতে অন্য তীরে দৃষ্টি চলে না। বালুকাতটে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের ভীষণ গর্জ্জনশীল তরঙ্গমালা পরে পরে লীলা করিতেছে সেই শ্বেত শুভ্র ফেণপুঞ্জ তরঙ্গমালায় অবগাহন করিয়া

অসংখ্য যাত্রী প্রাণে কত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইস্থানে অজস্র ঝিনুক ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকায় নানা দূরদেশ হইতে সমাগত নরনারী এই সকল ঝিনুক অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিবার সময় বালুকাময় তট-ভূমীতে তাহাদের কত পদস্খলন হইয়া থাকে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ নিঘাতে কত কোমলাঙ্গী ভূপতিতা হন, সে সমস্ত উপেক্ষা করিয়াও কত আমোদ অনুভব করিতে থাকেন এবং আপনাপন পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল সাগ্রহে ঝিনুকে পরিপূর্ণ করেন, আর চিরন্তন প্রথানুসারে ঢেউ খাইবার জন্য তাহারা যেন যূপঃকাষ্ঠে আবদ্ধ ছাগশিশুর ন্যায় অনিমেষ নয়নে তথায় উপবেশন করিয়া থাকেন।

এই সমুদ্রপথেই শ্বেতগঙ্গার সঙ্কল্প করিবেন। "শ্বেতগঙ্গা" একটী পুষ্করিণী বিশেষ। এই পুষ্করিণী ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, চন্দনপুকুর ও মার্কণ্ড হ্রদের অপেক্ষা অনেক ছোট কিন্তু ইহার গভীর অত্যন্ত, চতুর্দ্দিক সোপান শ্রেণীতে শোভিত এবং মধ্যে কলমিদলে পরিপূর্ণ। ইহার জল ঘোলা ও দুর্গন্ধময়, তথাপি ভক্তগণ মুক্তি পাইবার আশে বিনা আপত্তিতে ইহাতে স্নান বা জলস্পর্শ করিয়া থাকেন। এই শ্বেতগঙ্গার তীরের উপরিভাগে শ্বেতমাধব ও মৎস্যমাধবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন, এই শ্বেতমাধবজীউর মানসেই এইস্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয় এই নিমিত্ত এই পুষ্করিণীর নাম শ্বেত গঙ্গা হইয়াছে। এই শ্বেত ও মৎস্যমাধবজীউকে অর্চ্চনা করিলে বহু পুণ্য-সঞ্চয় হয় এবং অন্তিমকালে শ্বেতদ্বীপে স্থান লাভ হয়।

পঞ্চতীর্থ।

এই পুণ্যধামে আসিলে পঞ্চতীর্থে সঙ্কল্প ও স্নান তর্পণ করিতে হয়। যথানুক্রমে পঞ্চতীর্থের নাম প্রকাশিত হইল। নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, সমুদ্র,

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ এই পাঁচটী এখানে পঞ্চতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ) ইহা ব্যতীত এখানে আরও অনেক তীর্থ বিদ্যমান আছেন, এই পঞ্চতীর্থে যাত্রা-কালীন প্রত্যুষে গমন করিবেন এবং বেলা ৯টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন এই সময়ের মধ্যে যতদূর পারেন সেই কয়টীই দর্শন করিবেন কারণ বেলা যত অধিক হইবে রৌদ্রের তাপে বালুকারাশি তত অধিক উত্তপ্ত হইয়া চলত-শক্তিকে রহিত করিতে থাকিবে।

লোকনাথদেবের মন্দির।

এই মন্দির পুরীর শ্রীমন্দির হইতে অন্যূন দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র এই লিঙ্গরাজকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই লোকনাথদেবজীউ প্রস্তরময় একটী শিবলিঙ্গ। প্রভু সকল সময়েই জলে ডুবিয়া থাকেন। কেবল শিব চতুর্দ্দশীর দিন জল হইতে বাহির হন। দেবালয়ের সম্মুখে পার্ব্বতী সরোবর নামে যে একটী পুষ্করিণী আছে ভক্তগণকে প্রথমে ঐ সরোবরে স্নান করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। যাত্রীগণ এস্থানে স্নান করিবার জন্য পুরী হইতে নারিকেল তৈল সংগ্রহ করিয়া আনিবেন কারণ এইস্থানে তৈল পাওয়া যায় না। পুরী হইতে এই দেবালয়ে গাড়ীর সাহায্যে আসিতে ইচ্ছা করিলে গোশকটে আসিবেন কারণ ইহার অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। শ্রীরামচন্দ্র এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার সৈন্য কপিবানরগণকে ইহার পাহারায় নিযুক্ত করেন এই নিমিত্ত এইস্থানে বহুসংখ্যক কপিকুলকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিদ্ধ বকুল।

লোকনাথদেবের দেবালয়ের অনতিদুরে একটী আশ্চর্য্য বকুলবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কোটরময় অর্থাৎ এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে কাষ্ঠের সারভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফাঁপা গুড়িটী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া শোভা বিস্তার করিয়া আছে। কথিত আছে কোন তাপস এই বৃক্ষতলে বহুদিবসাবধি যোগাভ্যাস করিতেন কোন সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে নূতন রথ নির্ম্মাণ সময় কাষ্ঠের অভাব হইয়াছিল, পুরীরাজ সংবাদ পাইলেন যে এই বকুল বৃক্ষের কাষ্ঠ রথনির্ম্মাণের উপযুক্ত হইবে সুতরাং তিনি তাঁহার অধীনস্থ কারিকর দিগকে ঐ গাছ কাটিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। যথাসময়ে সন্ন্যাসী এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার আরাধ্যদেবের নিকট মন বেদনা নিবেদন করিলেন। মায়াময় লীলা প্রকাশ ছলে রাত্রির মধ্যেই নিরেট গুড়ি ফোঁপরা করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পরদিবস লোকজন রাজার আজ্ঞানুসারে গাছ কাটিতে আসিয়া এই অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং রাজসমীপে এই অদ্ভুত সংবাদ প্রদান করিয়া এই বৃক্ষকে দেবতা বোধে পুনঃ পুনঃ অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি সকলেই এই বৃক্ষকে দেবতা বোধে পূজা করিয়া থাকেন।

যমেশ্বরদেবের মন্দির।

এইস্থান হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে গমন করিলেই দেবস্থানে পৌছান যায়। এই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে যমদণ্ডের ভয় থাকে না।

অলাবুকেশ্বর-দেবের মন্দির।

যমেশ্বরদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই লিঙ্গটিকে দেখিতে ঠিক্ একটী অলাবুর ন্যায়। এই দেবকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করিতে পারেন এই নিমিত্ত এই অলাবু-কেশ্বরদেব এইস্থানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

বিদুরালয়।

পরম বৈষ্ণব ধর্ম্মপুত্র বিদুর এইস্থানে অবস্থানকালীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদা অতিথিরূপে আগত হন। সেই দিবস ধর্ম্মচূড়ামণি বিদুরের আলয়ে সামান্য খুদের পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক সেই পিষ্টক প্রদানে অতিথি সৎকার করেন, নারায়ণ এই পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পিষ্টক অক্ষয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, অদ্যাপি যাত্রীগণ এই বিদুরালয়ে গমন করিলে সেই খুদের মহাপ্রাসাদের পিষ্টক আস্বাদ করিয়া পবিত্র হন। তৎপরে ভৃগুপদচিহ্ন-ধারী নারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শন করিবেন। কথিত আছে একদা ভৃগুমুনি নারায়ণের মনভাব জানিবার জন্য যে সময় তিনি কমলাদেবীকে লইয়া অনন্তশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের বক্ষঃস্থলে পাদাঘাত করিলেন, তদ্দর্শনে কমলাদেবী কুপিত হইয়াছিলেন কিন্তু নারায়ণ সেই পদচিহ্ন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া ঋষির পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন, কারণ তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কঠিন হৃদয়ে পাদাঘাত করিয়া না জানি ঋষিবরের কোমল চরণে কত ব্যথা হইয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মুনিবর আশ্চর্য্য বোধ করিলেন এবং মনে

মনে লজ্জিত হইয়া তিনি তাঁহার স্তবে মনোনিবেশ করিলেন। এই দেবালয়ে সেই ভৃগুপদচিহ্নধারী নারায়ণজীউকে দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন।

চক্রতীর্থ।

এই তীর্থ স্থানেই প্রথম দারুব্রহ্মরূপ কাষ্ঠ ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। চক্রতীর্থের উৎপত্তি সমুদ্র হইতেই হইয়াছে। সমুদ্র হইতে একখণ্ড বালুকাময় চড়া এই স্থানকে পৃথক করিয়াছে। এই তীর্থ তীরে পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও বালির পিণ্ডদান করিতে হয়। সমুদ্রের জল লোনা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই চক্রতীর্থের জলের আস্বাদ সুস্বাদু। এই চক্রতীর্থের উপরি-ভাগে শ্রীশ্রীচক্রনারায়ণদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন দর্শনে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই সকল তীর্থ ও দেবতাদিগের দর্শনের সময় অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিবেন কারণ ফণিমনসার কাটা সকল অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ছড়াছড়ি থাকায় যাত্রীদিগকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়া থাকে।

মার্কণ্ড হ্রদ।

এই পবিত্র হ্রদ একটী বৃহৎ পুষ্করিণী বিশেষ। ইহার জল সবুজ বর্ণ। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের ন্যায় ইহার জল নির্ম্মল নহে, চতুর্দ্দিক প্রস্তরে বাঁধান ও সোপান শ্রেণীতে সুশোভিত। কালীয় নামক বিষধর এই হ্রদে বাস করিত, তাহার বিষে এই হ্রদের জল সবুজবর্ণ হইয়াছে কিন্তু নারায়ণের শ্রীচরণ স্পর্শে এক্ষণে উহাতে আর কোনরূপ বিষ না থাকায় সাধারণে ঐ জল পান করিতেছেন। এই হ্রদের উপরিভাগে একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ, মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবেন এবং ইহার তীরে স্থানে স্থানে

আরও জগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, সত্যপীড়ের দরগা, যম ও যমের স্ত্রী এবং নবগ্রহের মূর্ত্তি সকল দর্শন করিবেন। মার্কণ্ড হ্রদে থুতু বা ময়লা কাপড় ধৌত করিতে নিষেধ আজ্ঞা আছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

এই সরোবর শ্রীমন্দির হইতে আড়াই মাইল দূরে এবং গুণ্ডিচাগৃহ বা মাউসি বাড়ীর অনতিদূরে অবস্থিত। পথিমধ্যে চন্দনপুকুর দেখিতে পাইবেন। যে সকল অসমর্থ যাত্রী চলিয়া যাইতে কষ্ট বোধ করিবেন, তাঁহারা পুরী হইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া এই তীর্থতীরে যাইবেন কারণ এখানে যাইবার পাকা প্রশস্ত পথ উহা বড়দাঁড় রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ আছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের গুণ্ডিচা নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি ও স্বামীর ন্যায় জগন্নাথদেবজীউকে ভক্তি করিতেন। অবগত হইলাম প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় তিনি শ্রীমন্দির হইতে জগবন্ধুকে আপন ভবনে লইয়া আসিয়া ইচ্ছামত ভোগদানে সন্তুষ্ট হইতেন এবং শ্রীমন্দিরে যেরূপ প্রকারে ভোগের পর আনন্দ বাজারে প্রসাদ ভক্তদিগের আহারের নিমিত্ত বিক্রয় হয়, যে কয়দিন প্রভু এইস্থানে থাকেন, মহিষীর সুবন্দোবস্তর গুণে সেইরূপই আটকিয়া ভোগ হইয়া থাকে। এক্ষণে পাণ্ডাগণ সেই স্বর্গীয় মহিষীর ভক্তি নিদর্শন চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপিও রথযাত্রার সময় জগবন্ধুকে পূর্ব্বের ন্যায় এই গুণ্ডিচাগৃহে ভক্তিপূর্ব্বক নানাপ্রকার ভোগ দিয়া থাকেন এবং এই মহিষীর নাম চিরস্মরণীয়া রাখিবার নিমিত্ত এই গৃহের নাম তাঁহারই নাম অনুসারে গুণ্ডিচা গৃহ রাখিয়াছেন।

ইন্দ্র-সরোবরে স্নান, আহ্নিক ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে

হয়। ঐরূপ ভক্তিসহকারে সম্পাদন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই পঞ্চতীর্থ দর্শন সময় আপন পাণ্ডার নিকট হইতে একটী ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইবেন এবং পৈতা সুপারি ও পয়সা সঙ্গে রাখিবেন, তাহা হইলে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং ঐ ব্রাহ্মণ তীর্থস্থান সকল জানাইয়া দিবেন। এই পুরী তীর্থে ভিক্ষাজীবীদিগকে একটা পাই পয়সা দিলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্র-সরোবরে বিস্তর কুর্ম্ম আছে। যাত্রীগণ খাবার লইয়া তীর হইতে ডাক দিলেই উহারা আসিয়া সর্ব্ব সম্মুখে তাহাদের আহার লইয়া যায়। এই সরোবরের দক্ষিণে নৃসিংহদেব ও পশ্চিমে নীলকণ্ঠদেবের মন্দির বিরাজমান আছে। ইহার উত্তর তীরে নানা দেবদেবীর মন্দির ও যমের মাসী পিশীর প্রতিমূর্ত্তি আরও পঞ্চ পাণ্ডবের বনবাস সময়ের প্রতিমূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে পাইবেন।

আঠার নালা।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের আঠারটী পুত্র ছিল। এমনকি মহাকার্য্য করিতে পারিলে তাহাদের নাম অক্ষয় হইতে পারে, এই চিন্তাতেই তিনি সদাসর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ-দেব তাঁহার শিরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন যে, তোমার আঠারটী পুত্র এই পুরী মধ্যে পরোপকার হেতু নদীরূপে অবস্থান করিলে, তাহারা তোমার ন্যায় অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক যশলাভ করিতে পারিবে। মহারাজ স্বপ্নে এইরূপ অবগত হইয়া পরদিবস তিনি পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া স্বপ্ন বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার বাক্যের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন,

পুরীধামে—আঠার নালার দৃশ্য। [২৪২ পৃষ্ঠা।
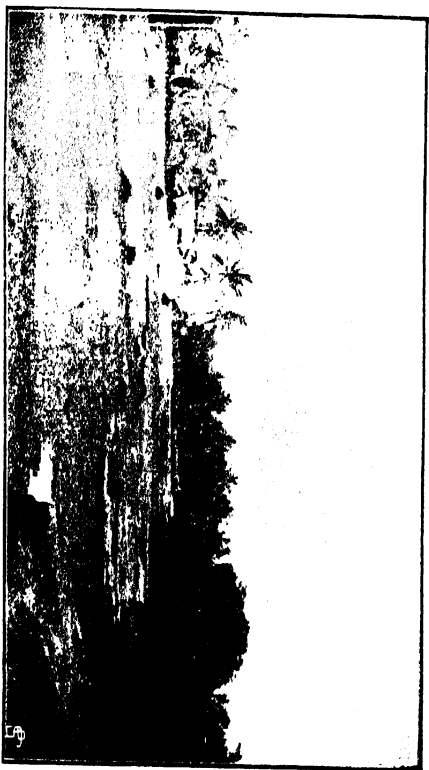
তখন রাজা তাঁহার সেই আঠারটী পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথ-দেবের শ্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। পরদিবস যখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অভ্যাস মত শ্রীমন্দিরে প্রভুকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আঠারটী স্নেহের পুত্তলি শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে মৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে তদ্দর্শনে তিনি শোকে অধীর হইয়া ঐ মৃত পুত্রগুলিকে নদীতীরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং তথায় তাঁহার আজ্ঞানুসারে আঠারটী সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া স্বপ্নাদেশ মত তাহাদিগকে এক একটী সেতুর মধ্যে প্রোথিত করিতে অনুমতি দিলেন। পুরীর প্রান্তভাগে ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরের অনতিদূরে এই আঠার নালা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই আঠার স্তম্ভযুক্ত সেতু পারা-পার হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর প্রভাবে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

রন্ধনশালা।

পুরীধামে রন্ধনশালা দেখিবার যোগ্য। লক্ষ্মীদেবীর এই রন্ধনপ্রণালী দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। পর পর ৪০।৫০টী আটকিয়া একত্রে এরূপভাবে সজ্জিত রাখা হয় যে, সকল আটকিয়াগুলিতেই সমভাবে অগ্নির উত্তাপ পায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কখন মা লক্ষ্মীর কৃপায় এই রসুই বিস্বাদ হয় না। এই রন্ধনশালা স্বর্গীয় রামমোহন দে মল্লিকের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ দে মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে যথায় মহাপ্রসাদ শুষ্ক করা হয়, তথায় গমন করিয়া কি সুন্দর প্রণালীতে উহা শুষ্ক করা হয় তাহা দেখিবেন। তাহার পর সাধ্যমত দেবতা সকল দর্শন

করিবেন কিন্তু স্মরণ রাখিবেন এ ক্ষেত্রে যে কোন দ্রব্য খরিদ করিবেন পাণ্ডাদিগের কোন লোক সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ তাহারা অধিক হারে দস্তুরি লয় বলিয়া দোকনীরাও যাত্রীদিগের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যই ১০৫৲ টাকার ওজনে একসের পাইবেন অর্থাৎ কলিকাতায় ১।/০ ছটাক হইলে এই ক্ষেত্রের /১ সের ওজনের সমতুল্য হইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে। মালব দেশাধিপতি পরম বৈষ্ণব মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক এই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎপরে এক্ষণে আমরা যে ত্রিমূর্ত্তি শ্রীমন্দির মধ্যে দর্শন করিয়া পবিত্র জ্ঞান করি, সেই মূর্ত্তিগুলি কালাপাহাড় কর্ত্তৃক (রাজার প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি) সমুদ্রতীরে অদৃশ্য হইলে পর তখন পাণ্ডারা সেই আসল মূর্ত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া নিমকাষ্ঠ দ্বারা পুনর্ব্বার শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও সুভাদ্রাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পুরীর শূন্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করান, সেই মূর্ত্তিত্রয় এক্ষণে আমরা দর্শন করিয়া চরিতার্থ জ্ঞান বোধ করিয়া থাকি।

একদা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, নীলাচল পর্ব্বতের এক স্থানে স্বয়ং ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রাজা সেই স্বপ্ন অনুসারে পর্ব্বতের নানা স্থানে নানাপ্রকার লোক তাঁহার সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণ ও ছিলেন। একদা তিনি রাজার আজ্ঞানুসারে সেই লীলাচল পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে দেখিয়া নিরুপায় হইয়া ভীত মনে বসু নামক এক শবরের কুটীরে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন।

বিদ্যাপতি যে সময় উপস্থিত হন, সেই সময় বসুশবর অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার একমাত্র নবযৌবনসম্পন্না অবিবাহিতা কন্যা

সেই কুটীরে ছিলেন। ঐ যুবতী কন্যাই শবরের অতিথি সৎকার করিলেন, আগন্তুক বলিষ্ঠ যুবক এবং এই শবরদুহিতা যুবতী থাকায়, অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের পরস্পর পরস্পরের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। শবর যথাসময়ে আপন কুটীরে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কারণ এতাবৎকাল তিনি এই নিবিড় নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছেন, কখন জন মানবের সমাগম দেখেন নাই, অদ্য সৌভাগ্যক্রমে এইরূপ যৌবনসম্পন্ন বিপ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, কারণ পাত্রাভাবে এতদিন তাঁহার স্নেহময়ী কন্যাকে সম্প্রদান করিতে পারেন নাই আর ও অবগত হইলেন যে, ঐ আগন্তুক তখনও কোন পাত্রীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। এইপ্রকার মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তিনি উহাদের উভয়ের মনভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের সম্মতি ক্রমে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হেতু সেই রাত্রে বিবাহের শুভ সময় থাকায়, শুভ-লগ্নে বিদ্যাপতির করে তাঁহার প্রাণের পুত্তলি একমাত্র দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া সুখী হইলেন।

এইরূপে বিদ্যাপতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুদিন পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতি অভ্যাসমত প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন, কিন্তু কখনও তাহার শ্বশুর বসুশবরকে দেখিতে পাইতেন না। একদা তাহার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল যে, কোন বিষয় গোপন করিবার ছিল না। শবরদুহিতা স্বামীর সাদরসম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, প্রভু জগন্নাথদেব নীলমাধবরূপে নীলগিরি পর্ব্বতোপরি বিরাজ করিতেছেন, আমার পিতা প্রত্যহ গোপনে তথায় গমন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন সুতরাং আপনি আমার পিতার সাক্ষাৎ পান না। বিদ্যাপতি এরূপ বাক্য শুনিতে পাইবেন তাহা তিনি একবার স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারেন নাই; কারণ যাঁহার উদ্দেশে তিনি এত পরিশ্রম করিয়া

এই নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বনে বাস করিতে বাধ্য হইলেন, আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই পরমপুরুষ জগন্নাথদেবেরই সন্ধান পাইলেন। পত্নীর মুখে ঈদৃশ সংবাদ পাইয়া তিনি মনে মনে আনন্দে অধীর হইলেন।

একদা মধ্যাহ্নকালে শবর কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে পর, বিদ্যাপতি তাঁহার নিকট নীলাচলে লীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। শবর কিছুতেই এই নব-জামাতার অনুরোধে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাঁহার স্নেহময়ী কন্যার কাতর প্রার্থনায় বস্ত্রদ্বারা চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। বিদ্যাপতি এরূপ অবস্থায় গমন করিলে, তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে মনদুঃখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। শবরদুহিতা স্বামীর দুঃখের কারণ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিনয় বচনে বলিলেন, "নাথ! আপনি বৃথা চিন্তা করিয়া মনে দুঃখ পাইতেছেন, আমি ইহার এক উপায় স্থির করিয়াছি, যদ্যপি ইহা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে। এইরূপ বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার কাতরবচনে স্বামীকে অনুরোধ করিলেন, আপনি আমার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কল্য প্রত্যূষে গমনকালীন গুপ্তভাবে বস্ত্রাঞ্চলে কিছু সরিসা বাঁধিয়া লইবেন এবং পিতার অজ্ঞাতানুসারে ঐ সরিসাগুলি পথিমধ্যে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে গমন করিবেন, যখন ঐ বীজ হইতে গাছ সকল উৎপন্ন হইবে, তখন আপনি সহজেই রাস্তা চিনিয়া লইতে পারিবেন।

বিদ্যাপতি পত্নীর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার শ্বশুরের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া সেই দিবসেই পুনরায় শবরকে অনুরোধ করিলেন। তখন শবর-বসু পূর্ব্বকথিত অনুসারে জামাতার চক্ষে বস্ত্র বন্ধন করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, বলা বাহুল্য যে বিদ্যাপতিও স্ত্রীবুদ্ধির সাহায্যে গোপনে সরিসা ছড়াইতে ছড়াইতে গমন

করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে যথাসময়ে তাহারা উভয়েই দেবতাস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় শবর জামাতার চক্ষের বন্ধন মোচন করাইয়া জগন্নাথদেবের লীলমাধবমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন।

অনন্তর শবর বিদ্যাপতিকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়া প্রভুর পূজার নিমিত্ত ফল, ফুল সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন। বিদ্যাপতি সুযোগ বুঝিয়া সেই সময় এই অজানিত স্থানটী উত্তমরূপে চিহ্নিত করিয়া লইলেন। ইত্যাবসারে তিনি এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে পাইলেন। একটী ভূষণ্ডী-কাক, বৃক্ষশাখা হইতে নিকটস্থ এক কুণ্ডে পতিত হইয়া চতুর্ভূজ হইল। তদ্দর্শনে বিদ্যাপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদ্যপি আমি এই কুণ্ডে স্নান করি, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিব ; এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কুণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় ঐ চতুর্ভূজ কাক ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে ব্রাহ্মণ ! তুমি যে কুণ্ডে স্নান করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহার নাম রোহিণীকুণ্ড। রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিলে মোক্ষলাভ হয়। "যদ্যপি তুমি ইহাতে স্নান কর, তাহা হইলে "জগন্নাথদেব" কিরূপে নরলোকে প্রকাশিত হইবেন ? তুমি যে দৈত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছ, তাহা কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ ? কাকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদ্যাপতি হতবুদ্ধি হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শবরবসু লীলমাধবের পূজা সমাপনান্তে জামাতার নিকট আসিয়া তাহার চক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধন করিয়া আপন আলয়াভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে যখন সরিসা গাছগুলি উপযুক্ত পথস্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে দেখিতে পাইলেন, তখন বিদ্যাপতি বসুশবরের অজ্ঞাতসারে ঐ সকল গাছের সাহায্যে দেবতাস্থানে গমনাগমন করিয়া সেই অপরিচিত পথটি উত্তমরূপে চিনিয়া লইলেন, এবং শ্বশুর ও পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করিলেন। বসুশবর এবিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই।

জগবন্ধুর কৃপায় বিদ্যাপতি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ বিদ্যাপতির প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন: তখন তিনি অনুচরবর্গসহ নীলগিরি পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জগন্নাথদেবের মায়ায় তাঁহারা সেই স্থানে কোন দেবতাকেই দর্শন করিতে পাইলেন না। রাজা, বিদ্যাপতিকে মিথ্যাবাদী স্থির করিয়া তাহার প্রতি কোপদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বিদ্যাপতি লজ্জিত হইলেন এবং মহারাজের মনোগতভাব অবগত হইয়া করযোড়ে বিনয়বচনে বলিলেন, মহারাজ! বসুশবর নিশ্চই কোনরূপে আমাদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া প্রভু জগন্নাথজীউকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, তিনি যে অন্য পথে ভুলক্রমে আসেন নাই, উহাও ঐ সরিসার গাছগুলিকে প্রমাণস্বরূপ দেখাইলেন এবং যে রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া কাক চতুর্ভুজ হইয়াছিল তাহাও রাজাকে দেখাইলেন। এই সকল প্রমাণ পাইয়া রাজা বিদ্যাপতির বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ক্রোধান্বিত কলেবরে তাহার অনুচরবর্গকে শবরবসুকে বন্ধন করিয়া আনিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এতাবৎকাল শবর কিছুই এ বিষয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং সহসা এই মহাবিপদে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অবশেষ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাঁহার জামাতার চাতুরী অনুমান করিয়া তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্ব ত্রাণ-কর্ত্তা, করুণাময় জগন্নাথদেবের পদপ্রান্তে মনবেদনা নিবেদন করিলেন। ভক্তের মর্ম্মভেদী করুণ প্রার্থনায় তাঁহাকেও কাতর হইতে হইল, তখন প্রভু ভক্তের লাঞ্ছনা দূরিকরনার্থে এক আকাশবাণীতে বলিলেন, "রাজন! তুমি এক্ষণে আমার দর্শন পাইবে না, অগ্রে এই স্থানে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া চতুরানন ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাও তাহা হইলে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার অনুচরেরা বৃথা নির্দ্দোষী শবরবসুকে যন্ত্রণা দিতেছে তাহার কোন দোষ নাই।" অকস্মাৎ রাজা এরূপ দৈববণী শ্রবণ করিয়া শবরের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তখন

রাজা মন্দির নির্ম্মাণার্থে বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন এবং উহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে চতুরানন ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট অভিলাষিত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, চতুরানন সন্তুষ্টচিত্তে রাজার সহিত তাঁহার রাজধানীতে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজ্য, গলমাধব নামক অপর এক পরাক্রমশালী রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও গলমাধব, এই উভয় রাজার মধ্যে মহাবাকবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। মন্দিরের সত্ব সাব্যস্ত না হইলে ব্রহ্মা কিরূপে উহা প্রতিষ্ঠা করিবেন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বিষ্ণু মায়ায় ভুষণ্ডী কাক তথায় আসিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিল এবং মন্দির নির্ম্মাণ কালে যে সকল কারিকর ও কুর্ম্ম পৃষ্ঠে প্রস্তর বহন করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সহায়তা করিয়াছিল তাহারা, আরও স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের অনুকুলে সাক্ষ্যপ্রদান করিলে পর চতুরানন ব্রহ্মা মহারাজ গলমাধবকে সাক্ষ্য সকল হাজির করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা গলমাধব ব্রহ্মার আজ্ঞাপ্রাপ্তে কোনরূপ সাক্ষ্য বা প্রমাণ করিতে না পারাতে চতুরানন কুপিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিলেন।

এইরূপে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে রাত্রিকালে রাজা স্বপ্নে অবগত হইলেন যে, জগন্নাথদেব তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন "হে ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি কি পূর্ব্ব আকাশবাণী বিস্মৃত হইয়াছ যে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে আমার দর্শন পাইবে?" তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কল্য প্রত্যুষে সমুদ্র তীরে গমন করিলেই আমার দারুমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, ঐ দারু হইতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিবে।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নানুসারে পর দিবস প্রত্যুষে সমুদ্র তীরে আসিয়া

দেখিলেন যে, একখণ্ড কাষ্ঠ অনন্ত সলিল বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। তখন রাজা আহ্লাদিত হইয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ড খানি তীরে উঠাইবার নিমিত্ত বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে ঐ অনন্ত সমুদ্রে জীবন বিসর্জ্জন করিতে স্থিরীকৃত হইলেন। সেই সময় পুনরায় এক আকাশবাণী হইল। "রাজন! তুমি বৃথা দুঃখ করিয়া মনকষ্ট পাইতেছ, বসু শবর ব্যতীত অন্য কেহ আমায় তীরে উঠাইতে পারিবে না। মহারাজ ঐ দৈববাণী প্রাপ্ত হইয়া যত্নের সহিত বসুশবরকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, ভক্ত শবর রাজ আহ্বানে সত্বর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া মহারাজের আদেশ মত ঐ দারুরূপ কাষ্ঠখানি অবলীলাক্রমে উত্তোলন করিয়া মন্দির সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন মহারাজ ঐ কাষ্ঠ হইতে দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবার জন্য নানাস্থান হইতে সুদক্ষ সূত্রধরগণকে আনাইলেন কিন্তু ভগবানের মায়াপ্রভাবে কেহই ঐ কাষ্ঠের গাত্রে একটী দাগও বসাইতে পারিল না, তখন রাজা হতাশ মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং সেই জগৎ চিন্তামণির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। আহা! যাঁহার মায়াতে এই জগৎ মায়াময়, কোন্ মায়াতে আশ্রিত জনে বৃথা দুঃখ দাও প্রভু?

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কিরূপে এই দারুকাষ্ঠ হইতে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইবেন এই চিন্তাতেই মগ্ন, এমন সময় এক অতি বৃদ্ধ সূত্রধরের বেশে স্বয়ং জগন্নাথ দেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ দারু হইতে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার ভার প্রার্থনা করিল। মহারাজ সেই অতি বৃদ্ধকে অসমর্থ দেখিয়া তাহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইবে না বিবেচনা করিলেন এবং মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন তখন ঐ বৃদ্ধ রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি বৃথা চিন্তা করিবেন না, শুনিলাম আপনার নিযুক্ত কোন কারিকরই দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয় আরও শাণিত লৌহ যন্ত্রের দ্বারা যে কাষ্ঠ ভেদ হয় না

এরূপ কখন শ্রবণ করি নাই, এই নিমিত্ত আমার সেই বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। বৃদ্ধের সেই উত্তেজিত বাক্যে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দান করিলেন। বৃদ্ধ সবিনয়ে তখন বলিতে লাগিলেন হে মহারাজ! আমি যে কার্য্যের ভার লইলাম ইহাতে আমার ন্যূনকল্পে একুশ দিন সময় আবশ্যক হইবে এই নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই কার্য্য উদ্ধার করিব, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এই সময়ের মধ্যে কেহই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন না, যদ্যপি দৈবাৎ কেহ ইহা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে আমি আর যন্ত্র স্পর্শ করিব না। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নিরুপায় হইয়া তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। বৃদ্ধ সূত্রধর কাষ্ঠ লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজাও বহির্ভাগ হইতে মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইবার পর একদা রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, বৃদ্ধ কোনরূপ কার্য্য করিতেছে কিনা, উহা অবগতির জন্য মন্দির দ্বারে আপন কর্ণ সংলগ্ন করিয়া কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিবামাত্র হস্ত পদবিহীন জগন্নাথদেব রত্নবেদীর উপর বিরাজ করিতেছেন দর্শন করিলেন, মহারাজ সেই পবিত্র জগন্নাথদেব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিকেই ভক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া মন-বাসনা পূর্ণ করিলেন। দারুব্রহ্ম জগন্নাথ মূর্ত্তি মহারাজ ন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যখন কালাপাহাড় সমস্ত উড়িষ্যাদেশ পদদলিত করিয়া এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তখন পাণ্ডারা এই দেবমূর্ত্তি শ্রীমন্দির হইতে ভয়ে লইয়া গিয়া পারিকুদ নামক হ্রদ মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখেন, কারণ কালাপাহাড় প্রাণভয়ে বাদশাহের কন্যাকে বিবাহ করিলে পর তাহাকে একঘরিয়া করিয়া দেওয়া হয়, সেই সময় তিনি জাতি হইতে উদ্ধার মানসে এই শ্রীমন্দিরে ধন্না দিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডারা তাহার পরিচয় পাইয়া

শ্রীমন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কালাপাহাড় অনাহারে ছয় দিবস ধন্না দিয়াও যখন জগন্নাথদেবের কোনরূপ প্রত্যাদেশ হইল না দেখিলেন, তখন অগত্যা তিনি মুসলমান হইতে বাধ্য হন, কালাচাঁদের জগন্নাথদেবের প্রতি আক্রোশের ইহাই প্রধান কারণ ছিল। পাণ্ডারা কালাপাহাড়ের অত্যাচার দেখিয়া তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীমূর্ত্তিকে লুক্কায়িত করিয়া রাখেন কিন্তু কালা বহু চেষ্টা ও বহু পরিশ্রম করিয়া ঐ শ্রীমূর্ত্তি বাহির করিয়া সমুদ্রতীরে উহা ধ্বংস করেন। তখন পাণ্ডারা শ্রীমূর্ত্তির পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিম কাষ্ঠ দ্বারা পুনর্ব্বার জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পুরীর শূন্য মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্ব্বশেষে।

এই পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিরাত্রি বাস করিতে হয়, তাহার পর সাধ্যমত আটকে বন্ধন করিয়া আপন তীর্থগুরু পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্ব্বক নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে নিয়ম সকল পালন করিবেন।

সমাপ্ত।

পদ্ম-ক্ষেত্র

উড়িষ্যার অন্তঃর্গত পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্দ্রভাগা নদীতীরে এই তীর্থ বিরাজিত। যে পুণ্যসলিলা চন্দ্রভাগা নদীতে দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ষোড়শ শত বনিতাদিগের সহিত সতত প্রফুল্লচিত্তে জলক্রিড়া করিতেন, সেই পবিত্র স্থানের মাহিমা কত? শ্রীপঞ্চমী পূজার পর মাকরী সপ্তমী তিথিতে এইস্থানে প্রতি বৎসর একটী মহামেলা হইয়া থাকে। সেই এক দিনের মেলার নিমিত্ত তাম্বুর মধ্যে পুলিশ প্রহরীগণ, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। এই মেলার সময় নানা-জাতীয় অসংখ্য হিন্দু নরনারীগণের একত্র সম্মিলনে এইস্থান এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। যে সকল যাত্রী রেলযোগে যাত্রা করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুদেবকে দর্শন করিয়া পরে শ্রীপঞ্চমীর মধ্যাহ্নকালে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পুরী হইতে মেলা স্থানে গো-শকটে শুভযাত্রা করিয়া থাকেন। সেই সময় বহুদূরব্যাপী অসংখ্য নরনারীগণের এবং গো-শকটগুলির কোলাহল শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। এইরূপে তীর্থপথ সকল অতিক্রম করিয়া পরদিবস ষষ্ঠী তিথির সন্ধ্যাকালে পুণ্যস্থান চন্দ্রভাগা নদীতীরে পৌঁছিতে পারা যায়। যে সাগর তীরটী মেলা স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, উহা সাধারণ তীর ভূমি অপেক্ষা অধিক উচ্চ। এখানে দিবাভাগে গাড়ী বা মনুষ্য কোনরূপে চলিতে সক্ষম হয় না, কারণ প্রায় সমস্ত পথই বালুকাময়, সূর্য্য কিরণে বালুকাকণা এরূপ উত্তপ্ত হয় যে, কিছুতেই কোন জীব তাহার উপর চলিতে সক্ষম হয় না। এইহেতু রাত্রিকালে কেবল ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এই দুর্গম পথে যাইতে

হয়। মেলার দিন ভিন্ন অন্য সময় এখানে দস্যু তস্করাদির ভয়ে কেহ যাইতে সাহস করেন না।

চন্দ্রভাগা নদীতীরে যথায় পাচী নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে. সেই সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে এক অদ্ভুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর মন্দির দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন। এই দেব মন্দিরটী শ্রীকৃষ্ণাত্মজ মহাত্মা শাম্বদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোনার্ক নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই প্রাচীন ভানুদেবের শ্রীমন্দির যাহা এক্ষণে আমাদের নয়নগোচর হয়, উহা বেমেরামত অবস্থায় ভগ্নস্তূপে পর্ব্বতাকারে জঙ্গলাবৃত হইয়া অতীতের অতুলনীয় গৌরবের প্রশংসা করিবার জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দিরটী চারি প্রকোষ্ঠে শোভিত। সর্ব্বপ্রথমেই দেউল, দ্বিতীয়—জগমোহন, তৃতীয়—নাটমন্দির চতুর্থ—ভোগ মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্রে অদ্যাপি যে সকল প্রস্তর খোদিত মনুষ্য, পক্ষী, ফল, ফুল ও লতা অঙ্কিত আছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে শিল্পকারীর শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পুরাকালে আর্য্য নৃপতিগণ আধুনিক বিজ্ঞানবল ব্যতীত কিরূপে বিনা বাষ্পীয় কলের সাহায্যে দূরবর্ত্তী গিরিপ্রদেশ হইতে অতিভার শিলাখণ্ডগুলি সংগ্রহপূর্ব্বক কারুকার্য্যে শোভিত করাইয়া, সেতুহীন নদনদী সকল অতিক্রমপূর্ব্বক দেবমন্দির ও অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল সুশোভিত করাইতেন, উহা একবার চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এই দেবালয়ের প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই একটী প্রকাণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, আর ঐ স্থানেই একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরের খিলান দেদীপ্যমান। সেই খিলানের উপর প্রস্তরের একটী প্রশস্ত পাড় আছে—ঐ পাড়ের গাত্রে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক দেবের ও সূর্য্যদেবের একটী পবিত্র মূর্ত্তি এবং কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অদ্ভুত জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত দেখিতে পাইবেন।

শাম্বদেবের বংশধর মহাত্মা নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক এই মন্দির সংস্কারকালে,

তাঁহার দ্বাদশ বৎসরের বিশাল রাজত্বের সমস্ত আয়, এই মন্দিরে ব্যয় করিয়া যে কিরূপ মনের মত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন এবং ইহার শিখরদেশে চূড়ার উপর একখণ্ড বৃহৎ চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন করাইয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করেন, তদবধি ঐ প্রস্তরখণ্ডের আকর্ষণ শক্তিতে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল সমাকৃষ্ট হইয়া তীরে আসিবার সময় চড়ায় ঠেকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত; সুতরাং কোন নাবিক ভয়ে ঐ পথে যাইতে সাহস করিত না। একদা সম্রাট আকবর সাহের বিখ্যাত মন্ত্রী মহাত্মা আবুল ফাজিল ঐ পথ পর্য্যটন করিবার সময় এই পাথরের আকর্ষণ শক্তির জন্য অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হন। মন্ত্রীবরের চেষ্টায় বহু অনুসন্ধানের ফলে এই পাথরই অনিষ্টের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন ক্রোধভরে তাঁহার অধীনস্থ একজন মুসলমান নাবিক, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে বলপূর্ব্বক মন্দিরের শিখরদেশে উঠিয়া ঐ বৃহৎ চুম্বকখণ্ড বিচ্যুত করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য মন্ত্রীবরের এইরূপ অত্যাচারের জন্য মন্দিরের পাণ্ডাগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যবনস্পর্শে মন্দিরটী অপবিত্র হইয়াছে. ফলতঃ সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহারা নানাস্থানে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন কোনরূপ ফলোদয় হইল না দেখিলেন, তখন দুঃখিত মনে সকলে পরামর্শ করিয়া দেবালয়টী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কালক্রমে সেই সুন্দর মন্দিরের অবস্থা এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়ায় বিগ্রহমূর্ত্তি লুক্কায়িত হইয়াছে। অনেকে এই স্থানের নাম পর্য্যন্ত অবগত নহেন, কারণ সূর্য্য-দেবের এই অদ্ভুত ও সুন্দর মন্দির সহরের বহু দূরে ও দুর্গম জনশূন্য স্থানে অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে।

শুনিয়া সুখী হইবেন এতদিন পরে লর্ড কর্জ্জনের অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট এই প্রাচীন সুন্দর মন্দিরটী সংরক্ষণে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন এবং সাধারণকে ইহার সৌন্দর্য্যে মোহিত করাইবার নিমিত্ত এখানে রেল বিস্তার করিবার মনস্থ করিয়াছেন। যাত্রিগণ এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়া বিনা আপত্তিতে

ইচ্ছামত এই ভগ্ন স্তূপের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া পুরীর জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ক্ষীণছায়া দর্শন করেন, আর বঙ্গোপসাগরের প্রসারিত নীলাম্বুজ সলিলের ঢেউ সকল অনন্ত নীল আকাশের ক্রোড়ে খেলা করিতেছে দেখিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন।

সূর্য্যদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরোপরি নবগ্রহগণের নয়টী প্রতিমূর্ত্তি খোদিত দর্শন পাইবেন, তন্মধ্যে রাহু ও কেতুর ভয়ঙ্কর আকৃতি খোদিত দেখিলে ভয়বিহ্বল হইয়া মনে মনে ভাবিবেন যে, যাঁহাদের এরূপ আকৃতি—না জানি তাঁহাদের ব্যবহার কিরূপ, কারণ মনুষ্যমাত্রেই এই নবগ্রহের ফলভোগ করিয়া থাকেন। সেই নয়মূর্ত্তি খোদিত প্রস্তরখণ্ডখানি দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত আর প্রস্থে অন্যূন ৬ হস্ত পরিমাণ। অবগত হইলাম পূর্ব্বে এই প্রস্তরখানি ভানুদেবের শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের উপরিভাগে শোভা পাইত। একদা কতকগুলি পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ এই শিলার কারুকার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার যাদুঘরে আনিবার জন্য পরামর্শ করিয়া বহু অর্থব্যয় ও অতি কষ্টে বাষ্পীয় কলের সাহায্যে যখন মন্দির হইতে পাথরখানি বিচ্যুত করান, তখন নানা স্থানের হিন্দুগণ একত্র হইয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে, তাহারা সেই অবস্থায় ঐ স্থানে শিলাখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। তদবধি ঐ শিলাখণ্ডখানি ঐরূপ অবস্থাতেই রহিয়াছে।

চন্দ্রভাগা পুণ্যস্থান অবগত হইয়াও যেস্থানে কখন জনমানবের সমাগম হইত না, আজ মেলা উপলক্ষে শাম্বদেবের কৃপায় সেইস্থানে শত সহস্র লোক একত্র হইয়া শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কত আনন্দ অনুভব করেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পরদিবস মাকরী সপ্তমীর প্রত্যূষে ভানুদেবের উদয়ের প্রথম উদ্যমে সূর্যদেবের পূর্ণ কলেবর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। আহা! সেই মনোহর দৃশ্য দর্শনে প্রাণে যেরূপ আনন্দলাভ হয় তাহা কবি-কল্পনাতীত। প্রভাতে সাগরতীরের স্নিগ্ধ

নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দ ও সুখে প্রাণ মাতোয়ারা হইতে থাকিবে, ক্রমে গগন প্রাঙ্গণ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভানুদেবের আগমন ঘোষণা করিতে থাকিবে, তৎপরে সেই স্বর্ণ বর্ণের গোলাকার মূর্ত্তিখানির প্রথমে নীলসলিলোপরি সামান্য দর্শন পাইবেন, তাহার পর তপনদেব যেন লম্ফঝম্ফ সহকারে নৃত্য করিতে করিতে একেবারে বিমানপথে নীলাম্বু পরিত্যাগ করিয়া নরলোকের মনস্কাম সিদ্ধ করিবার মানসে উর্দ্ধে উঠিবেন, সেই বাল সূর্য্যদেবের কিরণ-চ্ছটায় পূর্ব্বদিকের লালবর্ণ নভোমণ্ডল ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতে প্রখরতর হইতে থাকিবে; তখন সাগর সলিলের উপর ঐ স্বর্ণ গোলকের প্রতিবিম্ব তরঙ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শ্রীধারণ করিবে। বিশ্বস্রষ্টার এই প্রীতিপ্রদ স্বর্গীয় ভাব নিরীক্ষণ করিলে যেন লীলাময়ের অনন্ত লীলা বিঘোষিত হইতে থাকিবে। আহা! সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যিনি একবার দর্শন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি আর কখন ভুলিতে পারিবেন না। ভানুদেবের উদয় দর্শন করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গম স্থানে স্নান, তর্পণ, সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্যপ্রদান এবং সাধ্যানুসারে ভিক্ষাদান আরও এই পবিত্র ক্ষেত্র প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মেলা সমাপ্ত করিয়া যাত্রিগণ আপন আপন আলয়াভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকেন। এই তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে "ভক্তি ও মুক্তি" উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে সূর্য্যদেবের প্রীতার্থে একটী অর্ঘ্য প্রদান করিলে ভানুদেবের কৃপায় সকল অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে। শাম্বপুরাণে ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে।

শ্রীশ্রীশাম্বদেব-বৃত্তান্ত

শ্রীকৃষ্ণপত্নী জাম্ববতীদেবীর গর্ভে শাম্ব নামে এক কন্দর্প সদৃশ্য রূপবান পুত্র জন্মে। শাম্ব সদা সর্ব্বদা আপন রূপের গর্ব্ব করিতেন অর্থাৎ ত্রিভুবনে তাঁহার ন্যায় রূপবান আর দ্বিতীয় নাই এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সদাসর্ব্বদা অহঙ্কার করিতেন। একদা নারদ ঋষি হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া যখন হরিগুণ-গান করিতে করিতে শাম্বের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি ঋষির সেই জটাজুটধারী বিকট আকৃতি দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। যে হরি সকলের দর্প হরণ করেন বলিয়া দর্পহারী নাম ধারণ করিয়াছেন, তখন হরিভক্ত নারদ ঋষির অপমান সহ্য করিয়া তিনি শাম্বের দর্প কিরূপে রাখিবেন? নারদ শাম্বের নিকট অপমানিত হইয়া মনদুঃখে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রভো! আপনার পত্নীদিগের সহিত শাম্বের যেরূপ ব্যবহার দর্শন করিলাম, তাহাতে সহজেই মনে কু-ভাব উদয় হয়, যদি বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমি সময়ানুযায়ী প্রমাণ করাইব"। অন্তর্য্যামী ভগবান নারদের মনোভাব অবগত হইয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

কিয়ৎকাল পর একদা শ্রীকৃষ্ণ যখন রৈবতক পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ নদীতে পত্নীগণের সহিত উন্মত্তভাবে জলবিহার করিতেছিলেন. নারদ ঋষি সুযোগ পাইয়া শাম্বের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তোমার পিতা রৈবতক পর্ব্বতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, সেখানে তোমায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন;" সরল হৃদয়বান্ শাম্বদেব নারদের চাতুরী অবগত না হইয়া পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া লজ্জিত হইলেন, কারণ তাঁহার বিমাতাগণ মদিরাপানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জলক্রীড়া করিবার

সময় শাম্বদেবকে সম্মুখে পাইয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমবশতঃ তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতে লাগিলেন, ঠিক্ সেই সময় নারদ ঋষি শ্রীকৃষ্ণকে আনাইয়া পূর্ব্ব অঙ্গিকার সপ্রমাণ করাইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাম্বদেবের রূপই, অনিষ্টের মূল স্থির করিলেন, কারণ রূপের নিমিত্ত তাহার ভক্ত নারদকে অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং বিমাতাগণও আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিল, তখন তিনি রোষবশতঃ তাহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়া কুষ্ঠ ব্যাধিতে পরিণত হউক। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে তৎক্ষণাৎ শাম্ব নিকৃষ্ট কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। শাম্বদেব বিনাদোষে অকস্মাৎ পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া করুণ আর্ত্তনাদে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া করুণা এবং মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পুত্রের করুণ প্রার্থনায় কাতর হইয়া নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া মৈত্রবনে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া ভক্ত নারদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

শাম্ব তদনুসারে মৈত্রবনে চন্দ্রভাগা নদীতীরে উপনীত হইয়া সূর্য্যদেবের কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার তপপ্রভাবে সূর্য্যদেব তুষ্ট হইয়া শাম্বকে নিকৃষ্ট ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার মানসে সম্মুখীন হইয়া আজ্ঞা করিলেন, "বৎস শাম্ব! তোমার তপস্যার কি মহোন্নতি। আর তপস্যার প্রয়োজন নাই, আমার আদেশমত তুমি চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলেই পূর্ব্বকান্তি প্রাপ্ত হইবে", এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তপনদেবের আদেশমত শাম্ব স্নান করিবার সময় এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং স্নানান্তে দেখিলেন যে, তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাবণ্যবিশিষ্ট হইয়াছে, তখন সন্তুষ্টচিত্তে পুনঃরায় তপনদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। অর্ঘ্যপ্রাপ্তে ভানুদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। শাম্ব সেই তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া প্রীতিমনে তাঁহাকে

প্রদক্ষিণপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে, অতঃপর যে কেহ মাঘ মাসে মাকরী সপ্তমী তিথিতে এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া, এই পুণ্যস্থান প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আপনার উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, আমার ইচ্ছানুসারে তাহার সেই অর্ঘ্য আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহাকে নিরোগী করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করেন ইহাই আমার অভিলাষ। শাম্বের সকল বাসনা পুরণ করিয়া তাহাকে আদেশ করিলেন যে, স্নানকালে তুমি যে বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, ঐ বিগ্রহদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিবে। বিশ্বকর্ম্মা সংজ্ঞাদেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে আমার তেজ-প্রশমন করিলে সেই তেজাংশ এই নদীতে লীন হয়, এতাবৎকাল আমি গুপ্তভাবে এখানে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার প্রতি সদয় হইয়া আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকটে আসিয়াছি, অতএব এইস্থানে তুমি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই বিগ্রহ মূর্ত্তিটীকে কোনার্ক নামে প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার নামানুসারে এই স্থানের নাম "কোনার্ক" নামে প্রচার কর, এই সকল উপদেশ দানে তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

শাম্বদেব সূর্য্যদেবের শ্রীমুখে এই সমস্ত অবগত হইয়া সেই স্থানে একটী দিব্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া কোনার্ক নামে বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ঐ দেবের নামানুসারে এই স্থানের নাম কোনার্ক রাখিয়া দেব আজ্ঞা পালন করিলেন। অদ্যাবধি এই মন্দির তথায় শোভা পাইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! আজ সেই প্রাচীন শাম্বদেব প্রতিষ্ঠিত সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির ধ্বংশপ্রায়, বিগ্রহও অদৃশ্য। ইহা অপেক্ষা হিন্দুদিগের অধঃপতন আর কি হইতে পারে? বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যদেবের তেজ কি নিমিত্ত হ্রাস করিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য উহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

একদা বিশ্বকর্ম্মা দুহিতা সংজ্ঞাদেবী পুষ্প চয়ন করিবার সময় সূর্য্যদেবের নেত্রপথে পতিত হন। সেই নবযৌবন-সম্পন্না সুন্দরীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মার সম্মতিক্রমে সূর্য্যদেব তাঁহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে

কিছুদিন পরে সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে মনু ও যম নামে দুই পুত্র এবং যমুনা নামে এক কন্যা উৎপন্ন হয়। কালক্রমে সংজ্ঞাদেবী সূর্য্যদেবের অসাধারণ জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় অনুরূপ রূপবিশিষ্টা এক সহচরীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে স্বামীসেবায় নিযুক্তপূর্ব্বক আপনি তপস্যার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। সময়মত ছায়ার গর্ভে শনি. শাবনি আর তপতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মে। এতদিন পর্য্যন্ত সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্য কেহই অবগত ছিলেন না, এমন কি স্বয়ং সূর্য্যদেব পর্য্যন্তও পরাস্ত হইয়াছিলেন। কোন কারণবশতঃ এক সময়ে সহচরী ছায়া, সংজ্ঞাদেবীর পুত্র যমের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক অদ্ভুত রূঢ় অভিসম্পাত প্রদান করেন। সূর্য্যদেব ছায়ার অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ রমণী কথনই যম-জননী হইতে পারে না, কারণ আপনার গর্ভজাত পুত্রকে কথন কোন রমণী এইরূপ অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে না। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যদেব যোগবল অবলম্বনে সকল রহস্য অবগত হইলেন যে, সংজ্ঞা-দেবী অশ্বিনীরূপে অরণ্যে তাঁহারই তপস্যা করিতেছেন, আর সংজ্ঞার উপদেশমত ছায়া আমার সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে।

তখন সূর্য্যদেব দুঃখিত মনে অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিনীরূপধারিণী সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হইয়া দুজনে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অশ্ব ও অশ্বিনী এইরূপে তাঁহাদের অবস্থিতিকালে পুনঃরায় সংজ্ঞাদেবীর গর্ভে আবার তিনটী পুত্র জন্মে। প্রথম অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অপরটীর নাম রেবন্ত। তাঁহারা এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করিলে একদা সূর্য্যদেব ছায়ার আচরণ এবং যমের প্রতি অভিসম্পাতের বিষয় সংজ্ঞাকে জ্ঞাপন করিলেন তখন স্নেহ বশতঃ তিনি আপন পুত্র যমকে দেখিবার জন্য কাতর হইয়া স্বামীকে স্বীয় পুরে যাইবার জন্য অনুরোধ

করিলে সূর্য্যদেব যত্নের সহিত তাঁহাকে আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন, তখন ছায়া ও সংজ্ঞার রহস্য প্রকাশ পাইল। বিশ্বকর্ম্মা এই সমস্ত অবগত হইয়া, দুহিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া জামাতাকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহারই আদেশে ভ্রমিয়াযন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন। যে সময় এই ঘটনা হয়, সেই সময় তপনদেবের তেজাংশ হইতে এই ক্ষেত্রে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, ঐ পদ্মের নাম অনুসারে এই ক্ষেত্রের নাম পদ্মক্ষেত্র হইয়াছে।

উপসংহার।

দ্বারকাপুরী।

গুজরাট প্রদেশে কচ্ছোপসাগরোপকণ্ঠে দ্বারকা অবস্থিত। কলিকাতা হইতে দ্বারকা যাইতে হইলে, প্রথমে হাবড়া ষ্টেশন হইতে বম্বে, তৎপরে ষ্টীমার যোগে সমুদ্রের উপর ভাসিতে ভাসিতে অনায়াসে তীর্থতীরে পৌছিতে পারা যায়, কিন্তু যাঁহারা প্রথমেই কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম তীর্থসকল দর্শন করিতে করিতে হরিদ্বারে যাইবেন অথবা যাঁহারা দাক্ষিণাত্যে ভগবান শ্রীরামেশ্বরজীউর দর্শনে যাত্রা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই দুইস্থান হইতেই বম্বে যাইলে সকলদিকে সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে।

বম্বে, সাগরের উপর অবস্থিত এই নিমিত্ত এই স্থানটী অতিশয় স্বাস্থ্যকর। ষ্টেশনের অনতিদূরে সহরটী বিরাজ করিতেছে, ইহার চতুর্দ্দিকই সাগরে বেষ্টিত আছে। বম্বে, কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধশালী ও রাজধানী, সুতরাং বম্বেতে উপস্থিত হইয়া সহরের শোভা দেখা কর্ত্তব্য। বম্বে কলিকাতা অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট হইলেও ইহার রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং বহু লোকের বসতি আছে। কলের জল, গ্যাস, ট্রামগাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ভিক্টোরিয়া গাড়ী (বগী বিশেষ) আরও সুন্দর সুন্দর ত্রিতল চৌতল অট্টালিকাগুলি নির্ম্মিত থাকায় সহরের এক অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে, প্রত্যেক বড় রাস্তার উপর ট্রাম চলিতেছে, রাস্তার দুই ধারেই নানাপ্রকার নানা ধরণের দোকানগুলি সজ্জিত থাকাতে ইহার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। সহরের মধ্যে কোথাও কোনরূপ আহারীয় সামগ্রীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন বিদেশী লোক সহসা

এখানে উপস্থিত হইয়া বাসাভাড়া করিতে পারিবেন না, কারণ ভাড়াটিয়া বাড়ী এখানে নাই, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া ধর্ম্মশালায় বাস করিতে হয়। সহরের মধ্যে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা বর্ত্তমান থাকায় কাহাকেও কষ্টভোগ করিতে হয় না। এখানে যতগুলি ধর্ম্মশালা আছে তন্মধ্যে পুণ্যাত্মা ভাটিয়ারার ধর্ম্মশালাই শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম্মশালায় বাস করিবার সময় ইহাদের সুব্যবস্থার গুণে কাহাকেও কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না। এখানে অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থকে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা স্বাধীনভাবে একা যাইবেন তাঁহারা হোটেলে থাকিতে পারেন। হোটেলে সকল বিষয়ে সুখে থাকিতে পারা যায়। হিন্দু এবং কাশ্মিরী এই দুইটী হোটেলই বিখ্যাত।

বম্বে সহরে উপস্থিত হইয়া নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বম্বে সহরের প্রধান রাস্তার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

১। লাটভবন, ২। বম্বে ফোর্ট, ৩। অ্যাপলো বন্দর, ৪। হাইকোর্ট, ৫। বম্বাদেবীর দেবালয়, ৬। মহালচ্মীজীর মন্দির, ৭। বাথালনাদ। এই সকল দর্শন করিয়া সহর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এলিফ্যাণ্ট কেভের ত্রিপ্রকোষ্ঠ মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিবেন। এই কেভে যাইতে হইলে সহর হইতে প্রায় পাঁচক্রোশ বোটের সাহায্যে যাইতে হয়। এখানে পাহাড়ের মধ্যে নানাপ্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি ও সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ঠ স্তম্ভগুলির দৃশ্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন। দুঃখের বিষয় নিষ্ঠুর কালাপাহাড় এত দূরদেশে এই স্থানেও আসিয়া দেবতাদিগের অঙ্গহীন করিতে ক্রটি করেন নাই, সে যাহা হউক এইস্থানে উপস্থিত হইয়া ইহার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অবলোকন করিলে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে থাকিবে এবং লীলাময়ের অপূর্ব্ব সৃষ্টির শোভা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইতে থাকিবেন। বম্বে সহরে যে

বম্বে সহরের প্রধান রাস্তার দৃশ্য।

[২৬৪ পৃষ্ঠ

সমস্ত সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে উহা একে একে বর্ণনা করিলে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়।

যাঁহারা এখান হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পঞ্চবটীর কুটীর দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বম্বে হইতে নাসিকা নামক ষ্টেশনে যাত্রা করিবেন। এই পঞ্চবটী বন—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে কুম্ভ মেলা হয়। এই স্থানে লক্ষ্মণদেব শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন। নাসিকা রোড নামক ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল পথ ট্রামে যাইলে নাসিক সহরে যাওয়া যায়, এই সহর হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে পঞ্চবটীস্থ শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালা বিরাজিত। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। বম্বে সহরে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, গুজরাটি, মারহাট্টা, ভাটিয়া সকল শ্রেণীর লোক একত্রে বসবাস করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছেন। স্থানীয় লোকদিগের স্ত্রী-স্বাধীনতাভাব অবলোকন করিলে আমাদের এ দেশ-বাসীরা স্তম্ভিত হইবেন। প্রত্যহ অপরাহ্নকালে যখন সকল সম্প্রদায়ের স্ত্রী পুরুষগণ একত্রে আনন্দে বিভোর হইয়া সাগরতীরে শীতল স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিতে গমন করেন, তখন সেই ললনাদিগের স্বাধীনতাভাব এবং সুখানুভব অবলোকন করিলে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই। দু এক দিনের জন্য এই সহরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত যতদূর পারেন লোক-দিগের আচার ব্যবহার শিক্ষালাভ এবং সৃষ্টিকর্ত্তার ও ইংরাজ বাহাদুর-দিগের অদ্ভুত কীর্ত্তির দৃশ্য নয়নগোচর করিতে অবহেলা করিবেন না। এইরূপে বম্বে সহরের শোভা দর্শনপূর্ব্বক যাদবশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপতির পবিত্র বাসভবন দর্শনের জন্য দ্বারকাপুরে যাত্রা করিবেন।

বোম্বে ডক্ হইতে প্রাতে ২৲ টাকার টিকিট খরিদ করিয়া মিঃ, সেফার্ড কোম্পানীর ষ্টীমারে উঠিবেন, আর সন্ধ্যাকালে নির্ব্বিঘ্নে দ্বারকায় পৌঁছিবেন। ইংরাজ রাজার কৃপায় এক্ষণে সকল তীর্থেই অনায়াসে গমনাগমন করিতে

পারা যায়। পূর্ব্বে যে স্থানে দস্যু তস্করাদির ভয়ে কেহ গমনাগমন করিতে সাহস করিত না এক্ষণে ইংরাজ রাজার সুশাসনগুণে সেই স্থানে সকলে নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছেন।

দ্বারকা—দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্জ্জয় কংসকে বিনাশপূর্ব্বক মথুরার সেই শূন্য সিংহাসনে বৃদ্ধ উগ্রসেনকে অভিষেক করেন, তদ্দর্শনে কংসমহিষী অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখিত মনে পিত জরাসন্ধের শরণাপন্ন হন। মহাবল মগধাধিপতি কন্যাদ্বয়ের নিকট এই অশুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাদবদিগকে সমূলে উন্মুলন করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় নৃপতিগণের বল সংগ্রহ পূর্ব্বক মহাদর্পে মথুরা অবরোধ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণ যাদবদিগের প্রতিকুলে শ্রীকৃষ্ণকে সন্মুখবর্ত্তী করিয়া জরাসন্ধের অনুগামী হইলেন এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের একত্র সন্মিলনে কালসম মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে কত রাজগণ কত সৈন্যগণ প্রাণ দিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যাদবদিগের নিকট জরাসন্ধকে সদলবলে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়মান করিতে হইল, কারণ যাদবপতি যে পক্ষে সহায় তাঁহাদের কি কখন পরাজয় সম্ভব? নিলর্জ্জ জরাসন্ধ বারম্বার পরাজিত হইয়াও যাদবদিগকে সুবিধা পাইলেই উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, রাজগণ ও যাদবকুল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগৃহে গমনপূর্ব্বক গরুড়কে এমন একটী নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন যথায় যাদবগণ সচ্ছন্দে নির্ব্বিঘ্নে বসবাস করিতে পারেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে গরুড় পৃথিবীর নানাস্থান অনুসন্ধান করিয়া দ্বারাবতীপুরে এই স্থানই মনোনীত করিয়া নারায়ণ সমীপে যথাযথ নিবেদন করিলেন—তখন যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে তথায় এরূপ একটী পুরী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন যাহাতে যাদবগণসহ তিনি সচ্ছন্দে ঐ পুরী মধ্যে বসবাস করিতে পারেন।

গরুড় প্রমুখ্যাত বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত অবগত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুযায়ী সবিশেষ যত্নের সহিত তথায় সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নদ, নদী, তড়াগ, দীঘি ও অসংখ্য কূপসকল এরূপভাবে নিম্মাণ করিলেন, যাহাতে যাদবগণের কোনরূপ অসুবিধা না হয়, আর ঐ সকল জলাশয়ে কমল পরিমল রক্তকমলে সুশোভিত তাহার উভয় কূলে সুমেরু ও হিমালয়জাত শ্বেত, পীত, নীল লোহিত বর্ণ সর্ব্ব ঋতুজাত রত্নপুষ্প ও রত্নফলবিশিষ্ট তাল, তমাল অশ্বত্থ ও বট প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ সংযোজিত করিলেন, অত্র বৃক্ষশাখায় ময়ূর, ময়ূরী, কোকিল ও নানাজাতিয় বিহঙ্গম সকল শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের প্রতিক্ষায় প্রেমে পুলকিত হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতে লাগিল। দ্বারবতীতে যে সকল নদ ও নদী প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের বালুকা অথবা সলিল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল, বিশেষতঃ উহাদের জল কখন তীরভূমি হইতে নিম্নগামী হয় না এবং ঐ সকল জলাশায় জলদকুসুম ও জলদলতাগুল্মে সুশোভিত, যাবতীয় পদার্থই যেন বিশ্বকর্ম্মার সবিশেষ যত্নের পরিচয় প্রদান করিতেছে। দ্বাপরযুগে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের মানসে এই পুরীর সৃষ্টি হয় এই নিমিত্ত ইহার নাম দ্বারকাপুরী হইয়াছে। দ্বারকায় দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের ঐ মনমুগ্ধকর নিরাপদ আবাসভূমি বহু পুণ্যফলে দর্শনলাভ হয়।

বর্ত্তমান দ্বারকা যাহা এক্ষণে আমাদের নয়নগোচর হয় উহা মহাভারত কথিত সেই দ্বারকাপুরী নহে। শ্রীকৃষ্ণের সেই সাধের দ্বারকাপুরীর অধিকাংশই সমুদ্রগর্ভে নিহিত। এক্ষণে অবশিষ্ট যাহা কিছু দর্শন পাই সেই মুরলীধারী বনমালীর সাধের পুরীর স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

দ্বারকা, বরোদারাজ গাইকোবাড়ের অধিকারভুক্ত। সহরটী ক্ষুদ্র এবং কঠিয়াবাড়ের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। দ্বারকা বড়োদা রাজ্যের ও ওখমণ্ডল প্রদেশস্থ বাথের নামক জেলার একটী

প্রধান নগর। এখানে বম্বে নগরের দেশীয় পদাতিক সৈন্য ও শ্বমণ্ডল ব্যাটালিয়ান নামে একদল গোরা সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে।

দ্বারকায় যতগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে দু একটী ব্যতীত সকলগুলিই অপ্রশস্ত। কচ্ছোপসাগরের সুনীল সৌন্দর্য্যই দ্বারকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। এ দৃশ্য বিশ্বপতির বিচিত্র সৃষ্টি কৌশলের মহান্ ও বিরাট ভাব দর্শন করিয়া মানুষের আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না।

দ্বারকার শ্রীমন্দির।

দ্বারকায় দ্বারকাপতির মন্দিরই তীর্থযাত্রিদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য। এই দ্বারকার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য ঐ সুন্দর মন্দির পথের একখানি দৃশ্য প্রদত্ত হইল। দ্বারকায় দ্বারকা-নাথের দর্শন এবং পুণ্যবতী গোমতী নদী যথায় সাগরের সহিত সঙ্গম হইয়াছেন, সেই সঙ্গমস্থানে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে স্নানমাহাত্ম্যগুণে জীবের আর পুনঃজন্ম হয় না। এই গোমতী এখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

দ্বারকাপতির মূল মন্দিরটী পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফিটের ন্যূন নয় প্রবাদ এইরূপ যে, এই সুবৃহৎ মন্দিরটী শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগে একটী প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। এই সুন্দর নাটমন্দিরটী ৬০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত হইয়া নির্ম্মাণকারীর গৌরব প্রকাশ করিতেছে। ইহার ত্রিকোণাকৃতি চূড়াটী কম বেশ ১৭০ ফিট উচ্চ।

প্রধান নগর। এখানে বরদা নরেশের দেশীয় পদাতিক সৈন্য ও অশ্বা-রোহীদিগের মধ্যে একদল গোরা সৈন্য অবস্থান করিয়া থাকে।

দ্বারকায় যতগুলি রাস্তা আছে তন্মধ্যে দু একটী রাস্তাই মনোজ্ঞ ও সুন্দর। কচ্ছোপসাগরের সুনীল সৌন্দর্য্যই দ্বারকার সর্বাপেক্ষা দর্শ-নীয়। এ দৃশ্য বিশ্বপতির বিচিত্র সৃষ্টি কৌশলের মহান ও বিরাট ভাব দর্শন করিয়া মানুষের আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না।

দ্বারকার শ্রীমন্দির।

দ্বারকায় রণছোড়জির মন্দিরই তীর্থযাত্রিদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য। এই দ্বারকার পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। সাগরবক্ষের শ্রীমন্দির জন্য ঐ সুন্দর মন্দির দর্শনের একখানি দৃশ্য প্রকৃত দ্রষ্টব্য। দ্বারকার রণছোড়-জীর মন্দিরের দক্ষিণ এবং পুণ্যবতী গোমতী নদী যথায় সাগরের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন সেই সঙ্গমস্থানে শ্রদ্ধাপূর্বক স্নান করিলে জন্মান্তরেও জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। এই গোমতী এখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

রণছোড়জির মূল মন্দিরটী পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফিটের ন্যূন নয়। প্রবাদ, এইরূপ যে, এই সুবৃহৎ মন্দিরটী শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা এক রাত্রিতে নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগে একটী প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। এই সুন্দর নাটমন্দিরটী ৬০টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত হইয়া নির্ম্মাণকারীর গৌরব প্রকাশ করিতেছে। ইহার ত্রিকোণাকৃতি চূড়াটী কম বেশ ১০০ ফিট উচ্চ।

দ্বারকার মন্দির পথের দৃশ্য। [২৬৮ পৃষ্ঠা

যাত্রিগণ প্রদত্ত দক্ষিণাদি হইতে এই দেবের বার্ষিক আয় প্রায় চারি সহস্র টাকা উৰ্দ্ধিত হয়। এতদ্ভিন্ন যাত্রী সমাগম অধিক হইলে আয়ও অধিক হয়। এখানে যাত্রিদিগকে স্থানীয় নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। প্রথমে দেব দর্শনের পূর্ব্বে গোমতী নদীতে অবগাহন ও তর্পণাদি করিতে হয়। এই সময় বড়দার রাজার প্রধান কর্ম্মচারীর গদীতে দুই টাকা, রাজকর জমা দিয়া ম্যাজেণ্টারের ছাপ লইতে হয়, এই ছাপ না দেখিলে প্রহরীরা কথনই নদীতে অবগাহন করিতে দেয় না। তৎপরে শুদ্ধ কলেবরে মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে ৪৷৷৹ ও পূজার মূল্যের ৩।৹ আনা মোট দর্শনী সমেত ৭৸৹ আনা দিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। মন্দির অভ্যন্তরে ভগবান রণছোড়জীর পবিত্র মূৰ্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এখানকার পাণ্ডারা দেবালয়টী রাজার অধীন হইবার সময় মূল বিগ্রহমূৰ্ত্তিটী গুপ্তভাবে লইয়া গিয়া গুজরাটের অন্তর্গত ঢাকুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন, তদবধি মূল বিগ্রহ মূৰ্ত্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে দ্বারকার ঐ শূন্য সিংহাসনে রণছোড়জীর পবিত্র মূৰ্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ইহাও অপহৃত হইয়া বটদ্বীপে খাড়ীর অপর তীরে পূজারীগণ স্থাপিত করিলেন। ভগবান দ্বারকাপতি তথায় শঙ্খেশ্বরস্বামী নামে বিরাজ করিতেছেন।

এক্ষণে যে মূৰ্ত্তি আমরা দর্শন পাইয়া থাকি ইনি তৎপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজার সুপাহারার ব্যবস্থায় নির্ব্বিঘ্নে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে দর্শন দানে চরিতার্থ করিতেছেন।

যাত্রিগণ প্রথমে দ্বারকায় আসিয়া এই দ্বারকাপতির দর্শনলাভ করিয়া জীবন সার্থক করেন। তৎপরে পাণ্ডাদের কুহকে পতিত হইয়া বটদ্বীপস্থ প্রাচীন দ্বারকানাথ "শঙ্খেশ্বর স্বামীর" দর্শন করিবার জন্য, বটদ্বীপে গমন করেন। তথায় ভগবানের প্রাচীন মূৰ্ত্তি দর্শনের জন্য প্রত্যেক যাত্রীর

নিকট পূজারীরা পাঁচ টাকা দেবকর বা দর্শনী আদায় করিয়া তবে দেব দর্শন দান করান।

ভক্তগণ দ্বারকায় আসিয়া অবস্থানুসারে মনের সাধে এখানকার দেবতা "রণছোড়নাথজীউকে" বহুমূল্য পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করেন। এই পোষাক খরিদ কেবল পূজারীদের কিছু লাভের জন্য কারণ ভক্তগণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই পোষাক খরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাণ্ডারা একবারমাত্র শ্রীঅঙ্গে শোভা বৃদ্ধি করিয়াই তৎক্ষণাৎ বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকেন। এইরূপে একই পোষাক বৃন্দাবনের যমুনাতীরের কদম্বতলে বস্ত্র হরণের ঘাটের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে।

দ্বারকাপুরীর অন্য নাম কুশস্থলী। পূর্ব্বকালে ইহা পরম বৈষ্ণব আনর্ত্ত রাজের রাজধানী ছিল। তৎপরে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই রাজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নানাপ্রকার নদ নদী সকল বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য শতসহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।

দ্বারকামাহাত্ম্য—যে দ্বারকায় তেত্রিশ কোটী দেবতাগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব-গণ, সতত হৃষ্টচিত্তে গমনাগমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গান করিতেন, যথায় লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবী ও কত শত মহিষী একত্রে সুখে বাস করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেন, যে দ্বারকার প্রতি রজবিন্দুগুলিও পবিত্র, যে দ্বারকায় নারায়ণ-পুষ্করিণী নামে পুণ্যতোয়া সরোবর বিরাজিত, যে সরোবর চারি ধামের মধ্যে সর্ব্বত্রই পূজনীয়। যথায় যাত্রিগণ ভক্তি-সহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকেন এবং তীর্থ নিয়ম অনুসারে পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার কামনা করিয়া পিতৃতর্পণ সম্পাদনপূর্ব্বক চরিতার্থ বোধ করেন। যে স্থানে গ্রহণাদি পর্ব্বদিনে বহুদূর হইতে ভক্তগণ আসিয়া মুক্তি কামনা করিয়া স্নান করিয়া থাকেন। যে দ্বারকার তুলনা করিতে দেব, ঋষিগণও হার মানেন, যে দ্বারকা দর্শনে নর ও নারায়ণ হয় এমন কি এই পবিত্র স্থানমাহাত্ম্যগুণে গর্দ্দভও চতুর্ভুজ হইয়া থাকে। সেই দ্বারকার

মাহাত্ম্য আমার ন্যায় সল্পবুদ্ধি নরে কিরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া পুণ্যস্থান দ্বারকার বিষয় উচ্চারণ করিতে করিতে, দ্বারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত অট্টালিকার শোভা দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই।

যিনি শুদ্ধচিত্তে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া তীর্থপদ্ধতি ক্রমে সকল কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক তৃণমাত্র দান করিতে পারেন. শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অন্তে তিনি পিতৃপুরুষগণের সহিত বৈকুণ্ঠে স্থানপ্রাপ্ত হন্।

যিনি বহু দূরদেশ হইতে এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ করিতে পারেন, শ্রীহরির কৃপায় আর কখন তাঁহাকে গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কালক্রমে সেই বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত দ্বাপরযুগের ঐ অদ্ভুত রত্নখোদিত বহুদূরব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের পুরী তাহার, অধিকাংশই এক্ষণে সাগর-গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।

দ্বারকার নিম্নভাগে দেবগণের দুর্ল্লভ এক পুণ্যবতী নদী আছে। ভক্তগণ উহাকে পাপনাশিনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এখানে স্নান করিবার সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া গোমতী নদীর সহিত সাগর, যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, লোহার শিকল ধরিয়া সেইস্থানে স্নান করিতে হয়। কথিত আছে ঐ সঙ্গম স্থানে ভক্তিসহকারে অবগাহন করিলে জন্ম জন্মান্তরের কলুষ নাশ হইয়া অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান দ্বারকায় পাঁচটী প্রধান মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে জগৎমুট নামক মন্দিরই নানা কারুকার্য্যে শোভিত এবং প্রসিদ্ধ। ইহার উচ্চতা ১৩১ ফিট্। এখানে বহুবিধ তীর্থ ও বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজিত যথাঃ—গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্থ, সাগর-গোমতীসঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃপকূপ, গঙ্গাতীর্থ ও গো-প্রচার তীর্থ ইত্যাদি।

দ্বারকায় বহুবিধ মঠ আছে; তন্মধ্যে মহারাজ শঙ্করস্বামীর মঠই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই সকল মঠে সাধু সন্ন্যাসীরা তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন

করিবার সময় বিশ্রাম করিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে যাঁহারা এই তীর্থে আসেন, তাঁহারা হরিদ্বারের ১৫ ক্রোশ উত্তরে লক্ষণঝোলায় যান, তথা হইতে লৌহ সেতু পার হইয়া ভগবান দ্বারকাপতির দর্শন আশে অকাতরে দুর্গম পথ সকল অতিক্রম করিয়া এই পুণ্যস্থান দ্বারকায় উপস্থিত হন। আহা! এই সকল ধর্ম্মাত্মা সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন করিলেও মহা পুণ্য সঞ্চয় হয়।

দ্বারকাপুরে যে সমস্ত পাণ্ডা আছেন তাঁহারা সকলেই দচ্‌নি ব্রাহ্মণ কিন্তু বাঙ্গলা বা হিন্দি ভাষা বেশ বুঝিতে পারেন। এখানে উপস্থিত হইয়া যাঁহাকে তীর্থ গুরু মান্য করা যায় তিনিই যাত্রিদিগের থাকিবার জন্য বাসা, আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীরই অভাব মোচন করিয়া থাকেন কিন্তু সুফলের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয়া টাকা আদায় করিতে ক্রটি করেন না। এই সকল পাণ্ডাদের নিকট নাস্তিকতা ভাব দেখাইলে আর অধিক জোর জবরদস্তি করেন না। যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাদেরও বিস্তর গোমস্তা আছে, তাঁহারা খতিয়ান বহি দেখাইয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে থাকেন। ঐ গোমস্তাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহারা যাত্রীকে সকল বিষয়েই সহায়তা করিয়া থাকেন। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া যাঁহার যে পাণ্ডা আছেন তিনি তাঁহারই সন্ধান করিবেন আর যিনি নূতন, তিনি ইচ্ছানুযায়ী নূতন পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন।

দ্বারকাপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দূরে তামড়া নামক একটী স্থান আছে। ভক্তগণ বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তথায় গমন করেন। সেখানে যে একটী পুণ্যপুকুর আছে, ঐ পুস্করিণী হইতে গোপীচন্দন নামক তিলকমাটি অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কারণ কথিত আছে, যাঁহার দেহে এই পবিত্র চন্দন অঙ্কিত হয়, তাঁহার শরীরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, পার্ব্বতী ও সাবিত্রীদেবী সদা সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন অর্থাৎ কখন তাঁহার কোন

দুর্গতি হয় না। বহু পুণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয় অতএব মনুষ্য মাত্রেই এই সকল তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন।

এখানে একটীমাত্র ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইলে অন্য স্থানের সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফললাভ হয়। দ্বারকার সুফলের প্রথা আছে। এই সকল তীর্থের নিয়মগুলি পালনসহকারে ধর্ম্মে মতি রাখিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পুত্র পৌত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারা যায়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

সমালোচনা

(সারসংগ্রহ)

[স্থানাভাব বশতঃ সকল অভিমত দেওয়া হইল না।]

বর্ত্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া নিবাসী দেশপূজ্য সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয়, "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" সম্বন্ধে বলেন ;—

"কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি. আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া

সুসংবাদ

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই নবকলেবরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং সংশোধিত হইয়া ৩০।৩৫ খানি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানের সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্রসহ পাঠক সমাজে প্রকাশিত হইবে। মূল্য ১॥০ টাকা।

খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না ; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করণীয়, কোন্ পূজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে।"

বসুধা, ১ম সংখ্যা—১২ বর্ষ, ১৩১৯ সাল।

বিখ্যাত "মেদিনীপুর" হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম কাপড়ে বাঁধান, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা। তীর্থসমূহের পনের খানি উত্তম হাফ্‌টোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ যাত্রীবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থসমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আবশ্যক ও দ্রষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন পুরাণকাহিনা তীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা লোকহিতৈষণাবৃত্তিই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

মেদিনীপুর-হিতৈষী—২৫শে আষাঢ়, ১৩১৮ সাল।

বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ "সুবর্ণবণিক" সম্পাদক বলেন ;—

"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাঁধাই, ছাপানও অতি সুন্দর। অনেক তীর্থ চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থ যাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তীর্থ-ভ্রমণকালে তীর্থ যাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া

অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তন্নিবারণের জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থের ইতিহাসও ইহাতে বেশ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সুবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল।

সুবিখ্যাত "বসুমতী" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্তৃক প্রকাশিত। উত্তম কাপড়ে বাঁধা, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা। নানা তীর্থের বহু হাফ্‌টোন ছবি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ যাত্রীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বসুমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল।

বিখ্যাত "জন্মভূমি" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ মূল্য ১৲ টাকা। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্য তীর্থ-ভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। যাঁহারা তীর্থ দর্শনে অভিলাষী, এতদ্দারা কেবল তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে—যাঁহারা ঘরে বসিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক স্থানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন, এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ

পুণ্য স্থানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইয়াছে।

জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮ সাল।

একমাত্র দৈনিক সুপ্রসিদ্ধ "নায়ক" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ ১৲ টাকা। এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতিসহ ১৫।১৬ খানি পূর্ণ আকারের সুদৃশ্য হাফ্‌টোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রন্থের আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক। উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তির বিবরণ, পূজা ও দেবদর্শনবিধি দেবতা ও পাণ্ডাগণের প্রণামী এবং অন্যান্য প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে পাথেয় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক, তাহার তালিকা—এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এমন কি নারী জাতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

নায়ক—২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯ সাল।

হিন্দুধর্ম্মের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। গ্রন্থকার নানা তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, সুতরাং তীর্থ তথ্য সম্বন্ধে ইনি যে অভিজ্ঞ, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে পদে প্রমাণ পাওয়া যায়, তীর্থ যাত্রীর ইহা উপকারী ও উপাদেয়। অনেক তীর্থের অনেক খুটিনাটি তথ্য পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও পৌরাণিক তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক তথ্যগুলি বেশ, এ গ্রন্থ সাহায্যে হিন্দুমাত্রেরই পাণ্ডা গোলকধাঁধাঁর বড় উপকার হইবে।

বঙ্গবাসী—৮ই আষাঢ়, ১৩১৯ সাল।

সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীণ সুচিকিৎসক ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে উপাধি প্রাপ্ত বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলেন ;—

"বার্দ্ধক্যাবস্থায় তীর্থ ভ্রমণ অসম্ভব, কিন্তু তীর্থ দর্শন বাসনা নিরন্তর রহিয়াছে। সেই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শ্রীমান গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিয়া প্রীতি-প্রফুল্লিত হইলাম। কারণ গৃহে বসিয়া দূরস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃতি দর্শন বিশেষ প্রীতিপ্রদ এবং যাঁহারা তীর্থগমনে সমুদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকখানি অতি যত্নের বস্তু। কোথায় কোন্ বস্তু পাওয়া যায় বা অপ্রাপ্য, তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। যদিও এক্ষণে রেলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতে সুবিধা হইয়াছে, তথাপি টাইম্‌টেবল্ ব্যতিরেকে যেরূপ রেলপথে আসা-যাওয়া চলে না, সেইরূপ এই পুস্তক-

খানিও যেন তীর্থ স্থানের দ্বিতীয় টাইম্‌টেবল্‌। গ্রন্থকারের এই কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়, আমি তাহার হৃদয়ের সারল্য দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদের সহিত এই পত্রখানি লিখিলাম। কিমধিক মিতি।"

কলিকাতা—২৩শে কার্ত্তিক, সন ১৩১৯ সাল। | বৈদ্যরত্ন শ্রীকালিদাস বিদ্যাভূষণ কবিরাজ। সাং ৮ নং রায় বাগান ষ্ট্রীট।

স্বনামখ্যাত পুলিসকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু মহোদয় বলেন ;—

আমি শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর মহাশয়ের "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। পুস্তকখানি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা স্থানের অতি মনোরম হাফ্‌-টোন চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দু সাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থ-ভ্রমণ অভিলাষীগণ ইহা পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, বর্ণনার প্রণালীও প্রশংসনীয়।

কলিকাতা—১২ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৯ সাল। | শ্রীমনোজমোহন বসু, উকীল পুলিসকোর্ট।

সুবিখ্যাত Indian Mirror সম্পাদক বলেন ;—

"*Sachitra Tirtha Bhraman Kahiny.*"—Babu Gosto Behary Dhur is much travelled-man. He has visited all the principal Hindu places of pilgrimage in India. What he has not is not perhaps worth visiting. But he has done more. He has jotted down an account of the numerous shrines at which he has worshipped, such account including the Pouranic or legendary stories that are associated with the sites.

The number of Hindus who have visited the magnificent shrines in southern India is less than those who have made pilgrimages in upper India, and still less is the number of those who have written on them. The two out of the three volumes of his travels, which Babu Gosto Behary Dhur has caused to be brought out, are therefore, of absorbing interest pilgrims and tourists alike. The volumes are liberally embellished with appetizing illustrations of important shrines and striking views. The writer has shown much care and industry in the compilation of the volumes and he will undoubtedly feel simply rewarded of intending pilgrims make use of these for their guide. To the house keeper too, they will not only furnish profitable reading, but will act as powerful incentivet to travel.

The Indian Mirror, 10th July, 1912.

HON'BLE KUMAR NOGENDRA NATH MULLICK BAHADUR SAYS ;—

Marble palace, Chore Bagan.

I have gone through "Sachitra Teertha-Bhraman-Kahiny" Part I and II Compiled by Baboo Gosto Behary Dhur. The Book contains detailed and descriptions with illustrations of almost all the important places of pilgrimage in India. It is the best guide to the pilgrims and to the tourists.

Calcutta, 16th July, 1912. Nogendra Mullick.

হাওড়ার প্রসিদ্ধ THE LOYAL-CITIZEN সম্পাদক বলেন ;—

Sachitra (illustrated) "Thirtha-Bhraman" (Pilgrimage)

We are glad to read the above named book by Baboo Gosto Behary Dhur. It is completed in Three volumes. But

we have received the vol II for review. There are good many pictures in this volume.

The volume in question is extremely interesting as much as it has given vivid description of a number of sacred places of the Hindus.

The author has a great command over the Bengali languages. The description of the places are given in such a charming way that one cannot leave the Book if he has once began to read them.

The Loyal citizen Howrah, 31st July, 1912.

Hon'ble Rai Baikunta Nath Bose Bahadur. Honry Magistrate says :—

I have read with pleasure and profit the book of travel which Baboo Gosto Behary Dhur has brought out in two volumes under the designation of "Sachitra Tirtha Bhramana". The book is a record of the writer's personal experiences of the various places of pilgrimage in all parts of India which he visited and as such it should prove valuable practical help to would be pilgrims for whose guidance he has so very thoughtfully provided the requisite instructions.

The stag-at-homes might enjoy the pleasure of a visit which they cannot make by perusing the vivid descriptions of the places with the occasional of the neatly executted illustrations which accompany them.

Baikunta Nath Bose

2nd January, 1913.
167, Manicktola Street, Calcutta.